প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

This work is a co-production by
HORST ERDMANN VERLAG
HERRENALB (W. GERMANY)
and
M. C. SARKAR & SONS PRIVATE LTD.
CALCUTTA-12

Editor : Sigrid Kahle
Translator : Bhabani Mukherjee

Based on the anthology "Deutsche Erzahlungen aus Zwei Jahrzehnten" compiled by W. R Langenbucher and published by Horst Erdmann Verlag

মূল্য : ছয় টাকা

মুদ্রক : ধনঞ্জয় বায
মুদ্রণশ্রী প্রেস, ১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শুধু জার্মানী নয়, জার্মান সাহিত্যও একেবারে ধ্বংসের কবলে পড়েছিল। সব রকম নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে পড়ল। লেখকসত্তা সম্পন্ন মানুষ যাঁরা সমরক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরলেন তাঁরাও যেন একটা নির্ভরযোগ্য ভাষা খুঁজে পেলেন না। কি করে তিনি বীর, সম্মান, পিতৃভূমি, আনুগত্য, রক্ত, বাধ্যতা, জাতি, জনগণ ইত্যাদি কথাগুলি ব্যবহার করবেন। এসব কথা আর কি কোনোদিন ব্যবহৃত হবে? প্রথম মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এবং পরাজয়ের ভেতর দিয়েও একটা সাহিত্যিক কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। 'কলরব মুখরিত বিশের দশকে' বার্লিনে অনেক রকম ইজ্‌মের লড়াই চলেছে। বুদ্ধিজীবীদের কাছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ একটা নতুন আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অভ্যুদয় হল। যুগের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার ফলে জার্মানীতে এক বিশেষ ধরনের আর্টের উদ্ভব হল—যার নাম 'এক্সপ্রেসনিজম' বা অভিব্যক্তিবাদ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সব কিছুই বিভিন্ন—সম্পূর্ণ একটা অনীহা। বিস্মৃত সাংস্কৃতিক অতীত, আর সাহিত্যিক ঐতিহ্যের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘোষিত হল। নয়া-বুদ্ধিজীবীরা আশা ও নিরাশার দোলায় বসে tabula-rasa, Kahlschlag বা চরম সাংস্কৃতিক পোড়ামাটি নীতির কথা উচ্চারণ করতে সুরু করলেন।

নাৎসীদের আমলে জার্মানী একটা বিদগ্ধ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল—বাইরের বৃহত্তর সাহিত্য জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। অনেক মূল্যবান জার্মান গ্রন্থ 'অবক্ষয়ী-শিল্প' এই দুর্নামে পুড়িয়ে ফেলা হল। টমাস মান, ব্রেটলট ব্রেখট্, স্টেফান ৎসোয়াইখ প্রভৃতি আরো অসংখ্য সাহিত্যিক ১৯৩৩-এর মধ্যেই জার্মানী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। জার্মান ইহুদীদের ছিল অসামান্য সৃজনীশক্তি, তাদের হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল নয় অপমানজনক বন্দীত্বের বন্ধনে বাঁধা হল। কম্যুনিস্ট লেখকরা হয় আত্মগোপন করলেন নয় বিদেশে পালালেন। সকল রকমের স্বাধীন মত প্রকাশ নিষিদ্ধ হল। ফলে নতুন সাহিত্যিক সুযোগের জন্য ক্ষেত্র উন্মুক্ত হল—'রক্ত আর মাটি' সাহিত্যের

উদ্‌গাতারা এবং নাৎসী আদর্শবাদ প্রচারকরা সেখানে অধিষ্ঠিত হলেন। কিছু লেখক নীরবতা অবলম্বন করে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও সততা অক্ষুণ্ণ রাখলেন। অন্য অনেকে ধরি মাছ না ছুঁই পানি জাতীয় কাব্যধর্মী রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক বিচিত্র বিপর্যয়—আর জার্মানীর কাছে এর অর্থ সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, যা কোনোদিনই হয়ত ঠিকমত মেরামত করা যাবে না।

যুদ্ধের পর জার্মানীতে যখন আবার নতুন করে বই ছাপা হতে সুরু হল তখন অনুবাদ কর্মের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হল। প্রথম প্রকাশক সংবাদপত্র সদৃশ সস্তা কাগজে ছাপা গ্রন্থ অল্প দামে প্রকাশ করলেন। প্রথমেই প্রকাশিত হল জেরোম কে জেরোমের 'থ্রী মেন ইন এ বোট।'

আরনেস্ট হেমিংওয়ের একটি ছোটগল্প। হেমিংওয়ের বলিষ্ঠ বাস্তববাদ, সংলাপের ওপর বেশী জোর এবং দ্রুত ঘাত-প্রতিঘাত এবং কিছু চেপে বলার ভঙ্গী জার্মানদের মনে লাগল—ব্যথা ও বেদনায় আর অতিশয়োক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রতিষেধক নিয়ে বসে আছেন। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর তাই নতুন সাহিত্যিক মাধ্যম হল 'ছোট গল্প'। জার্মান 'ন্যভেল' যার গঠনভঙ্গী জটিল এবং মনোভঙ্গী বিষণ্ণ তার আকর্ষণ হারালো। কিন্তু এ্যাংলো-স্যাকসন ভঙ্গীর ছোট গল্প, দৃঢ়তায় পূর্ণ মার্কিন আঙ্গিক জনপ্রিয়তা অর্জন করল। বোঝা গেল পালিশবিহীন বাস্তবতা আর সারল্যভরা রচনা-রীতিতেই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ভালোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। উইলিয়াম ফক্‌নার এবং ডস পাসোস যখন জার্মান ভাষায় অনূদিত হওয়ায় চেতন প্রবাহ আভ্যন্তরীণ, আত্মগত সংলাপ এবং অন্যান্য জটিল তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালু হল। তবে জার্মানরা নকলনবীশ নন। উলফগ্যাং বোরখেটের 'সেই মঙ্গলবার' গল্পটি—যা এই সংকলনের অন্তর্গত তার মধ্যে হেমিংওয়ের আঙ্গিকের সংহত প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিব্যক্তিবাদী বাচনভঙ্গী। বোরখেটের সামগ্রিক রচনা হল যুদ্ধজনিত হতাশার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। এই প্রতিভা অবশ্য পরিণতির সুযোগ পায়নি, ১৯৪৭-এ তাঁর মৃত্যু ঘটে। নতুন লেখকরা কেউই আস্তিক্যবাদী দর্শন থেকে মুক্ত হননি। ফরাসী প্রতিরোধ'বাহিনীর লেখকবৃন্দ যথা, সারত্রে, আলবেয়র কামু প্রভৃতির দ্বারা তার উদ্ভব আর জার্মানীর নিজস্ব আস্তিক্যবাদী দার্শনিক

হাইডেগার এবং যাসপার প্রভৃতির দার্শনিক নীতিতে পরিপুষ্ট। যুদ্ধোত্তর কালে য়ুরোপে যে নিরাশাবাদের মনোভঙ্গীর উদ্ভব হয়েছিল তার সঙ্গে এর সমমর্মিতা ছিল। টি. এস. এলিয়ট, জেমস জয়েস, আঁদ্রে জিদ প্রভৃতির সাহিত্য যোগবাহীর কাজ করেছে অধ্যাত্মবাদের সন্ধানরত নয়া জার্মানীকে সেইকালে যখন সব হারিয়ে গেছে আবার সব কিছুই সম্ভব।

উলফ্‌ডিয়েট্রিচ স্কনের ছোট গল্পে সমরক্ষেত্র থেকে ঘরে ফেরা সৈনিকের গভীর মানবিক দিক ফুটে উঠেছে, এইসব সৈনিকরা বুঝেছে যে একটা যুদ্ধ বলপ্রয়োগে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা যুদ্ধকে ঘৃণা করে। স্কনের বলেছেন—

"আমরা যে লেখক হতে চাই বলে লিখতে শুরু করেছি তা নয়। আমরা লিখতে শুরু করেছি কারণ না লিখে পারিনি। আমরা তাই হতাশা আর ক্ষোভের কথা লিখেছি। যুদ্ধের বীভৎস অভিজ্ঞতা আমাদের জোর করে যে শিক্ষা দিয়েছে আমরা লিখে সেই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করতে চাই।'

এইভাবে একটা নতুন শ্রেণীর ফ্যাসীবিরোধী মানুষ গড়ে উঠেছে যারা উন্নততর জগৎ রচনা করতে প্রয়াসী; মানুষকে রূপান্তরিত করাই তাদের লক্ষ্য। এঁদের যাঁরা 'হিরো' তাঁরা আসলে 'এ্যান্টি-হিরো', তাঁদের মনে ভগ্ন আশা, তাঁদের ভগ্ন হৃদয়। একটা অর্থহীন নির্বোধ যুদ্ধ তাঁদের এই অবস্থা করেছে। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের নীতিগত ও রাজনৈতিক অভিনিবেশই তাঁদের সততার অগ্নিপরীক্ষা।

'গ্রুপ ৪৭' নামক যে এলোমেলো সমাবেশ ১৯৪৭-এ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—আমরা 'ঐতিহাসিক প্রয়োজন' নই, আয়ত্তাধীন শক্তিও নই কিন্তু আমরাই আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। এই 'গ্রুপ ৪৭' প্রথমটা এলোমেলোভাবে গঠিত হলেও কালক্রমে একটা বিরাট শক্তিশালী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠলো ১৯৫০-এর দশকে।

এই খণ্ডে যেসব জার্মান লেখকদের ছোট গল্প সংগৃহীত হয়েছে যথা, স্কনের, হাইনরিশ বোল, ইল্‌সে আইখইন্‌গার, আলেকজাণ্ডার ক্লুজ এবং রবার্ট ফিক্‌টে তাঁরা সকলে 'গ্রুপ ৪৭' এর গোষ্ঠীভুক্ত—তবে এই গোষ্ঠী বহির্ভূত অনেকেও ঐ একই রাজনৈতিক সুরে লিখেছেন।

এইভাবে এই গ্রন্থের অনেক কাহিনীতে যুদ্ধ এবং প্রতিক্রিয়া বর্ণিত। হানস বেনডারের 'তীর্থযাত্রা' গল্পটি শান্তিকালীন পরিবেশের কাহিনী কিন্তু তাঁর উপন্যাস 'Wunschkost' (গ্রন্থের নামকরণে মুমূর্ষু বন্দীকে যে শেষ আহার্য দেওয়া হয় সেই নামটি সূচিত)—এই নাটকের বিষয়বস্তু সোভিয়েট বন্দী শিবির, সেখানে যুদ্ধশেষের অনেক বছর পরেও অনেক জার্মান সন্তানকে তাদের নিজেদের বা অপরের রাজনৈতিক বিশ্বাসের খেসারত দিতে হচ্ছে। জে, মার্টিন বয়ের এই যুদ্ধকালীন লেখকদের শ্রেণীভুক্ত। তাঁর একটি রেডিও নাটকে একজন জার্মান যুদ্ধবন্দী কিভাবে পদব্রজে সাইবেরিয়ার ওরকুটা থেকে জার্মানীতে ফিরে এসেছে তারই কাহিনী আছে। হাজার হাজার শ্রোতা এই নাটক শুনেছে। জারড্ গেইসার রচিত 'সবুজ জ্যাকেট' গল্পটিতে একটি মানবিক চরিত্রের মাধ্যমে হিটলার ও তাঁর নাৎসীদের জার্মান অভিজাত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। হিটলারের যুদ্ধের ফলে, গত যুদ্ধের শেষাংশে পূব অঞ্চল থেকে যে শরণাগত দল পথপরিক্রমণ করে এ পারে চলে এসেছেন, জার্মান সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় যখন তাঁদের পূব অঞ্চলের ভিটে থেকে উৎখাত হয়েছেন তার কাহিনী বিশেষ লিখিত হয়নি। রোলাফ্ স্‌থরোয়ার্স হলেন 'গ্রুপ-৪৭'-এর বিরোধী গোষ্ঠির লোক। তাঁর 'একটি রজত খণ্ড' বিধ্বস্ত জার্মানীর নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার পরিচায়ক। এই জাতীয় কাহিনী রচনা হাইনরিশ বোলের এক বিশিষ্ট ধারা। অনেকগুলি উপন্যাসে তিনি যুদ্ধ-বিধবা, অনাথ এবং সৈনিকদের ঘরে ফিরে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের কাহিনী (যতটা স্বাভাবিকত্ব সম্ভব) লিপিবদ্ধ করেছেন। 'যখন যুদ্ধ থামল'—ঘরে ফেরা সৈনিক মনস্তত্ত্বের একটা রসহীন কাহিনী। বোলসের যুদ্ধকাহিনীগুলির মধ্যে "ট্রেন ঠিক সময়ে এসেছে', 'তুমি কোথায়? আদম' এবং 'পথচারী' গভীর আন্তরিকতা ও পরিচ্ছন্ন ভাষার জন্য স্মরণীয়।

হাইনরিশ বোল যুদ্ধকে একেবারে চুনকাম করে ফেলতে চান। তিনি হিরো-ওয়ার্সিপ পছন্দ করেন না। সামরিক জীবনের গরিমা নিয়ে গড়ে ওঠা উপকথাকে ধ্বংস করা তাঁর নীতি। জার্মানী 'ন্যাটো' গোষ্ঠিতে যোগদানের আগে তাঁর 'Ohne-nich' নীতি (নতুন সেনাবাহিনী? আমার জন্য নয়)—প্রবল হয়ে উঠেছিলেন। সাধারণ সৈনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি যুদ্ধ দেখেন, যে সৈনিক তার জীবনকে সেখানে রেখে এসেছে তার কথা।

গেইসারের উপন্যাস 'মৃত্যুপথযাত্রী যোদ্ধা' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিমান বাহিনীর এক বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। অনেকের কাছে এই উপন্যাস গৃহীত হয়নি ভাবাবেগের আতিশয্যের দরুণ, গেইসারকে তাঁর সহযোগীদের থেকে বিছিন্ন করে বিচার করা তাই সহজ। 'গ্রুপ ৪৭' গর্ব করে বলেন তাঁরা কেউ কোনো দিন 'হিটলার বা স্তালিনের গরিমা গান করেননি।' গণতান্ত্রিক এবং উদারনীতিক আদর্শবাদের প্রতি জার্মান লোকদের এই মনোভঙ্গী জার্মান সাহিত্য সম্পর্কে আজ বিদেশে এক নতুন কৌতূহল সঞ্চার করেছে। 'গ্রুপ ৪৭' উদারনীতিক মনোভঙ্গীর একটা প্রতীক হয়ে উঠেছে। শ্রেষ্ঠতম জার্মান ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনে তাঁরা বিশ্বাসী। অচেতন মানসিকতায় নাৎসী নীতি গ্রহণ করাটা লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী তিক্ত করেছে। তার ফলেই গেইসারকে বাইরে রাখা হয়েছে, একদা তিনি নাৎসীদলে ছিলেন, যৌবনের উদ্দাম প্রাণোচ্ছলতায়। বুদ্ধিজীবিদের দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীতে চলেছে নিরন্তর সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ বাইরে থেকে দেখা না গেলেও গভীরে চলে গেছে। এতদ্বারা একটি প্রশ্ন ওঠে—একজন মহৎ লোকের লেখক হিসাবে মহত্ত্ব কি হ্রাস পায় তিনি যদি কোনো ভ্রান্ত নীতির পরিপোষক হন। উত্তরকালের মানুষ যাই বলুক জারড্ গেইসার নয় হাইনিরশ বোলের রচনাই সারা পৃথিবীর হাজার হাজার পাঠক প্রতিদিন পড়ে।

পঞ্চাশের দশকে জার্মান সাহিত্যের ধারাবাহিকত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হল। বিশের দশকের কবি গোটফ্রেড বেণের পুনরাগমন আবার নতুন করে কবিতার পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত এনে দিল। অভিব্যক্তিবাদীদের পুনরাবিষ্কার করা হল। মুসিল, রোথ, ডোবলিন প্রভৃতি প্রবাসী লেখকরা আবার পরিচিত হলেন। জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনের আবার কিছু পরিমাণে পুনরভ্যুত্থান ঘটল তবে তার মধ্যে বৈদগ্ধ্য এবং রোমান্টিক শ্লেষ স্পষ্ট হয়ে উঠল। জর্জ বুখ্নার আর হাইনরিখ হাইনে নতুন করে পড়া শুরু হল। তাঁদের রচনা আধুনিকদের চেয়ে আধুনিকতর মনে হল। যে আলোকের যুগ বা 'দি এজ অব এন-লাইটেনমেণ্ট' ফরাসী বিপ্লবের কালকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল, জার্মানীতে তা কিন্তু ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের পর অন্ধকার করে দেওয়া হয়—সেই আলোয় রঞ্জিত উষার আভাষ দেখা ছিল। ভাষার মধ্যে যে নাৎসী সংস্পর্শ

ঘটেছিল তা বিদূরিত। আবার জার্মান ভাষা আত্মসচেতনত্বের ভঙ্গী নিয়ে প্রকাশিত হল। তবে সবচেয়ে বড় প্রভাব যা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত তা হল জার্মান-ইহুদী লেখক ফ্রানৎস কাফ্‌কার। ১৯২৪-এ অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধের পূর্বে ইংল্যাণ্ডের 'দি নিউ এপোক্লিপস' গোষ্ঠীর কবিরা তাঁর রচনার বিশেষ সমাদর করেন। বিশের দশকে ফ্রান্সে তাঁকে সার-রিয়ালিস্ট বা অতি-প্রাকৃত মতবাদের লেখক হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয়। যুদ্ধের পর তাঁকে আস্তিক্যবাদী হিসাবে গ্রহণ করা হয় আবার অন্য লোকে তাঁকে সর্বাগ্রগণ্য জিওনিস্ট মরমী লেখক বলেছেন। শুধু জার্মানীতেই কেউ তাঁকে পড়েনি (অবশ্য গোপনে পড়ে থাকতে পারেন)। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কাফকার 'দি ক্যাসেল' নামক অনুবাদ এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করে। আজ কম্যুনিস্ট দেশ-সমূহেও তিনি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছেন। সকল শ্রেণীর পাঠক তাঁর রচনায় গভীরত্ব এবং আঙ্গিকের মধ্যে মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছেন।

ইলসে আইখইনগারকে কাফকার শিষ্য বলা যায়। যেসব লেখকের রচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত তাঁরা কেউই কাফ্‌কা-প্রভাবমুক্ত নন। এই তরুণী লেখিকার প্রথম রচনা 'মহত্তর আশা' যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ। 'ইয়োলো স্টার' নামক চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় তিনি অল্প বয়সে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। ১৯৫০-তে প্রকাশিত তাঁর 'মিরর স্টোরী' জার্মান সাহিত্যের যুদ্ধোত্তর উন্নয়নের ধারা পরিবর্তিত করে দেয়। সহসা মনে হল যে বাস্তবতার একটা নির্দিষ্ট তিথি সুরু হয়েছে। তাঁর গল্প 'খোলা ডেসপ্যাচ' প্রথম দর্শনে মনে হবে একটা উত্তেজক যুদ্ধের গল্প—কিন্তু আসলে এই কাহিনী একটি রূপকাখ্যান। মৃত্যুভয়ে এই কাহিনীর সৈনিকটি সত্তার গভীরত্ব অনুভব করেছে, পরে তার এই উদ্বেগ যে একটা ভুল বোঝাবুঝির ফল তা বোঝা গেছে।

মার্টিন ওভালসারের 'আমার পদ্ধতির বিপক্ষে অভিযোগ বাড়ছে—'গল্পটিরও সেই কাফ্‌কাশ্রিত ভঙ্গী। একজন অসহায় প্রাণী বুরোক্রাটিক উচ্চতর সমাজের মেজাজের সঙ্গে আপনাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। যে পদ্ধতির সে একটা অংশবিশেষ, তার কিছুই সে বোঝেনি। ষাটের দশকের একজন বিশিষ্ট উপন্যাস লেখক ভালসার, পঞ্চাশের দশকে কাফ্‌কা প্রসঙ্গে তার ডক্টরেটের থীসিস রচনার পর সোজা কাফ্‌কার পথ অনুসরণ করে চলেছেন।

এমন কি হাইনরিশ বোলের যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাহিনীগুলিও কাফ্‌কা-সাহিত্যে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে জার্মান সমাজ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখে এসে পড়ে। প্রাক্তন রাজধানীর মধ্যভাগে দেওয়া একটি প্রাচীর এবং কাঁটা-তারের বেড়া জার্মানদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন অঞ্চল সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিম জার্মানিতে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র স্থাপিত হল, নতুন উন্নয়নশীল সমাজ এবং গির্জা ফেডারেল রিপাবলিক জার্মানীর লেখকদের মানসিকতার প্রসার করেছে। সোভিয়েটের অংশের জার্মানীতে কম্যুনিস্ট সমাজগঠন প্রচেষ্টা অন্য কোনোরকম সাহিত্যকে গ্রহণ করতে রাজী নয়, সেখানে অভিযোগের সাহিত্য গড়ে উঠেছে 'সাম্যবাদী বাস্তবতা' নাম দিয়ে। একমাত্র কবিতা ভিন্ন অন্য কোনো ভঙ্গীর রচনা-রীতি তাঁরা গ্রহণ করবেন না। জার্মানীর এই বিভাগ উই জনসনের উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু। তাঁর রচনার আঙ্গিক কঠিন কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটা সংঘাতকে পরিস্ফুট করার জন্য এই আঙ্গিক বিশেষভাবে রচিত। জার্মানীর নবীন লেখকদের মধ্যে জনসন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন। ফরাসী সাহিত্যের 'নুভো রোমা' জাতীয় উপন্যাসের জার্মান রূপ হল তাঁর উপন্যাসগুলি। তাঁর ছোট গল্পের আকৃতি সুদীর্ঘ, এবং সংকলন গ্রন্থের উপযুক্ত নয় তাই অন্য দুটি গল্পে এই বিষয়বস্তুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। স্কনের 'বিসংবাদ'—যার মধ্যে এই বিভাগের সামান্য বর্ণিত, তাঁর রচনার বিশেষ জার্মানত্ব অনুবাদের মাধ্যমে ঠিক ঠিক প্রকাশ করা কঠিন। আর একটি গল্প হল—গারহার্ডৎভোরেনৎস রচিত 'ছাদের ওপর।' এই দুটি গল্পই পূর্ব জার্মানী থেকে পলায়নের গল্প, অবশ্য যখন পর্যন্ত পলায়ন সম্ভব ছিল। এই শেষোক্ত লেখকের উদারনীতিক মার্কসবাদী হিসাবে পূর্ব জার্মানীতে মর্যাদা হ্রাস ঘটে। এই লেখক এখন পশ্চিম জার্মানীতে বসবাস করেন।

পঞ্চাশের দশকের উপন্যাস লেখকগণ, বিশেষতঃ যাঁরা যুদ্ধোত্তর আদর্শবাদী রাজনৈতিক শক্তি এবং ধনসম্পদের উন্নয়নের ফলে যে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে তার ফলে দিশেহারা হয়ে পড়েন। হাইনরিশ বোল উষ্ণতা থেকে শ্লেষে এবং শেষে কিছু পরিমাণে তিক্ততায় রূপান্তরিত হয়েছেন। 'আইরিশ

ডায়েরী' নামক তাঁর জার্মানী-সংক্রান্ত রচনাটি আয়নায় মুখ দেখা জাতীয় শ্লেষ রচনা। জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লেষ রচনাকার হিসাবে হয়ত ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লেখিত হবে।

পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে মধ্য-শতাব্দীকালীন জার্মানীর যে হিসাব নিকেশ হয়েছে তার মধ্যে অর্থনৈতিক বিস্ময়ভরা দেশের মনোভাব ফুটে উঠেছে—মার্টিন ভালসারের আটশত পৃষ্ঠা ব্যাপী উপন্যাস 'আধ ঘণ্টা'য় একটা নতুন এবং উত্তেজক সাহিত্যিক লিপিকুশলতার পরিচয় আছে। মধ্য-শতাব্দী-কালীন একজন সাধারণ নাগরিকের মানসিকতার অভিব্যক্তি এই কাহিনী।

এই যুগের (যাঁরা ১৯২৭-১৯৩৩-এর ভেতর জন্মেছেন) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি হলেন গুনটার গ্রাস। তাঁর 'টিনের ঢাক' 'কুকুরের বৎসর' প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত। (হাইনরিশ বোলের 'আগের যুগের রুটি" বাংলা, তামিল এবং মালয়ালাম ভাষায় প্রচুর বিক্রী হয়েছে। তাঁর রচনা সোভিয়েট ইউনিয়নেও সমাদৃত। তাঁকে অবশ্য জনপ্রিয়তায় কেউ অতিক্রম করতে পারবে না) গ্রাস এই সংকলনে সংযোজিত হওয়ার মত ছোট গল্প লেখেননি তবে তাঁর এপিকধর্মী উপন্যাস যা ডানজিগ থেকে তৃতীয় রাইন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তার অনুবাদ এদেশে পাওয়া যাবে অদূর ভবিষ্যতে।

জে মার্টিন বয়ের রচিত 'উষ্ণ আমেজের সন্ধানে' গল্পটিতে পশ্চিমা নাগরিক সমাজের মানুষের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগশূন্যতা সূচিত হয়েছে। হাইনজ রিসের 'পাপের পথ মসৃন' গল্পটির মধ্যে বিশ্বজনীনত্ব বর্তমান। রিসে সব সময় পাপ এবং পাপস্খালনের কাহিনী লিখেছেন। তাঁর সব কাহিনীতেই এই অপরাধতত্ত্বের সুর আছে। তার কাহিনীর নায়কবৃন্দ সবাই সাধারণ মানুষ, অপরাধে সহজেই প্রলুব্ধ, একবার সেই মসৃন পথে পা দিলে ফিরে আসতে পারে না। সর্বদাই তাদের সব সময়ে পেয়ে বসে, এবং শেষ পর্যন্ত দৈবের ন্যায়দণ্ডে দণ্ডিত হয়। বয়ের এবং রিসে দুজনেই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগের মানুষ। রিসে দুটি মহাযুদ্ধেই লড়েছেন, অথচ সাম্প্রতিক বাস্তবতার সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। ষাটের দশকে অতি-তরুণ দলের অভ্যুদয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের দিকে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। ছোট গল্পের আকার যেমন ছিল তাই থেকে গেছে কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে উপন্যাসের আকৃতির।

উনিশ শতকের উপন্যাস ছিল উদারনীতিক বুর্জোয়া মনোভঙ্গীর ফলশ্রুতি।

সেই বুর্জোয়া সমাজের এখন অধঃপতন ঘটায় প্রাচীন রীতির উপন্যাসও ভেঙেছে। বৈজ্ঞানিক যুগ সময় সম্পর্কে এনেছে নতুন সচেতনত্ব। সেই সঙ্গে মানুষেরও পরিবর্তন ঘটেছে। য়ুরোপের লেখকবৃন্দ মানুষের সংহতি বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের প্রশ্ন সব কিছুতেই। আধুনিক পশ্চিমা সাহিত্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, কারণ সমাজটাও ছিন্নবিচ্ছিন্ন, দ্বৈতবোধক, নিয়ত পরিবর্তনশীল। অনেক আঙ্গিক আছে, কিন্তু একটিমাত্র আঙ্গিকের অভাব। সাহিত্য সমালোচক ওয়ালটার জেনস বলেছেন :

'There is a museum of styles, and the writer can pick and choose. But we are sworn enemies of every form of pedantic realism and naturalism which smells of photography, historicism or reporatage. It is not 'in' to describe but to detect and dissect. It is not 'in' to reproduce but only to represent.'

বর্তমানে পরিহার ও পরিবর্জন হল যুগের দাবী। কবিতায় জার্মান শব্দ Dichtung-এর আক্ষরিক অর্থ হল যাকে বেশ কঠিন করে বাঁধা যায়। আধুনিক জার্মান গদ্য কবিতার মত এই Dichtung। সোভিয়েট জোনের কিছু সংখ্যক 'এ্যাংগ্রী ইয়ংমেন'দেরও এই অবস্থা, তাতে করে বোঝা যায় যে তারাও সম্প্রসারণের চেয়ে পরিবর্জনটাই চায়। মহাকাব্যের চেয়ে রূপকাখ্যানই শ্রেয়। তবে তেমনই কঠোর হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া, গ্রেপ্তার এবং শাস্তিদানের নমুনা দেখে তাই অন্ততঃ মনে হয়।

তরুণ লেখকরা যুদ্ধ জানে না, নাৎসী যুগ জানে না, তারা তাই বারবার দুদিকেই তাকায়। যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষ নিরলস ভঙ্গীতে অতীতের জার্মানীর সন্ধান করছে—একটা নৈতিক আত্মধিক্কারের মনোভঙ্গী নিয়ে। নতুন যুগের মানুষরা এখন আবার একটা নতুন অভিযোগ তুলেছে, তারা তার জবাবদিহি এবং ব্যাখ্যা চায়—'কী করে তোমরা এইসব হতে দিলে ?'

জেরুসালেমে আইখম্যানের বিচারের পর, জার্মানীতে ধারাবাহিকভাবে জার্মান বন্দীশিবিরের অনেক নাৎসী অপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে (অবশ্য মাল-মশলা বা অপরাধী কিছুই আগে পাওয়া যায়নি)। এই সূত্রে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশিত হল। পিটার ওয়াইসের নতুন নাটক 'তদন্ত'

অনউৎস বিচারের ভিত্তিতে রচিত। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর ষোলটি থিয়েটারে একই সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। সেই সময় লণ্ডনের রয়্যাল কোর্ট থিয়েটারেও প্রকাশিত হয়েছে। এই বক্তব্যকে নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রকাশের এই এক প্রচেষ্টা।

অনেক জার্মান আছেন যাঁরা অতীতকে এইভাবে স্মরণপটে আনার বিরোধী, এ অতীত তাঁরা ভুলতে চান। বুদ্ধিজীবিরা অবশ্য সেই মত পোষণ করেন না। তাঁদের মত সব কিছু জানলে তবে সতর্ক হওয়ার সুবিধা। আলেকজাণ্ডার ক্লুগের 'ক্রিমিন্যাল ইন্‌সপেক্টার' গল্পটি তার দৃষ্টান্ত। ক্লুগ স্তালিনগ্রাদের বিষয়বস্তু নিয়ে 'বৈজ্ঞানিক গদ্যে' একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। ক্লুগ এক আপোষবিরোধী নতুন যুগের প্রতিনিধি।

শ্রমশিল্পের জগৎ, মেহনতী জনতার জগৎ নিয়ে, কিষাণ ও মজুরকে নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠছে। হয়ত সোভিয়েট অংশে এই জাতীয় যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তার প্রভাব। পশ্চিম জার্মানীর মানুষ এইসব সামাজিক সমস্যাকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেন, হয়ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবই এর হেতু। ম্যাক্‌স্ ভন ডার গ্রুণ রচিত 'কাউন্সিলার' গল্পটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। হয়ত তিনি নিজে খনি-শ্রমিক ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি রুয়ের কারখানা-শ্রমিকদের অগ্রসর হয়ে এসে লেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। সোভিয়েট্ জোনে লেখকদের কারখানায় গিয়ে কাজ করতে বলা হয় তারপর জ্ঞান আহরণ করে লিখতে বসতে হয়—সৃজনীশক্তি হয়ত ঠিক এইভাবে অগ্রসর হয় না, তাই সাফল্য আশানুরূপ নয়। গ্রুণের সাফল্য অতিশয় সামান্য। তবে তাঁর গ্রন্থগুলি চমৎকার।

জার্মান ভাষার আধুনিক ছোট গল্পের পাঠকরা ভারতীয় সাহিত্যে যে মিত্রতার সরস রসিকতা কিংবা মানবিক উষ্ণতার প্রাচুর্য বর্তমান তা হয়ত পাবেন না। সমৃদ্ধিশালী আধুনিক পশ্চিম জার্মানীর তরুণ সমাজ, সৌখীন এবং কিঞ্চিৎ সাদামাটা, তাদের রসিকতা উদ্ধত এবং তার রং কালো। তাঁরা ভাবাবেগকে পরিহার করে চলেন। হানস্ বেনডারের 'তীর্থযাত্রা' গল্পটিতে যে বিশ্বজনীনত্ব আছে তাতে মনে হয় এই গল্প যে কোনো দেশের জন্য রচিত হতে পারত। যে সব দেশের মানুষ তীর্থযাত্রায় বেরোয় তাদের সকলের আকৃতিই এক, তারা তার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন আনন্দও আহরণ করে। তরুণ লেখক

হুবার্ট ফিকৃটের রচনাশৈলী আধুনিক, ফিকৃটে অল্পবয়সী শিশু হিসাবে যুদ্ধ দেখলেও তাঁর রচনায় যুদ্ধের ছাপ আছে। তাঁর 'মুক্ত অঞ্চল' গল্পটিতে একজন যুদ্ধফেরৎ কাস্টমস অফিসার এবং তাঁর স্ত্রীর কাহিনী বিধৃত। অফিসারটি গৃহধর্মের নিম্ন মধ্যবিত্ত আমেজ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। যুদ্ধের বাইরে নিরুত্তাপ উত্তেজনাহীন জীবন দুর্বহ, সেই জীবনের ভার বহন করা নিরর্থক।

অন্য কোনো য়ুরোপীয় দেশে আয়েনেসকো, বেকেট প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক নেই, 'এবসার্ড থিয়েটার' নামক বস্তুর প্রতিধ্বনি নেই, যেমন জার্মানীতে আছে। উলফগ্যাং হিলডেসাইমার একজন জার্মান নাট্যকার এবং এই পথাশ্রয়ী। তাঁর অধিকাংশ নাটক রেডিয়োর জন্য লিখিত। 'স্টুডিয়ো পার্টি' নামক গল্পটি তাঁর 'লাভলেস লিজেণ্ডস' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া, তার সব গল্পগুলির সূচনা স্বাভাবিক কিন্তু পরিশেষে তা অতিপ্রাকৃতে পরিণত। তার সবগুলির শেষে 'আই' অর্থাৎ আমি নামক ব্যক্তিসত্বা একক, সঙ্গীহীন— অশ্লীল জনতা থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে চায়। হিলডেসাইমারের রচনায় মানবিকতার প্রতি প্রেমের কোনো লক্ষণ নেই, বুদ্ধিজীবী সমাজের দুমুখো নীতির তিনি প্রচণ্ড বিরোধী।

মেরী লুইসী কাসনিৎস সার্থক জার্মান কবিদের অন্যতম। গদ্য লেখিকা হিসাবে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তিনি নন। রুডলফ হ্যাগেল স্ট্যাঙ্গে বা হানস এরিক নোসাকের মত তিনি একজন বাইরের জন হয়েই আছেন। আধুনিক জার্মান প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে তিনি ধ্রুপদী জার্মান শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। প্রাচীন রূপকল্পকে সমকালীন ভঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়েছেন।

'মোটা মেয়েটি' গল্পে অসংখ্য প্রতীক, যেমন জল, আয়না, ভেক এইসব দিয়ে তিনি অবচেতন মনের গভীরে ডুব দিয়েছেন। আর সেই কাজ করেছেন আপাত-বাস্তব সচেতনত্ব মিশিয়ে। একেবারে গল্পের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তবে জানা যায় যে কাহিনীটি প্রতীকধর্মী এবং আধো-ঘুম আধো-জাগরণের স্বপ্ন-সচেতন মনের কাহিনী। শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধ এই স্বপ্নবিলাসী লেখিকার বৈশিষ্ট্য।

জার্মান সাহিত্য য়ুরোপীয় সাহিত্য জগতে আজ আবার তার সেই পুরাতন কেন্দ্রীয় আসন অধিকার করেছে। এক বিরাট সত্তায় পরিণত হয়েছে।

ফ্রাঙ্কফুরটে বুকমেস হচ্ছে সাহিত্যের বছরের সর্বোচ্চ মেলাস্থল, পূব ও পশ্চিম জার্মানীর প্রকাশকরা সেখানে এসে এক সঙ্গে অকটোবর মাসের একটা সময় পুস্তক-প্রদর্শনীতে মিলিত হন। বিরাট প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য পত্র, রেডিয়ো, টেলিভিসন, বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য সমিতি প্রভৃতি সাহিত্যিকদের প্রতি প্রচণ্ড দাবী নিয়ে উপস্থিত, ফলে সাহিত্যিকরা অনেক সময় লেখারই সময় পান না। জার্মানীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে বিকেন্দ্রীকৃত। লেখকরা সারা জার্মানী ও য়ুরোপে ছড়িয়ে আছেন। বার্লিন ও ম্যুনিক এখন নামে রাজধানী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 'গ্রুপ ৪৭'কে বিচার করতে হবে। এই গোষ্ঠী বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

'গ্রুপ ৪৭' যাঁদের আবিষ্কার করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হাইনরিশ বোল, গুণটার গ্রাস, ইলসে আইসিনগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য লেখকগণ। এঁরা বহু-আকাঙ্ক্ষিত 'গ্রুপ ৪৭' পুরস্কার পেয়েছেন।

ভারতীয় পাঠকের কাছে এই ছোট গল্পের সংকলনটি পৌছে দেওয়ার কালে 'নতুন জগতের নাগরিক হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করায় জার্মানদের অধিকার আছে'—গ্যয়টের এই অমর বাণীর আমরা প্রতিধ্বনি করি, যেমন সম্প্রতি জার্মান পাঠকের কাছে ভারতীয় ছোট গল্প তুলে দেওয়ার সময় মনে হয়েছে।

সিগ্‌ফ্রিড কাপ্পে

সূচীপত্র

যখন যুদ্ধ থামল	...	৩
সেই মঙ্গলবার	...	২৬
খোলা ডেস্‌প্যাচ্‌	...	৩১
ছাদের ওপর	...	৩৯
সবুজ জ্যাকেট	...	৪৭
বিসংবাদ	...	৬১
উষ্ণ আমেজের সন্ধানে	...	৮৩
আমার পদ্ধতির বিপক্ষে অভিযোগ বাড়ছে—	...	৯১
একটি রজত খণ্ড	...	৯৭
মুক্ত অঞ্চল	...	১০২
কাউনসিলার	...	১১৯
তীর্থযাত্রা	...	১২৮
স্টুডিও পার্টি	...	১৪১
মোটা মেয়েটি	...	১৫৩
পাপের পথ মসৃন	...	১৬১

জার্মানীর ছোট গল্প

যখন যুদ্ধ থামল

হাইনরিশ বোল

আমরা যখন জার্মান সীমানায় এসে পৌছলাম তখন সবে ভোর হয়ে আস্‌ছে। বাঁ দিকে এক প্রশস্ত নদী, ডান দিকে ঘন অরণ্যভূমি, তার প্রান্তদেশ দেখলেই বোঝা যায় কত গভীর এই বন; গাড়ির ভেতরটা চুপচাপ; ধীরে ধীরে ট্রেনটা বাঁধা রেলপথের ওপর চলেছে—শেলের আঘাতে জর্জরিত দু' পাশের বাড়িগুলি সরে যাচ্ছে, টেলিগ্রাফের স্তম্ভগুলি দ্বিখণ্ডিত। যে বাচ্চা সৈনিকটি আমার পাশে বসেছিল সে তার চোখ থেকে চশমাটি খুলে সযত্নে সাফ করতে শুরু করল। তারপর আমাকে মৃদু গলায় বলল—"হা ভগবান! এ কোথায় এলুম আমরা, আপনার কোনো ধারণা আছে?"

আমি বললাম—"হাঁ, আমি জানি, এই যে নদীটা দেখলে, ওকেই আমরা রাইন বলি, আর ঐ যে ডান দিকের অরণ্যভূমি দেখতে পাচ্ছ ওকে আমরা রাইখওয়ালড্ বলি, এখন আমরা ক্লীভেসের কাছে আসছি।"

—"আপনি কি এদিকেরই নাকি?"

আমি বললাম—"না।"

লোকটা আমাকে বিরক্ত করেছে, সারারাত ধরে ঐ স্কুলের ছাত্রের মত গলায় আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে, বলল কেমন করে গোপনে ব্রেখট্ পড়েছে, তুখোলস্‌কি, ওয়ালটার বেনজামিন প্রভৃতি পড়েছে, এমন কি প্রুসত এবং কার্ল ক্রাউস; ওর নাকি সমাজনীতি পড়ার ইচ্ছে ছিল, সেই সঙ্গে কিছু অধ্যাত্মনীতি। বাসনা ছিল জার্মানীতে নব্যনীতি প্রবর্তনে সহায়তা করার। তারপর যখন ভোরের দিকে ট্রেনটা নিৎসভেগেনে দাঁড়াল তখন কে যেনো বলে উঠল যে আমরা জার্মান সীমানায় এসে পড়ছি, তখন ও বলতে লাগল, "ছ'টি সিগারেটের টুক্‌রোর বিনিময়ে কেউ একটু সুতো দিতে পারবেন কি?" যখন কেউই এই প্রস্তাবে সাড়া দিল না তখন আমি আমার জামার কলার থেকে সামরিক চিহ্ন ছিঁড়ে ওকে দিলাম। তাকে, আমার মনে হয় আয়না বলা হত, সেই চিহ্নের অংশ থেকে ঘন সবুজ রঙের সুতো তৈরী করা গেল।

আমি আমার কোটটি খুলে ফেলে ওর কাণ্ড লক্ষ্য করি; একটা পাতলা টিন দিয়ে ও সযত্নে সেই চিহ্নটা কেটে সেটা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপরকার চিহ্নের চারপাশে বসিয়ে দিল। আমি তাকে প্রশ্ন করি—"এই ব্যাপারের পিছনে কি ব্রেখট, তুখোলস্কি, বেনজামিন বা কার্ল ক্রাউসের প্রভাব আছে কিংবা ইয়ুংয়ের সুস্পষ্ট প্রভাব। যার ফলে এই বুড়ো-আঙুলার খেলাঘরের হাতিয়ারটির সাহায্যে নিজের 'র‍্যান্‌কে'র (শ্রেণীবিভাগ) পুনরুজ্জীবন করার চেষ্টা করছ?" ছেলেটার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে বলল—"ইয়ুংয়ের পালা অনেকদিন চুকিয়েছি।"

—"আমরা এতক্ষণে ক্লেভেসে এসে পৌঁছলাম," সেলাই করার কাজ বন্ধ রেখে সেই বুড়ো-আঙুলার হাতিয়ারটি হাতে নিয়ে ও বলল: "ক্লেভেসে কিছু করার আছে এমন কিছুই চিন্তা করতেও পারি না, আপনার কিছু জানা আছে নাকি?"

আমি বললাম—"হাঁ, লোহেনগ্রীন, মার্গারিন ব্রাণ্ড "ব্লু-লেবেল সোয়ান," আর হেনরী দি এইটথের অন্যতমা স্ত্রী এ্যান অব ক্লেভেস—"

ছেলেটি বলল—"হাঁ—হাঁ, লোহেনগ্রীন—কিন্তু আমরা ঘরে সানেলা খেতাম। আপনার সিগারেট-টুকরো দরকার নেই?'

আমি বললাম—"না, ও তোমার বাবার জন্য নিয়ে যাও। আমার ত' মনে হয় কাঁধে ঐ অপরূপ ছাপ নিয়ে যখন বাড়ি ফিরবে তখন তিনি তোমার কান দুটো মলে দেবেন।"

ছেলেটি বলে—"আপনি বুঝবেন না। প্রাসিয়া, ক্লিসট্, ফ্রাঙ্কফুর্ট/ওডার, পটস্‌ডাম, দি প্রিন্স অব হামবুর্গ, বার্লিন।"

আমি বললাম—"আচ্ছা, আমার ধারণা ক্লেভেস অনেককাল আগে প্রাসিয়ান ছিল, আর রাইন নদীর ওপারে কোথায় একটা ছোট্ট শহর আছে, তার নাম ওয়েসেল্।"

সে বলল—"হাঁ হাঁ, আছে—নিশ্চয়ই স্‌খীল।"

আমি বললাম—"প্রাসিয়ানরা প্রকৃতপক্ষে রাইনের ওপর এসেছিল—তাদের দু'টি মাত্র সেতুর সংযোগ ছিল—বন এবং কবলেন্স।"

ছেলেটি বলে—"প্রাসিয়া।"

আমি বললাম—"ব্লমবার্গ, তোমার কি আরো সুতো চাই?" ছেলেটি লজ্জায় লাল হয়ে চুপ করল।

ট্রেন অতি ধীর গতিতে চলছে। সবাই গাড়ির খোলা দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ক্লেভেসের দৃশ্য দেখছে ; অলস এবং দুর্ধর্ষ ইংরাজ প্রহরী স্টেশনে উদাসীন অথচ সতর্ক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে ; আমরা এখনও বন্দী ; পথে একটি পথচিহ্ন : কলোনের পথে। শরৎকালীন বৃক্ষশ্রেণীর মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোহেনগ্রীনের দুর্গ। নিম্ন-রাইনের বুকে অকটোবরের আমেজ, আকাশের-ওলন্দাজী-আকৃতি ; লাণ্টেনে আমার মাসতুতো ভায়েরা থাকে, পিসিরা থাকেন কেভালেয়ারে ; চড়া গলায় আলাপচার আর সরাবখানার চোরাচালানিদের ফিস্ ফিস্ ; মার্টিনমাসের মিছিল মানুষের আকার নিয়ে দোলায়িত। ব্রোখেলের মত কার্নিভ্যাল শুরু হয়েছে—আর চারিদিকে আদার রুটির গন্ধ, এমন কি সেই গন্ধ সত্যি না থাকলেও যেন আছে।

আমার পাশের সেই বাচ্চা সৈনিকটি বলল—"অনুগ্রহ করে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করুন।"

আমি বললাম, "আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।" যদিও এখন পর্যন্ত ও পুরোপুরি সাবালকত্ব পায় নি। অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য সাবালক হয়ে উঠবে। আর ঠিক সেই কারণেই ওকে আমি ঘৃণা করি। ছেলেটি আহত হয়ে আবার চুপ করে বসে তার সেই চিহ্নটা সেলাই করতে লাগল। সহসা ওর ওপর কেমন করুণা হল। অপটু হাতে রক্তমাখা আঙুলে ছেলেটি তার বিমানযাত্রার জ্যাকেটের নীল কাপড়ে ছুঁচ দিয়ে গর্ত করছে, তার চশমা দুটো এমনি বাষ্পাচ্ছন্ন যে সে কাঁদছে না ঐ রকম দেখাচ্ছে তা বোঝা কঠিন। আমারও চোখে প্রায় জল এসে গেল। দু-ঘণ্টা কিংবা বড় জোর তিন ঘণ্টার ভেতর আমরা কলোনে পৌঁছে যাব, আর সেখান থেকে যাকে আমি বিবাহ করেছি, যার কণ্ঠস্বর কোনদিন বিবাহের মত মনে হয়নি তার ঠিকানা দূর নয়।

প্রহরীরা ব্যাপারটি উপলব্ধি করার আগেই স্ত্রীলোকটি সহসা শুডস সেডের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে আমাদের গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নীল কাপড়ের ভেতর থেকে যা বার করল প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম একটি শিশু, কিন্তু তা নয়, একখণ্ড পাঁউরুটি ; আমার হাতে সেটি তুলে দিল, আমিও নিলাম, রীতিমত ভারী ; এক মুহূর্তের জন্য আমি একটু কাতর হয়েছিলাম,

চলন্ত ট্রেন থেকে প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম ; রুটিটা কালো, তখনও বেশ গরম, আমি চেঁচিয়ে বলতে চেয়েছিলাম—ধন্যবাদ ! ধন্যবাদ !—কিন্তু মনে হল এ কথাটা নির্বোধের মত হবে, ট্রেন ততক্ষণে জোরে চলছে, আমি তাই সেই ভারী পাঁউরুটিটা হাতে নিয়ে উবু হয়ে বসে পড়লাম ; আজ পর্যন্ত সেই রমণী সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারিনি ; শুধু মনে আছে তাঁর গায়ে একটা কালো রঙের ওড়না ছিল এবং তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত।

রুটিটা হাতে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন ট্রেনের কামরাটা যেন আগের চেয়েও নীরবতর, তারা সবাই রুটিটার দিকে তাকিয়ে আছে এবং তাদের দৃষ্টিপাতে রুটিটা ক্রমশঃই অধিকতর ভারী হয়ে উঠছে। এসব দৃষ্টি আমার পরিচিত, যেসব মুখ এই চোখগুলির অধিকারী তাও আমার পরিচিত, আমিও কয়েকমাস ধরে ঘৃণা এবং উপেক্ষার সীমারেখার সন্ধান করেছি, মাসের পর মাস, কিন্তু সেই সীমানা খুঁজে পাইনি ; কিছুকাল আমি ওদের দুভাগে শ্রেণীবিভাগ করেছিলাম, নর্দমা এবং অ-নর্দমা ; আমরা যখন একটা আমেরিক্যান শিবির থেকে বদলী হলাম (সেখানে শ্রেণী-নির্দেশক ব্যাজ পরিধান নিষিদ্ধ) একটি ইংরাজ শিবিরে (এখানে ব্যাজ পরিধান অনুমোদিত) তখন এই অ-নর্দমা শ্রেণীর প্রতি আমার কিছু সহানুভূতি ছিল ততদিন যতদিন পর্যন্ত কারো কোনো শ্রেণীবিভাগ জানা ছিল না। যে ব্যাজ তারা আঁটতে পারত তা ছিল না, এগেলহেকট্ আবার, একধরনের 'কোর্ট অব অনার' লাগাবার তালে ছিল যে আমি আমার জার্মান বৈশিষ্ট্য থেকে নাকি বঞ্চিত (আমি নিজেও ভেবেছি, এই কোর্ট, যা কোনোদিন বসেনি, আমাকে প্রকৃত পক্ষে জার্মান বৈশিষ্ট থেকে বঞ্চিত করুক) তারা জানত না যে আমি তাদের ঘৃণা করি, নাৎসী এবং অ-নাৎসী—তাদের ওই সেলাই করা ব্যাজ বা রাজনৈতিক মতবাদের জন্য নয়, কারণ তারা মানুষ, সেই শ্রেণীর মানুষ যাদের সঙ্গে আমাকে ছ'টি বছর কাটাতে হয়েছে একসঙ্গে। আজ আমার কাছে মানুষ এবং নির্বোধের সংজ্ঞা এক হয়ে গেছে।

এই পটভূমিকায় এগেলহেকটের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—"এই প্রথম জার্মান রুটি। তাও আবার সবাইকে ছেড়ে ওর হাতে পড়ল।"

তার কণ্ঠস্বর একেবারে চাপাকান্নার কাছাকাছি, আমিও সেই অবস্থায় পৌঁছেচি। কিন্তু ওরা বুঝবে না কোনোদিন যে শুধু এই রুটির জন্য নয়,

আমরা জার্মান সীমানা অতিক্রম করেছি বলেও নয়, আমার এই চাঞ্চল্যের কারণ যে আটমাস পরে এই সর্বপ্রথম আমি আমার বাহুতে একটি মুহূর্তের জন্য নারীর স্পর্শ লাভ করেছি।

এগেলহেকট্ কোমল কণ্ঠে বলল—"তুমি হয়ত ঐ পাঁউরুটিটাকেও ওর জার্মান্ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করবে ?"

আমি উত্তর দিলাম—"হাঁ, কিঞ্চিৎ বৈদগ্ধ্য-প্যাঁচ প্রয়োগ করব, নিজের মনকে প্রশ্ন করব যে ময়দা থেকে এই রুটিটা গড়া হয়েছে তা হয়ত ওলন্দাজ কিংবা ইংরাজ বা আমেরিক্যান বংশোদ্ভূত নয়।" বললাম—"এদিকে এসো—সবাই এটিকে ভাগ করে নাও।"

ওদের অধিকাংশকেই আমি ঘৃণা করি। অনেকেই আমার প্রতি উদাসীন আর যে বুড়ো-আগুলা এখন সেলাই বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, সেও আমাকে বিরক্ত করে তুলছিল। তথাপি আমার মনে হল এই রুটিটা ওদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া যাক, কারণ এই রুটি নিশ্চয়ই আমার একার জন্য গড়া হয়নি। এগেলহেকট্ ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ; সে দীর্ঘকায় এবং শীর্ণ, আমিও একদিন ঐরকম দীর্ঘাকৃতি ও শীর্ণ ছিলাম। ওর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। আমিও একদিন ঐ বয়সে ছিলাম—তিন মাস ধরে ও বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে সে একজন জাতীয়তাবাদী—মানে নাৎসী নয়, এবং সম্মান, আনুগত্য, পিতৃভূমি, শালীনতা প্রভৃতি শব্দের কোনোদিনই মূল্য হ্রাস হবে না—আর আমি সব সময়েই তার এইসব শক্তিশালী বাগ্-বিভূতির মাত্র পাঁচটি কথায় কাটান দিয়েছি—দ্বিতীয় উইলিয়াম, প্যাপেন, হিনডেনবুর্গ, ব্লমবার্গ, কাইটেল। আমার এই উত্তর তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, আমি হিটলারের নাম উচ্চারণ করিনি, এমন কি সেই ১লা মে তারিখে যখন প্রহরী শিবিরের মধ্যে ছুটোছুটি করে একটি মেগাফোন সহযোগে ঘোষণা করেছে— "হিটলার মরেছে—হিটলার মরেছে—" সেদিনও নয়।

আমি বললাম—"নাও, রুটিটা ভাগ করো।"

এগেলহেকট্ চিৎকার করে বলল, "সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ো।" এই বলে সে তার গায়ের কোটটি খুলে গাড়ির মেঝেতে পাতল। অন্তরের দিকটা ওপরে রইল, হাত দিয়ে সেটা সমান করল, তারপর তার ওপর রুটিটা রাখল —আর এদিকে তার চারপাশ ঘিরে সবাই সার বেঁধে দাঁড়াল।

বুড়ো-আংলা বলল—"বত্রিশ।" তারপর সব চুপচাপ! এগেলহেকট্ বলল, —"বত্রিশ।" তারপর আমার দিকে তাকাল, তার বলা উচিত ছিল তেত্রিশ। আমি কিন্তু সংখ্যা উচ্চারণ করলাম না, বরং ওদিক থেকে চলে এসে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। পথের দুপাশে প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণী সারবদ্ধ। নেপোলিয়নের পপ্‌লার গাছ। নেপোলিয়নের এলম গাছ, এরই তলায় আমরা আসতাম সস্তার সিগারেট ও চকোলেট কেনার জন্য—আমার ভাইদের সঙ্গে বাইসিকল চড়ে ওয়েস থেকে ওলন্দাজ সীমান্তে যাওয়ায় পথে কতদিন এখানে বসে বিশ্রাম করেছি।

আমি অনুভব করছি আমার পিছনে যারা রয়েছে তারা ভীষণ আহত হয়েছে। পথে হরিদ্রাভ নির্দেশ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, কালকার পথে, কাণ্টেনের পথে, গেলডার্নের পথে—পিছনে এগেলহেকটের ইস্পাতের ছুরির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ভাবছি ঘন মেঘের মত কি ভাবে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছে। ওদের সব তাতেই সব সময় অসন্তোষ, একজন ইংরাজ প্রহরী যখন সিগারেট দিতে চেয়েছিল তখন ওরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে; আবার যখন সে সিগারেট দিতে রাজী হয়নি তখনও অসন্তোষ; আমি যখন হিটলার সম্পর্কে অভিযোগ করেছি, ওরা অসন্তুষ্ট, আবার হিটলার সম্পর্কে অভিযোগ করিনি বলে এগেলহেকট্ একেবারে নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হল। বুড়ো-আঙলা গোপনে বেন-জামিন ও ব্রেখট, প্রুসত, তুখোলস্‌কি এবং কার্ল ক্রাউস পড়েছে, আর আমরা যখন জার্মান সীমানায় পৌছলাম, তখনও ছেলেটি সেলাই করছে চিহ্নের টিকলি। কর্পোরালের চিহ্ন আমার অঙ্গে আঁটা থাকায় যে সিগারেট পেয়েছিলাম সেটি বার করলাম পকেট থেকে, তারপর ঘুরে গিয়ে বুড়ো-আঙলার পাশে গিয়ে বসলাম, দেখতে লাগলাম এগেলহেকট্ কি ভাবে রুটিটা ভাগ করছে, প্রথমে আধখানা, তারপর সেই অর্ধেককে চার টুকরো, তাকে আবার আট টুকরো, এই ভাবে সকলের জন্য একটা মোটা টুকরো জুটবে। আমার অনুমান সেই কালো রুটির অংশ ওজনে প্রায় ষাট গ্রাম হবে! সবাই জানে যারা মাঝের অংশটুকু পাবে তারা একটু বেশী পাবে, অন্ততঃ পাঁচ থেকে দশ গ্রাম বেশী পাবে, কারণ রুটিটার মধ্যভাগ বাঁকা, আর এগেলহেকট্ সব অংশগুলি সমান ও মোটা করেই কেটেছে। তারপর দুটি মধ্য অংশের বাঁক কেটে সে বলে ওঠে—"তেত্রিশ—সবচেয়ে যে বয়সে ছোট আরম্ভ কর।" বুড়ো-আঙলা আমার দিকে

তাকালো, তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, তারপর সে ঝুঁকে পড়ে এক খণ্ড রুটি তুলে নিয়ে সোজা মুখে পুরে দেয়। সবই বেশ স্বচ্ছ ভাবে চলছিল, বুভেয়ের তার অংশটুকু নেওয়া পর্যন্ত, এই বুভেয়ের তার এরোপ্লেনের গল্প বলে আমাকে প্রায় আধা পাগল বানিয়ে ছেড়েছে। এইবার আমার পালা, তারপর এগেলহেকট্—কিন্তু আমি নড়লাম না, আমার সিগারেটটা ধরানোর বাসনা ছিল—কিন্তু আমার দেশলাই নেই, কেউ আমাকে দিলও না। যারা ইতিমধ্যে রুটির ভাগ পেয়েছে তারা ভয়ে ভয়ে রুটি চেবানো বন্ধ করল; যারা এখনও তাদের ভাগ পায়নি তারা কি যে ব্যাপারটা ঘটছে না জানলেও অনুমান করতে পেরেছে। ওদের সঙ্গে রুটিতে ভাগ বসাবার বাসনা আমার নেই। ওরা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আর সবাই (যারা ইতিমধ্যে রুটির ভাগ পেয়েছে তারা) হতভম্ব হয়ে পড়েছে। আমি বাইরে তাকানোর চেষ্টা করছি, নেপোলিয়ানের পপ্‌লার, নেপোলিয়ানের এলম, সেই বীথির মধ্যে অনেক ফাঁক—তার মাঝে ওলন্দাজী আকাশ, কিন্তু এই ভাবে উদাসীন থাকার প্রচেষ্টা কার্যকরী হল না; আমার আশংকা হল এইবার একটা লড়াই হবে—আমি তেমন ভালো লড়াই করতে পারিনি, আর যদি পারতাম তাহলেও তেমন সুবিধা হত না, একবার ব্রাসেলসের শিবিরে বলেছিলাম জীবন্ত জার্মান থাকার চেয়ে আমি বরং মরা ইহুদী হতে রাজী, সে সময় ওরা আমাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল, ওরা আমাকে সেইভাবে মারবে। আমি মুখ থেকে সিগারেটটা খুলে নিলাম, কারণ একদিক থেকে এভাবে রাখাটা হাস্যকর, তা ছাড়া হাতাহাতির সময় ওটা নিরাপদে রাখাই শ্রেয়—আমি বুড়ো-আঙলার দিকে তাকালাম, সে আমার পাশটিতে লাল মুখ করে বসে আছে। তারপর ছিল গুগেলার, এগেলহেকটের পর যার পালা সে তার অংশটা তুলে নিয়ে সোজা মুখে পুরে দিল, আর সবাই তাদের ভাগ গ্রহণ করল। তখনও তিনটি ভাগ পড়ে আছে, এমন সময় একজন এগিয়ে এল, তখনও পর্যন্ত আমার ভালো ভাবে তাকে জানা হয়নি, ব্রাসেলসে উনি আমাদের শিবিরে এসেছেন, এর মধ্যেই বেশ বয়স হয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ, বেঁটে রেখাঙ্কিত কালো মুখ—আমরা যখন তর্ক করতে সুরু করলাম, সে কখনও কিছু বলেনি, সে শিবির থেকে বেরিয়ে কাঁটা তারের বেড়ার চারপাশে দৌড়েছে, যেন এভাবে চার পাশে দৌড়াতেই সে অভ্যস্ত। আমি ওর নামের আদ্যাংশও জানি না। ওর পরনে একটা বিবর্ণ ট্রপিক্যাল ইউনিফর্ম আর পায়ের জুতাটা

বে-সামরিক হাফ-সু। গাড়ির পিছন দিক থেকে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য মিহি সুরে বলল—"রুটিটা নিয়ে নিন।" তবুও যখন আমি নিলাম না, তিনি মাথাটা নেড়ে বললেন—"সব কিছুর ভেতর প্রতীক একটা কিছু করার আপনার আশ্চর্য অশুভ শক্তি আছে। এটা রুটির টুকরো—রুটি ছাড়া কিছু নয়। মহিলাটি আপনাকে দিয়েছেন। সেই স্ত্রীলোক—থাকগে নিন"—একখণ্ড রুটি তুলে নিয়ে আমার ডান হাতে গুঁজে দিলেন তিনি—রুটিটা অসহায় ভঙ্গীতে ঝুলছে, তারপর রুটির অংশ ধরে তিনি দৃঢ় ভাবে আমার হাতটা ধরলেন। তাঁর চোখ দুটি বেশ কালো, তাঁর মুখে অনেক কারাগারের ছাপ। আমি মাথা নাড়লাম, রুটিটা ধরবার জন্য হাতের পেশী সঞ্চালিত করলাম। সারা গাড়িটার ভেতর স্বস্তির গভীর নিঃশ্বাস ধ্বনিত হল। এগেলহেকর্ট্ তার রুটির অংশটা তুলে নিল। তারপর সেই ট্রপিক্যাল ইউনিফর্ম পরা বৃদ্ধ লোকটি বললেন—"ড্যাম ইট। আমি আজ বারো বছর জার্মানী ছাড়া, তবে ধীরে ধীরে আপনাদের মত খ্যাপা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি।"

আমি আমার মুখে পাঁউরুটিটা প্রবেশ করানোর আগেই ট্রেনটা থেমে গেল আর আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম।

খোলা শহর, চারদিকে গাঁজরের ক্ষেত, কোনো গাছপালা নেই, কয়েকজন বেলজিয়ান সৈনিক ট্রেনের ধারে দৌড়োদৌড়ি করে চীৎকার করছে—"সবাই বেরিয়ে এসো।" তাদের টুপি এবং জামার কলারে 'ফ্ল্যাণ্ডার্স লায়নে'র চিহ্ন আঁকা।

বুড়ো-আঙলা আমার পাশটিতেই আছে। সে তার চশমাটা সাফ করে নিয়ে স্টেশনের নাম চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে বলল—"উইজ—এই জায়গাটা সম্পর্কেও কিছু জানা আছে নাকি আপনার?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ—এটা কেভালেয়ারের উত্তরে এবং জানটেনের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।"

ছেলেটি বলল—"ও, কেভালেয়ার—হাইনরিম্ হাইনে—আর জান্টেন্?"

"সীগ ফ্রীড্, হয়ত তোমার মনে নেই।" আমি বললাম। আমার মনে পড়ল—আণ্ট হেলেন। উইজ। আমরা কেন কলোন পর্যন্ত যেতে পারলাম না।

উইজ শহরে দেখার মত কিছুই নেই। কয়েকটি লাল টালির ছাদওলা বাড়ি গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। উইজে আণ্ট হেলেনের প্রকাণ্ড দোকান—রীতিমত গ্রাম্য মনিহারী দোকান। প্রতিদিন সকালে উনি আমাদের কিছু পয়সা দিতেন, আমরা নৌকায় চড়ে বেড়াতে যেতাম নায়ার নদীর বুকে কিংবা বাইসিকল চালিয়ে কেভালেয়ার; রবিবার গির্জায় শুনতাম ধর্ম উপদেশ; চোরাচালানি এবং ব্যাভিচারীদের মাথায় দৃঢ়ভাবে সেই বাণী ধ্বনিত হচ্ছে।

বেলজিয়ান সৈনিক বলল: "চলে এস,—সোজা চল, ঘরে ফিরতে চাও, না ইচ্ছে নেই ?"

আমি ক্যাম্পে গেলাম। প্রথমেই একজন ইংরাজ অফিসারকে অতিক্রম করতে হল, তিনি আমাদের কুড়ি মার্কের একখানি করে নোট দিলেন। আমাদের রসিদ দিতে হল। তারপর ডাক্তারের কাছে হাজির করা হল। লোকটি জার্মান। বয়সে তরুণ এবং হাসিমুখ; ঘরে পনের-কুড়িজন না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করছিলেন, তারপর বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে সব চেয়ে অসুস্থ যে আজ বাড়ি যাওয়ার শক্তি নেই, সে কেবল হাত ওঠাও!" এই অত্যাশ্চর্য রসিকতায় আমাদের মধ্যে কয়েকজন হেসে উঠলাম। তারপর আমরা একে একে তাঁর টেবলের সামনে দিয়ে চলে গেলাম। আমাদের খারিজের কাগজে তাঁর হুকুমের ছাপমারা হল তারপর আমরা অপর দোর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। আমি কয়েক মুহূর্ত সেই খোলা দরজার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম, শুনতে পেলাম তিনি বলছেন—"তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে অসুস্থ—" তারপর আমি এগিয়ে এলাম, বারান্দার প্রায় শেষপ্রান্তে এসে পরের ঘাঁটিতে পৌছানোর মুখে হাসি শুনতে পেলাম।

এখানে একজন ইংরাজ সার্জেণ্ট খোলা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে—সামনে একটি উন্মুক্ত প্রস্রাবাগার। সার্জেণ্ট আদেশ করলেন—"তোমাদের পে-বুক এবং আর যা সব কাগজপত্র এখনও সঙ্গে আছে দেখাও।" এই কথাগুলি জার্মান ভাষায় বললেন। তারপর যখন সেসব কাগজপত্র বার করা হল তখন তা প্রস্রাবখানায় ফেলে দিতে আদেশ করলেন। সবাই আদেশ পালন করার পর, তিনি আবার জার্মান ভাষায় বললেন:—"খুশীতে কাজ করো।" আমরা সবাই আবার হাসলাম এই রসিকতায়। আমার মোটামুটি মনে হয়েছে

জার্মানদের একটু রসজ্ঞান আছে, বিশেষতঃ তা যদি বিদেশী রসিকতা হয়। এমনকি এগেলহেকট্‌ও ক্যাম্পে একবার হেসেছিল মার্কিন ক্যাপ্টেনের কথায়।

ক্যাপ্টেন কাঁটাতারের বেড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—"ছেলেরা খুব বেশী কষ্ট করার নেই, শেষ পর্যন্ত তোমরা স্বাধীনতা লাভ করেছ।"

ইংরাজ সার্জেণ্ট আমার কাছেও কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। আমার কাছে ডিস্‌চার্জ পেপারস্‌ ছাড়া আর কিছুই ছিল না; দুটি সিগারেটের বিনিময়ে পে-বুকটা একজন মার্কিন সৈনিককে দিয়ে দিয়েছিলাম। তাই বললাম—"পেপারস কিছুই নেই।" এই কথায় আমেরিক্যান সার্জেণ্টটির মত সেও ক্ষেপে গেল। সেই মার্কিন প্রশ্ন করেছিল—"হিটলার ইয়ুথ! এস এস না পার্টি?" আমি বলেছিলাম —"না।" ভীষণ চটে গিয়ে আমার ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করল। আমাকে গাল দিল, আমার ঠাকুমাকে পর্যন্ত যৌন বিষয়ক কুৎসিত গালাগালি দিল—আমেরিক্যান খিস্তি তেমন জানা না থাকায় ঠিক অর্থটুকু বোঝা যায়নি। যখনই কোনো কিছু তাদের মনোমত হত না তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। ইংরাজ সার্জেণ্ট রাগে লাল হয়ে উঠল—উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দেহে তল্লাসি শুরু করল—বেশী দেখতে হল না, আমার ডায়েরীটায় হাত পড়ল। মোটা ডায়েরী, ব্যাগের মাপসই, তার ওপর পেপার ক্লিপ আঁটা। আর সেই ডায়েরীতে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপটেম্বরের মধ্যকাল পর্যন্ত সব কিছু লেখা আছে। আমেরিক্যান সার্জেণ্ট ষ্টিভেন্সন কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া থেকে শেষ দিনের কথা। শেষ কথা ট্রেনে বসে বসে লিখেছি। আমরা যখন বিষণ্ণ এনটোয়ার্পের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখি লেখা আছে Vive la Roi—আরো একশোপাতার বেশী ঠোঙার কাগজ ছিল। ঘনসংবদ্ধ লেখা। ক্ষিপ্ত সার্জেণ্ট আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নিল, তারপর প্রস্রাবখানায় সেটি ফেলে দিয়ে বলল—"কি! আমি তোমার কাগজ পত্র দেখতে চাইনি?"

এরপর আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল।

ক্যাম্পের দরজার সামনে আমরা সবাই জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বেলজিয়ান লরীর আগমন প্রতীক্ষায়। সেই লরীতে আমাদের 'বন'-এ নিয়ে যাওয়ার কথা। শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে কেন যে 'বন'-এ যেতে হবে কে জানে? কে একজন বলল—"কলোন' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মৃতদেহের ভিড়ে সেখানে মড়ক লেগেছে।"

আরেকজন বলল, "এখন ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে ধ্বংসস্তূপ শাবল-গাঁইতি দিয়ে খুঁড়তে হবে। তাছাড়া ওরা আমাদের কোনোরকম ট্রাক দেবে না, ঝুড়ি করে সেগুলি বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদেরই।"

ভাগ্যক্রমে কেউই আমাদের পাশে ছিল না, যাদের সঙ্গে এতকাল ছাউনিতে ঘুমিয়েছি বা ট্রেনে একা কাটিয়েছি। যেসব মুখ পরিচিত নয় তার চেয়ে এইসব পরিচিতদের মুখ অনেক রুচিকর।

আমার সামনে কে একজন বলে উঠল—"তাহলে ঐ ইহুদীটার কাছ থেকে রুটিটা নিয়ে নিল ?"

অন্য একজন জবাব দেয়—"হ্যাঁ, ঐ ধরনের লোকরাই ত' আইন গড়ে।"

আমার পিছন থেকে কে একজন আমাকে ঠেলে প্রশ্ন করে।

"একশো গ্রাম রুটির বদলে একটা সিগারেট হলে কেমন হয় ?"

আমার পিছন থেকেই তার হাতখানা আমার মুখের ওপর ধরল,—আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, ট্রেনে যে পাঁউরুটি এগেলহেকৃট বিতরণ করেছিল এই রুটিটা তারই একটা অংশ। আমি মাথা নাড়লাম। আরেকজন বলল—"বেলজিয়ানরা দশ মার্ক করে এক এক টুকরো রুটি বিক্রী করছে।"

আমার কাছে দরটা বেশ সস্তা মনে হল। ক্যাম্পের ভেতর জার্মানরা কুড়ি মার্ক করে এক একটা সিগারেট বিক্রী করেছে।

"কারো কি সিগারেট চাই ?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ, চাই।"

এই কথা বলে একটি কুড়ি মার্কের নোট এক অপরিচিত ব্যক্তির হাতের ওপর রাখলাম। সবাই সবায়ের সঙ্গে বেচাকেনা শুরু করেছে। শুধু এই একটি মাত্র দ্রব্যের প্রতি আমার আসক্তি। দু হাজার মার্ক এবং একটি শতছিন্ন ইউনিফর্মের বিনিময়ে একজন একটি বে-সামরিক পোষাক সংগ্রহ করে নিল।

বিনিময় ও হাত বদলের পালা অপেক্ষমান জনতার মধ্যে এইভাবে চলছিল, সহসা আমার কানে এল একটা চড়া গলার চীৎকার—

"এর সঙ্গে ত' আণ্ডার প্যাণ্ট পাওয়ার কথা, এ ত স্পষ্ট কথা, আর তার সঙ্গে টাইটাও।"

কে একজন তার রিস্টওয়াচটা বিক্রী করল তিনহাজার মার্কের বিনিময়ে। বাণিজ্যের মুখ্য উপকরণ ছিল সাবান। যারা মার্কিন ক্যাম্পে ছিল তারা

প্রচুর সাবান পেয়েছিল, অনেকের কাছে প্রায় কুড়িখানা সাবান ছিল, কারণ, ওখানে প্রতি সপ্তাহেই সাবান দেওয়া হত। কিন্তু কাচার জন্য জল পাওয়া যেত না। যারা ইংরাজদের ক্যাম্পে ছিল তাদের ভাগ্যে সাবানই জুটতো না। নীল এবং সবুজ এবং লাল রঙের সাবান খণ্ড এদিক ওদিক চলাচল করতে লাগল। সাবানের দ্বারা অনেকের সৃজনীমূলক অভীপ্সা পূরণের সুযোগ মিলেছিল। কেউ ছোট কুকুর, বিড়ালছানা, বাগানের খেলা ইত্যাদি বানিয়েছে—এখন দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টির সুখের সেই উল্লাস এই দ্রব্যগুলির বাণিজ্যিক মূল্য হ্রাস করেছে। যেসব সাবান অক্ষত ছিল তার বিনিময় মূল্য অনেক বেশী, যেগুলিতে কারুকার্য করা হয়েছে তার দাম কম, কারণ সেইসব ক্ষেত্রে ওজনটা অনেকখানি হ্রাস পাওয়ার আশংকাই প্রবল। যে নামগোত্রহীন হাতটিতে আমি কুড়ি মার্ক ধরে দিয়ে ছিলাম সেই হাত আবার দেখা দিয়ে আমার বাঁ হাতটিতে দুটি সিগারেট গুঁজে দিল। আমি ত এই সাধুতার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে গেলাম (কিন্তু আমি প্রায় অনুরূপ আকুল হয়ে উঠলাম যখন জানলাম যে বেলজিয়ানরা পাঁচ মার্ক করে এক একটি সিগারেট বিক্রী করছে। স্পষ্টতঃ শতকরা শতভাগ লাভকে একটা সম্মানজনক দর বলা যায় —বিশেষতঃ 'কমরেড'দের মধ্যে)।

এইখানে আমরা প্রায় দুটি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলাম জন্তুর মতো জড়ো হয়ে। আমার কেবল সেই হাতের কথা মনে হতে থাকে, বাণিজ্য করার হাত, ডান থেকে বাঁয়ে যে হাত সাবান চলাচল করছে। মনে হচ্ছে আমি যেন এক অন্ধকূপে পড়েছি, চারদিক থেকে কেবল হাত আর হাত এগিয়ে আসছে। আমার মাথার ওপর দিয়ে টাকা আর দ্রব্যাদির অবাধ বিনিময় চলছে।

বুড়ো-আংলা আবার আমার কাছ ঘেঁষে আসতে পেরেছে। বেলজিয়ান লরীতে ও আমার পাশেই বসেছিল। সেই লরী কেভালেয়ারের দিকে যাচ্ছিল, তারপর কেভালেয়ার হয়ে ক্রেফিল্ড, ক্রেফিল্ড হয়ে নেউস, মাঠের ওপর দিয়ে শহর, কদাচিৎ মানুষজন চোখে পড়েছে, পশুও দু চারটি—আর মেঘমলিন হৈমন্তী আকাশ যেন ঝুলে নীচে নেমে এসেছে। আমার বাঁ দিকে বসে ছিল বুড়ো-আংলা, ডান দিকে ছিল বেলজিয়ান শান্ত্রী। এই পথ আমার অতি পরিচিত, আমি আর আমার ভাই কতদিন এ পথে সাইকেল চড়ে গিয়েছি, পথের ওপর তাকিয়ে রইলাম। বুড়ো-আংলা বার বার আপনার

সম্পর্কে যুক্তি দেখায়, আর প্রতিবারই আমি তাকে নিরস্ত করি, সে একটু চালাক ভাব দেখানোর চেষ্টা করে—সে কিছুতেই এ ভাব এড়িয়ে চলতে পারে না।

সে বলল: "নেউস সম্পর্কে কিছুই কিন্তু ভাবাও যায় না। নেউস সম্পর্কে কি মনে আসে বলুন?"

আমি বললাম: "নেভেসিয়া চকোলেট" "স্বয়েরক্রাট আস্ত কোয়ারিনাস—কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই 'থেবান লিজনে'র কথা শোনোনি?"

"না"—এই কথা বলেই সে আবার মুখ লাল করে বসে রইল। আমি বেলজিয়ান শান্ত্রীকে প্রশ্ন করলাম কলোনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই খবর কি সত্য, মড়ায় মড়ায় নাকি মড়ক ছড়িয়ে গেছে। সে জবাব দিল—"না, ঠিক তা নয়। তবে অতিশয় খারাপ দেখাচ্ছে। তুমি ওখানকার মানুষ নাকি?"

আমি বললাম—"হাঁ।"

সে বলল—"এদিকে এসো।" তারপর তার পকেট থেকে এক প্যাকেট তামাক বার করে আমার নাকের ওপর সেই উজ্জ্বল হরিদ্রাভ পদার্থ মেলে ধরল।

সে এবার বলল—"দু খণ্ড সাবানের বিনিময়ে এ বস্তু তোমার হতে পারে—কেমন এর চেয়ে সুবিধে আর কি হতে পারে?"

আমি মাথা নাড়লাম, তারপর পকেট হাতড়ে সাবান বার করে ওকে দুটি খণ্ড দিয়ে সেই তামাক পকেটস্থ করলাম। আমার হাতে ওর মেশিন পিস্তলটি রাখতে দিয়ে শান্ত্রী তার পকেটের ভেতর সাবান দুটি লুকিয়ে রাখল। আমি যখন অস্ত্রটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিলাম, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল: "এই-সব খুনে বস্তু, হয়ত আরো কিছুদিন এসব সঙ্গে রাখতে হবে। তোমার অবস্থা অন্ততঃ তুমি যেমন মনে করছ তেমন খারাপ ত নয়। তবে তুমি কাঁদছ কেন?"

আমি ডান দিকে আঙুল দেখালাম—ওদিকে রাইন নদী। আমরা ডোরমাজেনের দিকে এগিয়ে চলি। আমি দেখলাম যে বুড়ো-আংলা মুখ খোলবার উদ্যোগ করছে, আমি তাড়াতাড়ি বললাম—"ঈশ্বরের দোহাই একটু চুপ করুন। একেবারে চললাম।"

ও হয়ত জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল রাইন সম্পর্কে আমি কিছু মনে করতে পারি কিনা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ও বিশেষভাবে আহত হয়েছে, আমরা 'বন্' না পৌঁছানো পর্যন্ত আর মুখ খুললো না।

কলোনে তখনও পর্যন্ত অনেকগুলি বাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। কোথায় যেন দেখলাম একটা ট্রাম চলছে। মানুষ, স্ত্রীলোক পর্যন্ত দেখলাম। একজন আবার আমার দিকে হাত দেখালো। আমরা নিউস স্ট্রীট থেকে রিংসে এসে পড়লাম তারপর রিংসের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলল—সব সময়েই মনে হল চোখ দিয়ে জল পড়বে। আমি তার প্রতীক্ষায় ছিলাম, যাই হোক চোখে জল আসেনি। রিংসের ইনসিওরেন্সের বাড়িটাও দেখলাম ধ্বংস হয়ে গেছে। হয়েনস্তফেন পুলের কয়েকটি নীল রঙের টালি দেখা গেল। সব সময়েই আশা করছিলাম যে লরীটা কোন এক ফাঁকে ডান দিকে ফিরবে, কারণ আমরা কারিলিংগিয়ান রিং-এ থাকতাম—লরীটা কিন্তু বাঁক নিল না। সোজা রিংসের ভেতর দিয়ে চলল—বারবোসা স্কোয়ার, স্যাকসন রিংগ, সালিয়ান রিংগ। আমি সেদিকে না তাকাবার চেষ্টা করলাম, সামনে লরীর কনভয়টা ক্লোডুইগ স্কোয়ারের মুখে জ্যামে আবদ্ধ না হয়ে পড়লে দেখতাম না হয়ত, যে বাড়িটায় আমরা এককালে বাস করতাম তার সামনে দাঁড়াতাম না হয়ত—এখন দেখতে হল। "সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস", কথাটি বিভ্রান্তিকর, চারবার কি পাঁচবার সজোরে আঘাত করতে হবে তারপর আগুন ধরাতে হবে, যে বাড়িটায় আমরা থাকতাম সরকারি অভিজ্ঞা হিসাবে তা "সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত"। কিন্তু আইনগতভাবে ঠিক তা নয়। অর্থাৎ, আমি ত' এখনও এই বাড়ি চিনতে পারছি। বাড়ির দেউড়ি এবং বেলটেপা বোতাম দেখা যাচ্ছে। আর যে বাড়ির বেল-পুস নষ্ট হয়নি আইনের চোখে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস কি করে বলা যায়!

যে বাড়িটায় আমরা থাকতাম তাকে চিনে নেওয়ার আরো কিছু লক্ষণ ছিল। শুধু দেউড়ি আর পুসবেলটাই নয়, একেবারে নীচের তলার দুটো ঘর একেবারে অক্ষত, তিনখানাও বলা যায়, একটা দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ তৃতীয় ঘরটিকে ধরে রেখেছে, তবে বাড়ি তৈরীর ইনস্পেকটারের চোখে এসব এড়িয়ে যাবে না। আমরা দোতালার যে অংশে থাকতাম সেখানে একটি কামরা তখনও অক্ষত, তবে সামনের দিকে বড় রাস্তার দিকে মুখ করা অংশটুকু ফেটে

ঝুলে পড়েছে, তার ওপরে একটা উঁচু এবং সরু বারান্দা—জানলার জায়গাটা শূন্য। সবচেয়ে মজার বিষয় দুটি লোক আমাদের বসবার ঘরটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন কতদিনের পরিচিত। একজন দেয়াল থেকে একটি ছবি খুলে নিল—'টেরবোখ্ প্রিণ্ট'—আমার বাবা এই ছবিটা বড় ভালোবাসতেন। সে ছবিটা হাতে করে সামনে এগিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে দেখালো, কিন্তু এই তৃতীয় লোকটি কিন্তু মাথা নাড়ল, নীলামের মাল পছন্দ না হলে মানুষ যে-ভাবে মাথা নাড়ে। ওপরকার লোকটা আবার ফিরে এসে 'টেরবোখ্ প্রিণ্ট' যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখল। এমন কি ছবিটাকে সোজা করে ঠেলে দিল; নিখুঁতভাবে কাজ করার এই ঝোঁকটুকু আমার অন্তর স্পর্শ করল।—সে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল ছবিটা সোজা ভাবে টাঙানো হয়েছে কিনা, তারপর সন্তোষের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই ঘরের লচনারের ক্যাথিড্রাল পিক্চার নামক এনগ্রেভিং খুলে দেখল, কিন্তু নীচেকার সেই তৃতীয় ব্যক্তিটির কাছে এ ছবিও রুচিকর মনে হল না। পরিশেষে সেই প্রথম লোকটি যে 'টেরবোখ্ প্রিণ্ট'-টা টাঙিয়ে রেখেছিল, এগিয়ে এসে নিজের দুটো হাত মেগাফোনের আকারে ধরে বলল—"পিয়ানো দেখা যাচ্ছে।" নীচেকার মানুষটার মুখে হাসি ফুটে উঠল—সেও দুটি হাত মেগাফোনের ভঙ্গীতে জড়ো করে বলল—"ওটা আমি দেখব।" আমি পিয়ানোটা দেখতে পেলাম না, তবে জানতাম কোনখানটায় আছে। ডানদিকের কোনটায়। আমি সেই জায়গাটা এখন দেখতে পারছি না, লচনার ছবির সেই লোকটা সেই দিকেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

বেলজিয়ান শাস্ত্রী প্রশ্ন করল, "তুমি কলোনের কোন দিকটায় থাকতে?"

আমি পশ্চিম প্রান্তের শহরতলীর দিকে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে বললাম —"এই কোথায় একটা থাকতাম!"

শাস্ত্রী বলল—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। গাড়িটা চলতে শুরু হয়েছে।"

লোকটা তার মেশিন পিস্তলটা হাতে তুলে নিল, এতক্ষণ ওটা লরীর ওপর পড়েছিল। মাথার টুপিটা সোজা করে নিল। তার টুপির ওপর আঁকা ফ্ল্যানডার্স লায়ন কিঞ্চিৎ ময়লা হয়ে গেছে। তারপর ক্লোডউইগ্ স্কোয়ারে পৌঁছে আমি জ্যামের কারণটা আবিষ্কার করতে পারলাম। এখানে একটা হামলা চলছে। চারদিকে ইংরাজ মিলিটারি পুলিসের গাড়ি। তার ভেতর

হাত উঁচু করে বে-সামরিক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আশেপাশে বেশ লোকজনের ভিড়। তারা শান্ত, তবে উত্তেজিত। এইরকম একটা শান্ত বিধ্বস্ত শহরে এতগুলি লোক একসঙ্গে দেখতে আশ্চর্য লাগে।

বেলজিয়ান শান্ত্রী বলল—"এই হল কালোবাজার। মাঝে মাঝে ওদের সাফ করা হয়।"

আমরা কলোন ছাড়ার আগেই, বন স্ট্রীটে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মার কফি পেষাই কলটার কথা স্বপ্ন দেখছিলাম। কফির যন্ত্রটা যে লোকটিকে টেরবোখ্ চিত্রটি দেখানো হয়েছিল তাকে দেখানো হল, কিন্তু তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করলেন। অপর লোকটি সেটা টেনে তুলে নিল। হলঘরের দরজাটা খুলে যেখানে কফি পেষাই যন্ত্রটা ছিল সেখানেই আটকানোর চেষ্টা করল—রান্নাঘরের দরজার ঠিক বাঁ ধারে, কিন্তু সেদিকে আর কোনো দেওয়াল নেই যার ওপর যন্ত্রটা আটকানো যায়। তথাপি লোকটি বার বার চেষ্টা করতে লাগল (তার এই উদ্যম স্বপ্নের মধ্যেও আমার অন্তরকে আকুল করে তুলল)। ডান হাতের মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে লোকটি টাঙাবার জায়গা খুঁজতে থাকে। কিন্তু দেখতে না পেয়ে হাতের মুঠি উত্তেজিতভাবে নাড়িয়ে সেই ধূসর হৈমন্তী আকাশের দিকে তুলে আস্ফালন করে, আকাশ কেন কোনো সমর্থন ব্যবস্থা রাখেনি এই তার অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত, সে হাল ছেড়ে দেয়, তারপর যন্ত্রটার চার পাশে আবার দড়ি বাঁধে, এগিয়ে যায়, কফিযন্ত্রটাকে নীচে নামিয়ে আবার তৃতীয় ব্যক্তিটিকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। লোকটি আবার সেটি প্রত্যাখ্যান করে। তখন লোকটি সেটি আবার উঠিয়ে নেয়, তারপর যেন একটা বহুমূল্য বস্তু এই ভঙ্গীতে যন্ত্রটি নিজের জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তারপর দড়িটা গুটিয়ে পাকিয়ে নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিটির মুখের ওপর ছুঁড়ে দেয়। সর্বদাই আমার মনে খচ খচ করতে থাকে, সেই যে লোকটাকে লচনারের ছবিটা দেখানো হয়েছিল তার কি হল, কিন্তু তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না; যেন কি একটা বস্তু বাধা দিয়ে কোণের দিকটা কিছুতেই দেখতে দিল না। সেই দিকেই পিয়ানো রাখা ছিল, আমার বাবার ডেস্ক। আমার খুব খারাপ লাগতে থাকে যে লোকটা বাবার নোটবুকগুলো পড়তে পারে। কফিযন্ত্র হাতে লোকটা এখন বসবার ঘরে এসে

দাঁড়িয়েই দরজার গায়ে কফিযন্ত্রটা বসানোর চেষ্টা করছে। সে ঐ কফি-যন্ত্রটাকে এক পাকাপাকি ভাবে জায়গা দিতে বদ্ধপরিকর মনে হল। আমার লোকটাকে ভালো লাগতে থাকে, অনেক পরে জানতে পারলাম, ও আমাদেরই পরিচিত বন্ধুদের অন্যতম, অনেকবার কফিযন্ত্র থেকে কফি দিয়ে আমার মা ওকে তোয়াজ করেছেন। যুদ্ধের প্রথম দিকেই বিমান আক্রমণে লোকটি মারা যায়।

'বন'-এ পৌছানোর আগেই বেলজিয়ান শান্ত্রী আমাকে টেনে তুলল, সে বলল—"উঠে পড়ো, চোখ মুছে নাও, সামনেই মুক্তি।"

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম, আর আমার মার কফিযন্ত্রের তলায় যারা এসে বসত তাদের সকলের কথা ভাবতে লাগলাম, স্কুল পলাতক, তাদের মন থেকে মা ক্লাসের কাজের ভয় দূর করে দিতেন। নাৎসীরা আসত, তাদের তিনি শিক্ষা দিতেন, অ-নাৎসীদের তিনি সাহস ও শক্তি দিতেন। ওরা সবাই কফিযন্ত্রটার নীচেকার চেয়ারগুলিতে এসে বসত। মার কাছে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেছে, সাহস ও ক্ষমা, তিক্ত কথায় তাদের আদর্শ ভেঙেছে, আর মধুর কথায় যে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে তা সারা জীবনের সম্বল হয়ে আছে—দুর্বলকে ক্ষমা আর অত্যাচারিতকে স্বস্তি।

প্রাচীন কবরখানা, বাজার, বিশ্ববিদ্যালয়। বন-কবলেন্স গেট পার হয়ে হফগার্টেন।

বেলজিয়ান শান্ত্রী বলল—"বিদায়।"

আর বুড়ো-আংলা তার সেই ক্লান্ত শিশুর মতো মুখ নিয়ে বলল—"আমাকে চিঠি দেবেন সময় মত।"

আমি বললাম—"হাঁ, আমি তোমাকে আমার তুকোলাসকীর সেটটা দিয়ে দেব।"

ছেলেটি বলল—"চমৎকার। আর ক্লীষৎটাও পাঠাবেন।"

আমি বললাম—"না, শুধু আমার যা ডবল আছে তাই দেব।"

কাঁটাতারের বেড়ার সামনে, সেখান থেকেই আমরা শেষ পর্যন্ত খারিজ হতে পারলাম, দুটি বিরাট ধোপার ঝুড়ির মধ্যে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। একটি ঝুড়িতে অনেক আপেল, আর অন্যটায় কয়েকখণ্ড সাবান। সে

বলছিল—"ভিটামিন, কমরেড—একটি আপেল, একটা সাবানের বিনিময়ে একটি আপেল।"

আমার জিভে জল এসে গেল। আপেল যে কিঁ রকম দেখতে তা ভুলে গিয়েছি। আমি একখণ্ড সাবান তাকে দিয়ে একটা আপেল নিলাম, তারপর তখনই তাতে একটা কামড় বসালাম। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, অন্য সকলের নিষ্ক্রমণ দৃশ্য দেখতে থাকি। লোকটাকে আর চেঁচাতে হচ্ছে না, এ এক নীরব কারবার, একখণ্ড করে সাবান এক হাতে নিয়ে শূন্য বাক্সে ফেলছে আর একটি করে আপেল দিচ্ছে। সাবানটা যখন পড়ছে তখনকার শব্দটা কেমন ঢিমে লাগছে। সবাই যে আপেল নিচ্ছে তা নয়, সকলের ত আর সাবান নেই। কিন্তু স্বয়ংসেবী দোকানের মত এখানকার কারবারও দ্রুত-গতিতে চলে, সুতরাং আমার আপেল ভক্ষণ শেষ হতেই ওর সাবানের বাক্সটা প্রায় পুর্ণ হয়ে এল। সবকিছুই বেশ দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে চলছিল, একরকম নিঃশব্দে, যারা বেশ হিসাবী এবং কৃপণ স্বভাব তারাও আপেলের লোভ সামলাতে পারছিল না। ওদের প্রতি আমার করুণা হল। পিতৃভূমি তার রণভূমি প্রত্যাগত সৈনিকদেব এই ভাবে ভিটামিন দ্বাবা প্রেমভরে আপ্যায়িত করছে।

'বন'-এ একটা টেলিফোনের সন্ধান পেতে অনেক সময় লাগল। অবশেষে পোস্টঅফিসের একটি মেয়ে আমাকে বলল, শুধু ডাক্তার আর পুরোহিতরাই টেলিফোন পাচ্ছেন আজকাল। আর শুধু তারাই পায় যারা নাৎসী ছিল না।

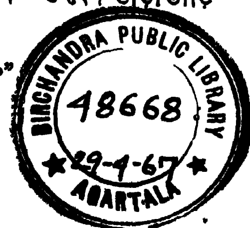
মেয়েটি বলল—"ওরা সবাই যুদ্ধেব নেকড়েদের ভীষণ ভয় করে, আচ্ছা আপনার কাছে কি একটা সিগারেট হবে?"

আমি আমার পকেট থেকে তামাকের প্যাকেট বার কবে বললাম—"আমি একটা পাকিয়ে দেব?"

মেয়েটি বলল—"না, তার দরকার নেই, ও আমি নিজেই পারি।"

মেয়েটি যখন নিজের কোটের পকেট থেকে সিগারেটের কাগজ বার করে পাকাতে থাকে তখন আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। ও বেশ তাড়াতাড়ি এবং সুষ্ঠুভাবেই সিগারেট বানিয়ে ফেলল।

মেয়েটি প্রশ্ন করে—"কাকে আপনি ফোন করবেন?"



আমি বললাম—"আমার স্ত্রীকে।"

মেয়েটি হেসে বলল—"আপনাকে বিবাহিতের মত দেখায় না মোটেই।"

আমি আমার সিগারেট পাকালাম, আর কাছাকাছি কোথাও একখণ্ড সাবান বিক্রীর সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চাইলাম। আমার কাছে একটা পেনীও নেই, পয়সার প্রয়োজন, গাড়িভাড়া দরকার।

মেয়েটি বলল—"সাবান! কই দেখি!"

আমি আমার জামার ভেতরকার লাইনিং খুলে এক টুকরো সাবান বার করলাম। মেয়েটি আমার হাত থেকে নিয়ে নিল। গন্ধ শুঁকল, তারপর বলল—"হা ভগবান! এটা দেখছি পাম অলিভ—বেশ দামী সাবান, আমি আপনাকে পঞ্চাশ মার্ক দেব।"

আমি ওর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকালাম। মেয়েটি তারপর বলল—"আমি জানি এর জন্য অনেকে আশী মার্কও দিচ্ছে, তবে আমার অত নেই।"

আমি পঞ্চাশ মার্ক নিতে চাই না, কিন্তু মেয়েটি আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে, আমার কোটের পকেটে নোট গুঁজে দিল, তারপর পোস্টঅফিস থেকে দৌড়ে পালাল। মেয়েটি বেশ সুশ্রী, একটা বুভুক্ষ সৌষ্ঠব, যা মেয়েদের শরীরে একটা বিশেষ ধরনের তীক্ষ্ণতা আনে।

আমি পোস্টঅফিসে এবং বনের পথে যেতে যেতে যা দেখলাম তাতে বিদ্যালয়ের পোশাকপরা কাউকেও দেখতে পেলাম না। আর একটা বদ্ গন্ধ, সব মানুষের গায়েই বদ্ গন্ধ। কেন মেয়েটি সাবানের জন্য পাগল তা বুঝলাম।

আমি স্টেশনে গেলাম কিভাবে ওবরে সেনবাখে যাওয়া যায় জানবার চেষ্টা করি (সেখানেই আমি যাঁকে বিয়ে করেছি তিনি থাকেন), কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারে না। শুধু জানতে পারলাম যে আইফেলের ধারে বন থেকে জায়গাটা তেমন দূর নয়। কোথাও একটা ম্যাপ নেই যা দেখতে পারি, বোধ-হয় যুদ্ধের নেকড়েদের জন্য মানচিত্র রাখা নিষিদ্ধ। আমি সর্বদাই জানার চেষ্টা করতাম কোথায় কোন জায়গা, কিন্তু ওবরে সেনবাখ্ সম্পর্কে কিছুই ঠিকমত জানতে না পেরে খারাপ লাগল। বন-এ যা কিছু ঠিকানা জানা ছিল সর্বত্র ঘুরতে থাকি কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ডাক্তারও নন, পুরোহিতও ন'ন। পরিশেষে একজন ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের কথা মনে এল, যুদ্ধের ঠিক আগে

একজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। রোম নিয়ে তাঁর কি একটা অসুবিধা ঘটে, ফলে আমরা সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলাম। সেই রাস্তার নাম মনে নেই, তবে পথটা কোথায় তা মনে ছিল, আমি পপেলসড্রফ এ্যাভিন্যুতে গেলাম, তারপর বামদিকে, আবার বামে বাড়িটা খুঁজে পেলাম, এবং দরজায় নামটি পড়ে স্বস্তি পেলাম।

অধ্যাপক স্বয়ং দরজায় এলেন। লোকটি বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন, শীর্ণ, একটু কুঁজো হয়ে পড়েছেন, মাথার চুল সব শাদা।

আমি বললাম—"আপনি আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন না, অধ্যাপক মহাশয়, আপনার সেই রোম সংক্রান্ত ঝঞ্ঝাটের সময় আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে পারি?"

আমি ঝঞ্ঝাটের কথা বলায় তিনি হেসে উঠলেন—তারপর বল্লেন—"বলুন!"

আমি তার পড়ার ঘরে প্রবেশ করলাম—দেখলাম আর সেই রকম তামাকের গন্ধ নেই। অন্য সব দিক দিয়ে ঠিক সেই রকমটি আছে, সেই বই বোঝাই ঘর। আমি অধ্যাপককে বললাম—"শুনলাম শুধু নাকি পুরোহিত এবং ডাক্তারদের টেলিফোন আছে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে যে কোনো উপায়েই হোক আমাকে কথা বলতে হবে।"

তিনি আমার কথা সব শুনলেন, তারপর বল্লেন—"আমি একজন পুরোহিত বটে, কিন্তু যারা টেলিফোন পাওয়ার যোগ্য তা নই, অর্থাৎ আমি ধর্মীয় উপদেষ্টা নই।"

আমি বললাম—"আপনি হয়ত একজন যুদ্ধ নেকড়ে।"

আমার তামাক তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম, তিনি যেভাবে সেদিকে তাকালেন যে দেখে আমার মায়া হল। যখনই দেখি বুড়ো মানুষরা যা ভালোবাসতেন তা পান না তখনই আমি ক্লেশ বোধ করি। তিনি যখন পাইপ ভরছিলেন তখন তাঁর হাত কাঁপছিল, সে কম্পন তিনি বৃদ্ধ বলে নয়। শেষ পর্যন্ত যখন পাইপ ধরালেন—তখন আমার কোনো দেশলাই না থাকায় সাহায্য করতে পারিনি—তিনি বললেন: "শুধু ডাক্তার আর পুরোহিত নয়, চারদিকে সৈন্য-বাহিনীর জন্য যেসব মিউজিক হল খোলা হয়েছে সেখানেও ফোন আছে।" ঐ জাতীয় কোনো মিউজিক হলে চেষ্টা করা যেতে পারে। কাছাকাছি একটা

মিউজিক হল ছিল। চলে আসার সময় আমি যখন আর কয়েকটি পাইপ ভরবার মত তামাক রেখে এলাম তখন তাঁর চোখে জল—তিনি প্রশ্ন করলেন —আমি কি করছি তা কি বুঝি। আমি বললাম হাঁ বুঝি, আর যেন তাঁর রোমে প্রদর্শিত শৌর্যের প্রশস্তি হিসাবেই কয়েকটি পাইপভরা তামাক রেখে গেলাম। আমার জামার ভেতর তখনও চার পাঁচখানা সাবান লুকানো ছিল, তাঁকে দেওয়ার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল।

কিন্তু সাহস হল না। যদি তাঁর দুর্বল হৃদয়ে আঘাত লাগে, তাঁর শরীর দুর্বল, তিনি বৃদ্ধ।

'মিউজিক হল' কথাটি বেশ সংস্কৃতিসম্পন্ন অভিজ্ঞা। কিন্তু তা নিয়ে আমার ততখানি যন্ত্রণা নেই, যতটা যন্ত্রণাবোধ করলাম দোরগোড়ায় ইংরাজ শান্ত্রীকে নিয়ে। লোকটির বয়স কম, পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সে আমার দিকে কটমট করে তাকাল। সে একটি সাইনবোর্ডের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেই সাইনবোর্ডে লেখা আছে—'জার্মানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ'। আমি তাকে বললাম—"আমার বোন এর ভেতর কাজ করে। আমি এইমাত্র আমার স্বদেশে ফিরেছি, আমাদের বাড়ির চাবি আমার বোনটির কাছে।"

লোকটা আমার বোনের নাম জানতে চাইল, যে নামটি সব জার্মান নামের চেয়ে বেশীরকমের জার্মান সেই নামটা বলাই নিরাপদ বলে মনে হল আমার, আমি বললাম—"গ্রেৎসেন"।

লোকটি বলল—"হ্যাঁ, একটা ব্লণ্ড মেয়ে আছে বটে।"

তারপর প্রবেশানুমতি পাওয়া গেল। এই বাড়ির ভেতরকার বিবরণ দেওয়া থেকে আমি বিরত থাকব, আনুসঙ্গিক 'গার্লি' সাহিত্য, সিনেমা, টেলিভিসন প্রভৃতি পরিহার করে আমি 'গ্রেৎসেনে'র বিবরণও দেব না। তবে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে 'গ্রেৎসেন' মেয়েটি চতুরা, অতিক্রুত সে সব বুঝে নিল এবং একখণ্ড পাম অলিভ সাবানের বিনিময়ে কারসেনবাখের যাজকের বাসায় (আমার আশা ছিল যে এই মঠটি হয়ত আজো অবশিষ্ট আছে), টেলিফোন সংযোগ করে দিল। যাকে আমি বিয়ে করেছি তাকে টেলিফোনে টেনে আনল। গ্রেৎসেন টেলিফোনে বেশ জলদ ইংরাজী বলতে লাগল, আমাকে বুঝিয়ে দিল যে ওর বন্ধু সার্ভিস লাইনের মারফৎ সংযোগ করে

দেবে। সেইভাবেই বেশ তাড়াতাড়ি হল। অপেক্ষা করার সময় ওকে তামাক দিলাম, ওর কাছে কিন্তু এর চেয়ে ভালো জিনিস ছিল। আমি ওকে একখণ্ড সাবান আগাম হিসাবে দিতে চাইলাম। সে বলল—না, ও না হলেও চলবে, যখন টাকা চাইলাম, তখন সে কেঁদে ফেলল, বলল—ওর এক ভাই যুদ্ধ-বন্দী, আরেকজন মারা গেছে। আমার মনে করুণা এল, কারণ গ্রেৎসেনের মত মেয়েদের কাঁদলে ভালো দেখায় না। মেয়েটি আমার কাছে স্বীকার করল যে ওরা ক্যাথলিক। আর যেই সে ড্রয়ারের ভিতর থেকে প্রথম কম্যুনিয়নের ছবি টেনে বার করতে গেল, টেলিফোনটা বেজে উঠল।

গ্রেৎসেন রিসিভার হাতে নিয়ে বলল—"পাসটর।"

আমি কিন্তু শুনতে পেলাম যে এটা পুরুষ কণ্ঠ নয়। গ্রেৎসেন বলল—"একমিনিট ধরুন।" তারপর রিসিভারটা আমার হাতে তুলে দিল।

আমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলাম যে রিসিভারটি ধরতে পারি না, আমার হাত থেকে পড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে গ্রেৎসেনের কোলের ওপর পডেছিল, সে তুলে নিল। তারপর আমার কানের কাছে ধরতে আমি বললাম—"হ্যালো! তুমি, তুমি কথা বলছ?"

সে বলল—"হাঁ—কিন্তু কোথায় তুমি?"

আমি বললাম—"আমি এখন বনে—যুদ্ধ শেষ হয়েছে, অন্ততঃ আমার কাছে।"

সে বলল—"হা ভগবান! এ যেন বিশ্বাস হয় না। না, না, এ সত্য নয়।"

আমি বললাম—"না, এই সত্য। আমার চিঠি পেয়েছিলে?" সে বলল—"না—কি চিঠি?"

"ধরা পড়ার পর আমরা একটি চিঠি লেখার অনুমতি পেয়েছিলাম।"

সে বলল—"না, গত আট মাস, তোমার কোনো খবরই পাইনি।"

"যত সব শূয়োর, পাজী শূয়োর। আমাকে বলো ত কারসেনবাখ জায়গাটা কোথায়?"

"আমি"—এই পর্যন্ত বলে সে এত কাঁদতে লাগল যে আর কথা বলতে পারল না। আমি তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুনতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত সে বলল—"আমি তোমাকে বন স্টেশন থেকে তুলে নেব।"

তারপর আর কোনো কিছু শুনতে পেলাম না, কোনো কথা। কে যেন ইংরাজীতে কি বলল, তার একবর্ণও বুঝলাম না।

গ্রেৎসেন তার কানে রিসিভারটা তুলে নিল, এক মিনিট শুনল, তারপর মাথাটা নাড়ল। রিসিভার নামিয়ে রাখল। আমি ওর দিকে তাকালাম, বুঝলাম ওকে আর সাবান দেওয়া যায় না। ওকে ধন্যবাদও দিতে পাচ্ছি না। কথাটাই কেমন নির্বোধের মত শোনায়।

আমি অসহায়ের ভঙ্গীতে আমার হাতটা শূন্যে উঠালাম তারপর বেরিয়ে এলাম।

স্টেশনে ফিরে এলাম। আমার কানে সেই রমণীর কণ্ঠস্বর যা কখনো বিবাহের মত শোনায়নি।

সেই মঙ্গলবার—

উলফগ্যাং বোরখের্ট্

সপ্তাহে একটি মাত্র মঙ্গলবার—
সারা বছরে অর্ধশত ;
যুদ্ধে কিন্তু অনেক মঙ্গলবার।

সেই মঙ্গলবার—

স্কুলে ওরা বড়হাতের অক্ষর লেখা অভ্যাস করছিল। টিচার দিদিমণির চোখে পুরু লেন্সের চশমা, চশমাটি রিমলেস্।

চশমার কাঁচটা এমনই যে ওঁর চোখ দুটো কোমল দেখায়!

বেয়াল্লিশটি মেয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে মুখ করে বড অক্ষর লিখছিল।.

বুড়ো ফ্রিৎসের জলপানের জন্য একটা টিনের মগ ছিল।

যুদ্ধের কালে সব বাবারাই সৈনিক।

উল্‌লা জিভ্ দিয়ে নাকটা চাটছিল, টিচার দিদিমণি ওকে একটা ধাক্কা দিলেন। উল্‌লা, তুমি 'ওয়ার' কথাটি বানান করেছ একটা 'ও' দিয়ে, ওয়ার বানান করতে হয় 'এ' দিয়ে, যেমন 'গ্রে-এ-এ-ভ্'। আমি তোমাকে আগে কতবার বলেছি বলো ত? টিচার একটি বই হাতে তুলে নিয়ে উল্‌লার নাকের পিছনে একটা চিকে দিলেন। সম্পূর্ণ বাক্যটি আগামীকাল তোমাকে দশবার লিখতে হবে। বুঝলে? উল্‌লা বলল—হ্যাঁ, আর মনে ভাবে, আচ্ছা মানুষ যা হোক এই বুড়ো চশমাটা—

খেলার মাঠে দাঁড়কাকগুলো ফেলে দেওয়া রুটির টুক্‌রো ঠুকরোচ্ছিল।

লেফটেন্যান্ট ম্যালেরসকে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার তলব করেছেন।

—তোমার মাথা থেকে ঐ লাল রুমাল খুলে ফেলতে হবে হের ম্যালেরস!

—স্যার কি বলছেন?

—হ্যাঁ, ম্যালেরস। ঐ জাতীয় বস্তু সেকেণ্ড কোম্পানীতে তেমন চালু নয়।

—আমি কি সেকেণ্ড কোম্পানীতে বদলী হচ্ছি স্যার ?

—হ্যাঁ, ওরা এসব করেনি, ঐ রুমাল নিয়ে তুমি অব্যাহতি পাবো না। সেকেণ্ড কোম্পানীর ওরা আদব-কায়দায় ভারী কড়া। ভারী কড়া নজর সবদিকে ! সমস্ত কোম্পানী তোমাকে এড়িয়ে চলবে। কাপ্তেন হেস ওরকম কিছুই পারেন না।

—কাপ্তেন হেস কি আহত হয়েছেন নাকি ?

—না, না, ওঁর অসুখের খবর পাঠিয়েছেন। বলেছেন তেমন ভালো বোধ করছেন না। কাপ্তেন হওয়ার পর হেসের একটু বেশী ঢিলেমি এসেছে। এর কারণটা কি জানি না। আদব-কায়দার ব্যাপারে ও বরাবরই চোস্ত ছিল। যাই হোক, ভায়া ম্যালেরস, একটু চেষ্টা করে দেখ কি করা যায়। হেস ওদের ভালো রকম ট্রেনিং অবশ্য দিয়েছেন। আর ঐ রুমালটা, ওটা খুলে ফেল, কেমন ?

—নিশ্চয়ই স্যার !

—দেখো সবাই যেন যে যার সিগারেট সামলায়। চারদিকে জোনাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে কোনো তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী তাদের আঙুল স্থড় স্থড় করে। গত সপ্তাহে আমাদের মাথার জখমের সংখ্যা ছিল পাঁচ, এসব দিকে বেশ নজর রেখো। কেমন ?

—নিশ্চয়ই স্যার।

নাম্বার টু কোম্পানীতে যাওয়ার পথে লেফটেন্যাণ্ট ম্যালেরস তাঁর রুমালটি খুলে ফেললেন, একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর ঘোষণা করলেন—কোম্পানী কম্যাণ্ডার ম্যালেরস।

একটা গুলি ছোঁড়া হল।

হের নানসেন ফ্রয়েলাইন সেভেরিনকে বললেন—

—হেসকে এইবার একটা কিছু উপহার পাঠানো যাক। ধূমপানের জিনিস-পত্র, কিছু খাবার-দাবার, পড়ার বই, একজোড়া দস্তানা বা ঐ জাতীয় আর কিছু। এইবার ভারী কড়া শীত পড়েছে, বাইরে ওদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। অবস্থাটা যে কেমন তা আমার জানা আছে। আচ্ছা ধন্যবাদ।

—হের নানসেন, ওঁকে হয়ত হোলডারলিনও দেওয়া যায়।

—না না, ওসব কিছু তেমন কাজের জিনিস নয়। জিনিসটা বরং কিঞ্চিৎ

মিত্রসুলভ করা যাক। উইলহেলম বুস বা অন্য আর কিছু। হেস সব সময়েই হালকা ধরনের জিনিসপত্র পছন্দ করত, আচ্ছা! সেভেরিন। বাব্বা —কী রকম হাসত বলো ত হেস?

ফ্রয়েলাইন সেভিরিন বল্লেন—হ্যাঁ, ও হাসতে জানে বটে।

সেই মঙ্গলবার—

ওরা কাপ্তেন হেসকে ডেলকুসিং স্টেশনে একটা স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে এল,—দরজায় নোটিশ টাঙানো ছিল—

"জেনারেল কিংবা গ্রেনেডিয়ার
সবার মাথার চুলের এখানেই-শেষ"

কাপ্তেনের মাথাটি কামানো। ডাক্তারটার আঙুলগুলি দীর্ঘ এবং শীর্ণ, যেন মাকড়সার পা, একেবারে গাঁটের কাছটায় কিঞ্চিৎ লালাভ। কাপ্তেন হেসের গায়ে কি একটু মালিস লাগাল, সেটায় কেমন ওষুধের দোকান-দোকান গন্ধ। তারপর সেই মাকড়াসর পা তাঁর নাড়ী দেখল এবং একটা মোটা বই-এ লিখে রাখল। টেম্পারেচার ৪১'৬। পালস-১১৬। অচেতন। সন্দেহ হয় টাইফাস! ডাক্তার সেই মোটা বইটা বন্ধ করলেন। তার গায়ে লেখা আছে সংক্রামক ব্যাধির জন্য—স্মলেনস্ক্ মিলিটারি হাসপাতাল। তার নীচে লেখা আছে ১৪০০ শয্যা বিশিষ্ট।

স্ট্রেচারবাহকরা স্ট্রেচারটা তুলল। সিঁড়িতে কম্বলের ভেতর থেকে তাঁর মাথাটা বেরিয়ে পড়ল এবং প্রতিটি ধাপে নড়তে থাকে। মাথা কামান। চিরদিন এই ব্যাপারটিতে তিনি হেসেছেন। স্ট্রেচারবাহকদের একজনের ঠাণ্ডা লেগেছে।

সেই মঙ্গলবার—

ফ্রাউ হেস একজন প্রতিবেশীর বাড়ির দরজার ঘণ্টাটা বাজালেন। দরজাটা খোলা হতেই তিনি হাতের চিঠিটা নাড়তে লাগলেন—ওঁকে ওরা কাপ্তেন করেছে। উনি লিখেছেন কাপ্তেন ও কোম্পানী কম্যাণ্ডার। আর ওখানে নাকি চল্লিশ ডিগ্রীর মত তুষারপাত হয়। চিঠি আসতে ন' দিন লাগে। উনি চিঠিতে লিখেছেন "টু ফ্রাউ গ্রীস ফ্রম কাপ্তেন হেস"।

চিঠিখানি উনি তুলে ধরলেন। প্রতিবেশী কিন্তু সেদিকে তাকালো না। ৪০ ডিগ্রী তুষার, তিনি বললেন। আহা বেচারীরা ৪০ ডিগ্রী তুষার।

সেই মঙ্গলবার—

ব্রিগেডের ডাক্তার সংক্রামক ব্যাধির জন্য স্মলেনস্ক মিলিটারি হাসপাতালের চীফ মেডিক্যাল অফিসর কম্যাণ্ডিংকে বললেন—দিনে ক'জন করে হয়?

—প্রায় আধ ডজন।

ব্রিগেড ডাক্তার বললেন—কী ভয়ানক!

চীফ মেডিক্যাল অফিসর বললেন—হ্যাঁ, তা বটে—ভয়ানক।

কথা বলার সময় কেউ কারো মুখের পানে তাকালেন না।

সেই মঙ্গলবার।

ওরা ম্যাজিক ফ্লুট বাজাচ্ছিল। ফ্রাউ হেসের ঠোঁট দুটি রাঙিয়েছেন।

সেই মঙ্গলবার—

নার্স এলিসাবেথ তাঁর বাপ-মাকে লিখলেন—এই অবস্থা থেকে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া বাঁচার পথ নেই। কিন্তু জুনিয়র মেডিক্যাল অফিসর আসতেই ও উঠে দাঁড়ায়। এমনই তিনি নুয়ে পড়েছেন যে মনে হচ্ছে যেন সমগ্র রাশিয়াটাই তাঁর ওয়ার্ডে বহন করে চলেছেন—

নার্স প্রশ্ন করলেন—ওঁকে কি আরও দেব?

জুনিয়র মেডিক্যাল অফিসর বললেন—না। কথাগুলি উনি অতি ধীর ভাবে বললেন—যেন বলতে লজ্জা পাচ্ছেন।

এরপর ওরা কাপ্তেন হেসকে বাইরে নিয়ে গেল। বাইরে একটা আওয়াজ হল। ওরা ওভাবেই ফেলে দেয়। মৃত মানুষকে বেশ ধীর ভাবে ফেলে না কেন? সব সময়েই মৃত মানুষকে ঐ ভাবে ফেলে দেয়। কথাটা ওদের মধ্যে একজন কে বলছিল। তারপর কে যেন কোমল কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

ট্রা, ট্রা রস, ট্রা, রা রী—
সব চেয়ে সেরা হল ইনফানট্রি॥

জুনিয়র মেডিক্যাল অফিসর প্রতিটি বেডে রোগীদের দেখছেন। প্রতিদিন। প্রতিটি দিনে এবং রাতে। সমস্ত দিন ধরে। সমস্ত রাত ধরে। উনি অবনত হয়ে চলছেন। তার ওয়ার্ডের মধ্যে সমস্ত রাশিয়াকে বহন করে চলেছেন। বাইরে স্ট্রেচারবাহকরা শূন্য স্ট্রেচারটা নিয়ে হোঁচট খেল। একজন বলল চার নম্বর। ওর ঠাণ্ডা লেগেছে।

খোলা ডেসপ্যাচ

ইল্সে আইখইনগার

সামরিক সদর দপ্তর থেকে দীর্ঘকাল কোনো রকম নির্দেশ আসেনি, মনে হচ্ছিল শীতটা এখানেই কাটাতে হবে। আশপাশের উন্মুক্ত অংশে তখনও গাছ থেকে শেষ ফলন্ত জাম ঝরে পড়ছে আর নীচের শ্যাওলায় জমে পচ্ছে। যারা অগ্রগামী বাহিনীর রক্ষী তারা নিরালায় বৃক্ষশিরে বসে আছে আর ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। শত্রু নদীর ওপারে, আক্রমণ করার লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এর পরিবর্তে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ে, আর প্রতিদিন প্রাতে খাদ থেকে ওঠা কুয়াশা গাঢ়তর হয়ে ওঠে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর দু-একজন তরুণতর স্বেচ্ছাসেবক অনেক সূর্য অনেক চন্দ্র দেখেছে কিন্তু এই জাতীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের পক্ষে তারা যে যোগ্য একথা মনে করে না। বিনা নির্দেশেই আক্রমণ চালানোর জন্য তারা দৃঢ় সংকল্প, প্রয়োজন হলে তুষারপাতের আগেই তারা আঘাত হানতে চায়।

তাই, কিছুকাল পরে, ওদের মধ্যে একজনকে যখন একটি ডেস্‌প্যাচ (সামরিক সংবাদ) দিয়ে হেড কোয়ার্টার্সে পাঠালেন ডিভিসন্যাল কমাণ্ডার তখন ওর মনে একটা আশংকা জাগল। ও জানত যে অন্য সব বিষয়ে যতই শিথিল মনে হোক, বিদ্রোহ দমনে ওদের হাত বেশ দৃঢ়। জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্সে ডেসপ্যাচটি পৌঁছে দেওয়ার পর ওকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়, সেই ব্যাপারে ওর মনে হয় যে ওকে রীতিমত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তার ফলে ওর মনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়।

সেই কারণে, ওর বিস্ময়ের ঘোর আরও বৃদ্ধি পেল যখন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওর হাতে একটা সীল আঁটা চিঠি দিয়ে বলা হল যে চিঠি-খানি রাতের আগেই ডিভিসনে পৌঁছে দেওয়া চাই। ওকে একটি সোজা পথ দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। মানচিত্রের প্রতি নির্দেশ করে যেসব অঞ্চল-গুলিতে যুদ্ধ চলছে তা দেখানো হল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন পথপ্রদর্শককে ওর সঙ্গে দেওয়া হল। খোলা জানলা দিয়েই যে পথ দিয়ে ওকে যেতে হবে

তা দেখতে পাচ্ছিল। সামনেই সেই পথ পড়ে আছে। পথটি পরিষ্কার অঞ্চল থেকে আড়াআড়িভাবে বেরিয়ে যেন লীলাচ্ছলেই হেজেল কুঞ্জের মধ্যে মিশিয়ে গেছে। সতর্কবাণীর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করায় লোকটি প্রীত হয়েছে। এর অল্পক্ষণ পরেই ওরা পথে বেরিয়ে পড়ল।

তখন সবে দুপুর অতিক্রান্ত। মেঘের ছায়া বিচরণশীল পশুর মত ঘাসের ওপর ছায়া ফেলছে এবং নিঃশব্দে ঝোপের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছে। পথটি অতি বিশ্রী এবং মাঝে মাঝে অনতিক্রমণীয়। তার ওপর মাঝারি রকমের ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল। যে মুহূর্তে ড্রাইভার গাড়িটার গতিবৃদ্ধি করেছে তখনই গাছের ডালপালা এসে চোখে লাগতে থাকে। এই অরণ্য যেন কাঠকুড়ানীদের মুখ চেয়ে বসে আছে—এমন কি ঝোপ-ঝাড়ের মাঝ থেকে যে নদীর গভীর রূপ চোখে পড়ছিল সেও যেন ভান করে আছে সে কিছুই জানে না। পাহাড়ের গায়ের কাষ্ঠখণ্ডগুলি সেই মধ্যাহ্ন রোদে চক্‌চক করছে। প্রকৃতির মধ্যে সীমান্ত সম্পর্কে কোনো সচেতনত্ব নেই।

পরিচ্ছন্ন প্রান্তরগুলি দ্রুত অতিক্রম করার দিকেই ওদের আগ্রহ। গাছের গতির ফাঁকে ফাঁকে এমনই প্রান্তর ধরা পড়ে, তার মধ্যে অরণ্যের ভিতরটাও দেখা যায়। ওদিকে পাহারাদের নজরেও ধরা পড়ে যায়। গাছের শিকড়ে জিপটাকে লাফিয়ে ওঠালো ড্রাইভার আর প্রায় প্রতিমুহূর্তেই এইভাবে মোড় নিচ্ছিল যে ডেসপ্যাচসহ মানুষটি কেবল দেখতে থাকে তার বোঝা ঠিক আছে কিনা। এই দৃশ্য কিন্তু অপর সবাইকে বিরক্ত করে আর লোকটি নিশ্চিত হয়ে ভাবে যে ওপরওলারা তাকে বিশ্বাস করে না।

এই ডেসপ্যাচের ভিতর কি আছে ? শোনা গেল যে ভোরবেলায় অগ্রগামী পাহারা দল নদীর অপর পারে লোক চলাচল লক্ষ্য করেছে। তবে এই জাতীয় গুজব সব সময়েই শোনা যায় এবং একথাও সম্ভব যে জেনারেল স্টাফ হয়ত সবাইকে ঠাণ্ডা রাখার উদ্দেশ্যেই এসব কথা উদ্ভাবন করেছেন। এমনও হতে পারে ওর হাত দিয়ে এই ডেসপ্যাচটা পাঠানো একটা ভাঁওতা মাত্র। ওর সহিষ্ণুতার প্রতি একটা বিশ্বাস দেখানো হয়েছে। কিন্তু যদি কোনো অপ্রত্যাশিত সংবাদ থাকে তাহলে তা ডেসপ্যাচের ভেতর থেকে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়বে। সে মনে মনে ভাবল যতক্ষণ শত্রুর নজরের ওপর দিয়ে এইভাবে মোটর চালিয়ে চলা যাচ্ছে তারই মধ্যে ডেসপাচের ভেতরে কি আছে দেখে নেওয়া

বরং ভালো। যদি কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় তখন এমনই একটা কিছু না হয় বলে দেবে। পকেট হাঁতড়ে খামটা খুঁজতে লাগল, খামের ওপরকার সিলমোহর হাতে ঠেকে। সেই পড়ন্ত আলোকে ডেসপ্যাচটি খুলে পড়ার লোভ প্রবল জ্বরের মত ওকে আক্রমণ করল।

সময় নেওয়ার উদ্দেশ্যে সে তার সঙ্গীকে আহ্বান করল তার আসনটি ওর সঙ্গে পালটে বসার জন্য। যতই এগিয়ে চলে লোকটি ততই শান্ত হয়ে পড়ে। প্রায় একঘণ্টা হতে চলল বনের বাইরে যাওয়া যায়নি। মাঝে মাঝে রাস্তায় খোওয়া বোঝাই হয়ে পড়ে আছে, যে কৃত্রিম কনক্রিট প্রাচীর তৈরী হয়েছিল তা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা যে গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে গেছে এই তার লক্ষণ। এই নৈকট্য লোকটিকে অধিকতর শান্ত ও সমাহিত করল। সে মনে মনে ভাবল ডেসপ্যাচটি খুলে দেখার প্রলোভন হয়ত সে জয় করতে পারবে। ও বেশ শান্তভাবে এবং বিশ্বাস মনে নিয়ে গাড়ি চালায়।

ঠিক যেখানে গাড়িটা একটা আত্মহত্যামূলক ডুব দিয়ে নীচের দিকে নামে সেই জায়গাটাও ওরা অক্ষত শরীরে পার হয়ে এল। কিন্তু তার ঠিক পরেই একটা জলার ওপর এসে জীপটার গতিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। পাখিদের ডাকে আশপাশের নৈস্তব্ধ্যকে আরো গভীর করে তোলে। চারদিকে অজস্র ফার্ন গাছ জন্মেছে, ওরা জীপটাকে টেনে মুক্ত করল। সঙ্গের যুবকটি গাড়ির যে ত্রুটীর ফলে আরও এগিয়ে যেতে পারছে না তা সংস্কার করার চেষ্টা করল। লোকটি গাড়ির নীচে চলে যেতেই ও সীল ভেঙে ডেসপ্যাচটি খুলে ফেলল। সীলটাকে অক্ষত রাখার কোনো চেষ্টাই করল না। জীপের কাছে অবনত হয়ে সে পড়তে লাগল ডেসপ্যাচে হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন পত্রবাহককে গুলি করে মারা হয়।

অপর লোকটি গাড়ির নীচ থেকে বেরিয়ে আসার আগেই ও তাড়াতাড়ি ডেসপ্যাচখানি নিজের ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

বেশ খুশীর ভাব নিয়ে ও বলল—'সব ঠিক ত!' তারপর জানতে চাইল ও এইবার গাড়ি চালাবে কিনা। ওর সহচর বলল—'হাঁ, তাই হবে।' গাড়িটা চালু হতেই লোকটি ভাবতে থাকে এখনই গুলি করবে না যখন ষ্টীয়ারিং ধরবে তখন? ওকে যে সামরিক পাহারায় রাখা হয়েছে সেই বিষয়ে মনে আর এতটুকু সন্দেহ রইল না।

একদম নীচে এসে রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেছে যেন সংকটময় উৎরাইটুকুর জন্য যেন অনুশোচনা হয়েছে, তারপর মৃদু গতিতে চড়াই-এ উঠেছে। লোকটি ভাবতে থাকে—'আত্মহত্যার আত্মাকে দেবদূতরা ওপরে ভাসিয়ে রেখেছেন।' ওরা ওকে কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করবে, যা সম্পূর্ণ আইনগত তা একটা অপরাধে দাঁড়াবে। বিনা আদেশে কাজ করার অপরাধ হবে। এই কথাটা ভেবে ওর মনে বিস্ময় জাগে যে ওকে নিয়ে ওদের কত মাথা ব্যথা।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে ও দেখতে পায় ওর সামনের লোকটির দেহের বহিরেখা। ওর মাথা, ওর কাঁধ, ওর হাতের গতিবিভঙ্গ—দেহ-বঙ্কিমার এই অপরিহরণীয় রূপ ওর কাছে প্রচ্ছন্ন ছিল। পরিচিত বস্তুর দেহ-বঙ্কিমা অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ড্রাইভার ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—'আজকের রাতটা আমাদের চুপচাপ কেটে যাবে।' কথাটা কেমন যেন ঠাট্টার মত শোনায়। কিন্তু লক্ষ্য-স্থলের নৈকট্য লোকটিকে যেন বক্তা করে তুলেছে, সে জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই বলে যায়—'আমরা যদি নিরাপদে ওখানে পৌঁছাই'—লোকটি এইবার বেল্ট থেকে রিভালবারটি বার করে, বনের ভেতর এতই ঘোর অন্ধকার যে মনে করা যায় ইতিমধ্যে রাত্রি নেমে এসেছে। ড্রাইভারটা বলতে থাকে—'আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাকে সর্বদাই স্কুলের ছুটির পর বনের ভিতর দিয়ে যেতে হত, আর সন্ধ্যা হলেই আমি উচ্চৈস্বরে গান করতাম।'

অপ্রত্যাশিত দ্রুত তালে ওরা শেষ প্রান্তরে এসে পৌঁচেছে। লোকটি ভাবে একবার আমরা এই অঞ্চলটুকু অতিক্রম করলেই বনভূমি আবার বেশ ঘন হয়ে উঠবে, তারপর একেবারে গিয়ে পড়বে অগ্নিদগ্ধ গ্রামের ভেতর, সেই-খানেই ডিভিসনের ছাউনী পড়েছে—এই শেষ প্রান্তরটি আগের আর সবগুলির চাইতে প্রশান্ততর, নদী অনেক কাছ থেকেই চক্ চক্ করছে। প্রান্তরের ওপর মাকড়সার জালের মত চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো সোজা পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পথটিকে অনেক কাল আগে চলে যাওয়া গোরুর গাড়ির চাকার দাগ ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে। শুখ্‌নো সেই দাগ চাঁদের আলোয় মৃত্যু-মুখোসের উল্‌টো দিকটার মত দেখাচ্ছে। লোকটি নদীর দিকে তাকিয়ে সহসা সচেতন হয়ে উঠল যে এই পৃথিবীতে শত্রুর মুখের ছাপ পড়ে আছে।

হাঁটুর ওপর থেকে লোকটি সামনের দিকে রিভলবারটি তাক করে, তাই প্রথমবার গুলি ছোঁড়ার সঙ্গেই ওর মনে হল গুলিটা যেন একটু বেশী আগে-ভাগেই বেরিয়ে গেল। কিন্তু যদি সামনের লোকটির আঘাত লেগে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে ওর প্রেতটির উপস্থিতবুদ্ধি প্রবল কারণ সে আরও দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। ওর পক্ষে একটু বেশী সময় লেগে গেল বুঝতে যে আঘাতটা ওর নিজের অঙ্গেই লেগেছে। ওর হাত থেকে রিভালবারটা পিছলে পড়ে গেল—ওর হাতটা যেন শূন্যে প্রলম্বিত। ওরা আবার বনভূমিতে পৌঁছানোর আগে আরো কয়েকবার গুলি ছোঁড়া হল, কিন্তু সব সময়েই আঘাত লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাল না।

সামনের প্রেতটি তার প্রসন্ন মুখখানি ওর দিকে মেলে বল্‌ল—'আমরা এইটুকু কাটিয়ে এসেছি ভাগ্যক্রমে বল্‌তে হবে। প্রান্তরটা একেবারে রণাঙ্গনের লাইনের ভেতর পড়েছিল।'

লোকটি বলে ওঠে—'থামাও।'

ছেলেটি বল্‌ল—'না, বনের আরো একটু গভীরে যাই।'

গভীর হতাশায় লোকটি বলে—'আমার আঘাত লেগেছে।'

ওর সহচর এদিকে না তাকিয়েই আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সহসা গাড়িটা থামায়। সে আঘাতটুকুতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রক্তপাত বন্ধ করতে পারল। তারপর সে একমাত্র সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করল—'আর একটু পরেই আমরা পৌঁছে যাব।'

লোকটি ভাবে, এই আহত সৈনিকের মৃত্যু সুনিশ্চিত। সে বলল—'দাঁড়াও!'

ছেলেটি অসহিষ্ণু গলায় বলে—'আবার কি হল?'

লোকটি জবাব দেয়—'সেই ডেসপ্যাচ।' বা হাত দিয়ে বুক পকেটের ভেতরটা হাঁতড়ায়। গভীরতম হতাশার মুহূর্তে সে নির্দেশের একটা নতুন অর্থ করে। ডেসপ্যাচে নির্দেশ আছে পত্রবাহককে গুলি করে মারতে হবে, কোনো নাম নেই।

সে বলল—'আমার জামাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, তুমি এই ডেসপ্যাচটা তোমার কাছে রাখো।'

ছেলেটি যদি নিতে না চায়। তাহলে সব কিছুই এইখানে এই মুহূর্তেই

স্থির হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত স্তব্ধতার পর সে অনুভব করল একজন তার হাত থেকে চিঠি নিয়ে নিল।

ছেলেটি বলল—'ঠিক আছে।'

শেষ আধ ঘণ্টা নীরবে কাটল। সময় এবং এই গাড়িটা যেন নেকড়ে বাঘকে ছিন্ন করছে। এলিসিয়ানের মাঠে মেষগুলি নিরাপদে বিচরণ করছে কিন্তু এই এলিসিয়ানের মাঠ আবার কাঁসুড়ের মাঠেও পরিণত হবে।

যে অঞ্চলটিতে ডিভিসনের ছাউনী পড়েছে, সেইখানটায় পাঁচখানি বাড়ি নিয়ে একটি গ্রাম ছিল, আগেকার সংঘর্ষেই এর মধ্যে তিনখানি পুড়ে নষ্ট হয়েছে। বাড়িগুলির ঔজ্জ্বল্য থেকে বোঝা যায় যে কুমারী সন্ধ্যা তখনও রাত্রির কাছে পরাভূত হয়নি। এই অঞ্চলটির চারপাশ বনভূমিতে বেষ্টিত, ঘাসগুলি গুলি-গোলার পীড়নে আর গাড়ির চাকার চাপে দলিত। একটা কাঁটাতারের বেড়া ছাউনীকে বনভূমি থেকে পৃথক করে রেখেছে।

প্রবেশ পথে শান্ত্রী যখন প্রশ্ন করল—'কি এনেছ?'

ছেলেটি তখন জবাব দিল—'একটি আহত সৈনিক আর একটা ডেসপ্যাচ।'

পল্লীর চৌমাথায় ওরা সোজা চলে যায়। জিপের ভিতরকার লোকটি উঠে বসবার উদ্যোগ করে—তার মনে পৃথিবীর আর সব জায়গার মত এই জায়গাটি অন্তত একটা কাম্য অঞ্চল বলে মনে হয় না। এই সব জায়গা প্রস্থানের কেন্দ্র হিসাবেই অধিকতর পরিচিত। সে শুনতে পায় একটি কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করছে—'লোকটার জ্ঞান আছে?' তারপর সে চোখ বুজিয়ে থাকে। সময় কাটানোটাই এখন সব চেয়ে বড় কথা।

কোনোরকম জবানবন্দী করার আগে নতুন শক্তি সে আহরণ করতে পারবে, পলায়নের নতুন অস্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। যখন ওরা ওকে গাড়ি থেকে নামাল তখন ও তাদের কাঁধে ঝুলে রইল।

প্রাঙ্গনের প্রান্তে একটি বাড়িতে ওকে ওরা নিয়ে গেল। সেখানে একটি কুয়া আছে। দুটি কুকুর গন্ধ শুঁখতে শুঁখতে ওর দিকে এগিয়ে এল। ওর ক্ষতটার জন্য যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। একতলার একটা বেঞ্চে ওরা ওকে শুইয়ে রাখল। কোনোরকম আলো জলছে না, সবকটি জানালা উন্মুক্ত।

ড্রাইভার বলল—'তোমরা ওকে দেখ, আমি আর সময় নষ্ট করতে চাইনা।'

লোকটি আশা করেছিল ওরা এইবার ক্ষতস্থানটা ড্রেস করে বেঁধে দেবে।

কিন্তু একটু সতর্ক হয়ে চোখ মেলতে দেখল সে একাই শুয়ে আছে, আশে পাশে কেউ নেই। হয়ত ওরা ব্যাণ্ডেজ আনতে গেছে। বাড়িটায় কেবল লোক জন আসা যাওয়া করছে। দরজা বন্ধ হচ্ছে, কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত। কিন্তু এই সব আবেগের আবার একটা নিজস্ব স্তব্ধতা আছে, আর পাখির কলরবের মত কেবল স্তব্ধতা বৃদ্ধি করে। লোকটি সবিস্ময়ে ভাবে—'ব্যাপারটি কি?' তারপর যখন কয়েক মিনিট পরেও কেউ আর এল না তখন সে তৎক্ষণাৎ পালানোর সম্ভাবনা চিন্তা করতে থাকে। হল ঘরে রাইফেল সাজানো আছে। ও শান্ত্রীকে বলবে যে হেড কোয়ার্টাসে নতুন একটা সংবাদ পাঠানোর কাজে ওকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ওর কাছে সব দলিলপত্র আছে। ও যদি তাড়াতাড়ি কাজ সারে তাহলে কে আর ওর কি করতে পারে।

ও উঠে বসে এবং ভাবে যে দুর্বলতার ভাণ এতক্ষণ করেছিল তা কত প্রবল। অসহিষ্ণুভাবে মাটিতে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, নিজের দেহটা উঁচু করে কিন্তু তার দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। আবার বসে পড়ে ও দ্বিতীয়বার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে।

এই প্রচেষ্টার ফলে ড্রাইভার প্রদত্ত সেই ব্যাণ্ডেজ খসে পড়ে এবং ক্ষতস্থানটা উন্মুক্ত হয়ে গেল। একটা প্রচ্ছন্ন কামনার মত বেগে তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সে অনুভব করে যে রক্ত তার সার্টটাকে সিক্ত করে বেঞ্চটাকেও ভিজিয়ে দিয়েছে, সে আবার বেঞ্চে শুয়ে পড়ে। এই গোলাবাড়ির চুনকাম করা দেওয়ালের ওপর থেকে আকাশটা ও দেখতে পায়। ঘোড়াগুলিকে যখন আস্তাবলে এনে রাখা হচ্ছে তখন তাদের ক্ষুরের শব্দ শুনতে পায়। বাড়িটায় হট্টগোল বেড়ে চলে, সেই সঙ্গে হৈ চৈ, যেন একটা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে গেছে। জানলার কাছ পর্যন্ত উঠে গিয়ে ও আবার পড়ে গেল। ও চীৎকার করে ডাকে, কেউ কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় না। ওরা সবাই ওকে ভুলে গেছে।

সেইভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে ওর মনের সেই বিদ্রোহী ভাবটা কেটে গিয়ে একটা উচ্ছল আনন্দের ভাব জেগে ওঠে। রক্তক্ষরণ জনিত মৃত্যুর অর্থ যেন তালা আঁটা দরজাভেদ করে পলায়ন। সব শান্ত্রীকে কলা দেখিয়ে পালানো। ঘরটিতে সামনের দেওয়ালের প্রতিফলনে সামান্য আলো হয়েছে, যেন প্রতিবিম্বিত তুষার আত্মপ্রকাশ করেছে আর সব কিছু ত্যাগের মধ্যে

এই যে জীবনবাহী প্রাণ কণিকার ক্ষরণ এই কি সর্বশ্রেষ্ঠ সংঘাত নয়? ওর নিজের জন্যই এ কাজ ও করেছে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, তাই যে দণ্ড ও পেয়েছে তা নায্য বলা যায়। সীমান্তে প্রতীক্ষার পূর্ণ দুর্ভোগ যখন সে ভুগেছে তখন এর নামই মুক্তি।

দূরে কোথায় গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। লোকটা চোখ খুলে ভাবে। ঐ ডেসপ্যাচটা ওর হাতে দেওয়া নির্বোধের মত কাজ হয়েছে। ওরা একটা ভুল মানুষকে মেরে ফেলেছে, আর এখানে ও রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুর পথে চলেছে। ওরা পোড়া দরজার মধ্যে দিয়ে অন্য লোকটাকে টেনে নিয়ে চলেছে, হয়ত ইতিমধ্যে ওর চোখ বেঁধে দিয়েছে। শুধু ওর মুখটা সবিস্ময়ে খোলা আছে, ওরা রাইফেল তুলল—লক্ষ্য করছে—হুঁশিয়ার!

যখন জ্ঞান হল সে বুঝল তার ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে। ও ভাবল যে মানুষটা রক্তপাতের ফলে মরে যাওয়ার কথা তাকে কোনো দেবদূত ফালতু সেবা করেছেন, এই করুণার অভিব্যক্তি একটু দেরীতে এসেছে।

ড্রাইভারটা ওর মুখের কাছে ঝুঁকে দেখছিল ও তাকে বল্‌ল—

'আবার আমাদের দেখা হল।'

বিছানার প্রান্তে একজন ষ্টাফ অফিসারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার আগে ও বোঝেনি যে মারা যায়নি।

সে বল্‌ল—'সেই ডেসপ্যাচ! ডেসপ্যাচটার কি হল?'

অফিসার বল্লেন—'গুলির আঘাতে একটু নষ্ট হয়ে গিছল, তবে পড়া গিয়েছে।'

লোকটি বলল্—'চিঠিটা আমারই দেওয়ার কথা।'

ড্রাইভার বাধা দিয়ে বলে ওঠে—'আমরা ঠিক সময়েই পৌছেছিলাম, ওপারের ওরা একটা পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ স্বরু করেছিল।'

ষ্টাফ অফিসার যাওয়ার জন্য ফিরেছিলেন, ঘুরে বল্লেন 'আমরা চূড়ান্ত সংবাদটুকুর অপেক্ষায় ছিলাম!' তারপর দোরগোড়ায় গিয়ে তিনি আর একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—

'ডেসপ্যাচটায় কি লেখা ছিল তা তুমি জানতে না, ভালোই হয়েছে। লড়াই স্বরু করার জন্য আমাদের একটা অদ্ভুত কোড্ বা সংকেত আছে।'

ছাদের ওপর

গারহার্ড ৎভেরেনৎস

আমার লাইপজীগ ছাড়ার শেষ মুহূর্তে চারতলায় এক চিলে কুঠুরির একটা এঁদো ভাড়া করা ঘরে আমি থাকতাম, বাড়িটা ছিল অবসারভেটারী ষ্ট্রীটে। বাড়িটা পুরানো নয়, আমার অনুমান বড়জোর একশো বছর হবে। তবে বাড়িটা মফঃস্বলের ডঙ-এ কেমন অমিত্রজনোচিত ভঙ্গী, নিরাভরণ, কোনাকুনি, সিঁড়িগুলো অন্ধকার, চামচিকের নোঙরা বিষ্টায় পরিপূর্ণ। উঠানটা তিন হাত চওড়া, তার চারপাশে একটা পোড়া বাড়ি, তার জানালার শূন্য খোপ এবং প্রলম্বিত কড়িকাঠ একটা আতিথ্যহীনতার ভাব মনে জাগায়।

এই বাড়িটার সঙ্গে কালের কোনো রোমান্স বিজড়িত নয়, তবে এত সব অসম্পূর্ণতা এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও আলো বাতাসহীন একটা জীবন্ত মেশিন—বাড়িটার চারদিক নীচের তলায় গন্ধে ভরপুর। এই বাড়িটার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, টাউন হলে একটা মানচিত্র টাঙনো আছে, সেখানে দেখা যাবে অবসার-ভেটারী ষ্ট্রীটের কি ভাবে একদিন পুর্ণবিন্যাস হবে এবং সেই বছর এই বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে। আমি এই বাড়িটার আসন্ন মৃত্যুর কথা যদি ভেবে থাকি, তাহলে তার কারণ আমি তার চিলেকোঠায় থাকতাম। এখান থেকে, বারান্দা থেকে একটা বিচিত্র চিত্র দেখা যায়। বাড়িগুলি ঘেঁষাঘেঁষিতে ঘনিষ্ঠ, বোধহীন পশুর মত অবিন্যস্ত ভঙ্গীতে পাশাপাশি ঠাসা। ওরা আকাশের দিকে পিঠ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এর মাঝামাঝি গির্জা-তোরণের শীর্ষ উর্ধ্ব-বাহু হয়ে দুটি হাত আকাশে মেলে দিয়েছে। যেন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

নীচের তলার চাইতে ওপরকার এই ছাদের ওপর যারা বাস করে তাদের জীবনধারা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। যেদিন আকাশে মেঘ থাকে সেইদিন শুধু পিছনের এবং সিঁড়ির ছায়া-মূর্তি আমাদের দিকে গুঁড়ি মেরে আসে। যাই-হোক আমরা যারা ওপর তলায় ভাড়াটিয়া তাদের এক রকম বিশেষ ধরণের সুবিধা প্রাপ্ত শ্রেণী বলা যায়। আলো আর বাতাস আমরা প্রচুর পরিমাণে

পাই। আমার হাত বাড়িয়ে আমি আমাদের এই বারান্দা থেকে হাত বাড়াতে পারি নীচের পানে, সেখানে ঘাস আর-আগাছা উৎসাহভরে গাজিয়ে ওঠে। ছাদের ওপর সবুজ এবং হলদে ছাপ গজায়, যেন শহরের ওপরে একটা উদ্যান রচনার ভূমিকা—এ উদ্যান শুধু পাখীদের আর চিলেকুঠুরীর বাসিন্দাদের জন্য।

যখন সূর্য ওঠে, আমি ইস্ত্রী করার একটা কাঠ টেবল থেকে জানালা পর্যন্ত লাগিয়ে তার ওপর শুয়ে থাকি, আমার অঙ্গে থাকে সাঁতার কাটার পোষাক। সেখান থেকে আমি শহরের ছাদগুলি দেখি, পাখিদের হালচাল লক্ষ্য করি আর আমাদের বাড়িওয়লীর বিড়ালটার সঙ্গে কথা বলি, ছাদের ওপরকার সেই প্রকৃত অধীশ্বরী। এবং সর্বদাই আমাকে একবার দর্শন দিয়ে যেতে ভালোবাসে।

দর্শন! কিংবা আগমন! আমি আরো অনেকরকম আগমনে ধন্য। দূর শহর থেকে এরা ওরা মেলা দেখতে আসে, সেইসব অঞ্চল এখন বিদেশী হয়ে গেছে। যে সব লোককে জীবনে একবার মাত্র দেখেছি, অনেক অনেক বছর আগে দেখেছি, কিংবা অনেক বছরে একবার। যে সব রমণীকে একদা জানতাম অনেক বছর আগে ভালোভাবে জানতাম, তারা আসে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসে বসবার ঘরে বসে বসে তারা সত্যি হাঁফায়। ও তুমি তাহলে এইভাবে থাকো! মনে আছে সেই সেবার আমরা যখন একত্রে ছিলাম। সেই সময়ের কথা মনে আছে? তারপর তারা চলে গেলে আমি বারন্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম কিভাব রাত্রি এসে ধরণীকে গ্রাস করছে। সেই সময়? সেই সময়ের কথা! হাঁ, সেই সময়—তারপর নিরাপদ পথ বেয়ে উঠে আসে সেই বিড়াল। আমার বাড়িওয়ালীর বিড়াল, কোনো নাম নেই, ওর নাম শুধু বিড়াল। আমি প্রথমটায় বিস্মিত হয়েছিলাম। কোনো একটা জাতি প্রাণী যে তার জাতিবাচক নামে সাড়া দেয় তা জানা ছিলনা।

আমি স্বীকার করি আমার অতিথিবর্গ আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আমি একটা স্বস্তির স্বাদ অনুভব করতাম। আর সে জিনিষ নেই যা একদা সুরু হয়েছিল। আমি আমার উচ্চতায় অধীষ্ঠিত—ছাদের দৃশ্য দেখছি—এখানে পাখিদের সমাজ, একটি বিড়াল, আর এক অন্ধ স্ত্রীলোক।

প্রথমটায়, যখন আমি মাত্র তিনদিন উঠে এসেছি, আমার পা চুলকাতে

লাগল। মাসটা বোধ হয় জুন, সূর্য একেবারে জ্বলন্ত, আর এই সময়টা বোধ হয় মাছি বৃদ্ধি হয়। অনেক পরে তবে আমি এসব জেনেছি। গরমের দিনে আমি বিনা মোজায় পথে বেরিয়ে পড়তাম। আর আমি বুঝতে পারলাম যে এই সব ক্ষুদ্র প্রাণী অধিকাংশ সময় পায়েতেই আশ্রয় নেয়। আমি বিড়ালটাকে বেশ করে পরীক্ষা করলাম—হ্যাঁ, একেবারে মাছিতে বোঝাই।

পশুদের বিষয় আমার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। শহুরে লোক হিসাবে এই সর্বপ্রথম বেড়ালে-মাছির সঙ্গে আমার পরিচয়, আর আমার ত' কোনো-দিন বিড়াল ছিল না, জানবোই বা কি করে। প্রথমেই মনে হল যে আমার বাড়িওয়ালী অন্ধ, তিনি বেড়ালে-মাছি দেখতেই পান না। এই চিন্তা আমার মন ভরে রইল। অনেক দিক থেকে যারা দেখতে পায় তাদের চেয়ে অন্ধ মানুষের সঙ্গে কাটানো অনেক সুখকর। অন্যদিক থেকে আবার ভীষণ কঠিন। অতিশয় সর্তকতার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা তাঁকে জানলাম। তারপর যখন বুঝলেন তখন তাঁর চওড়া মুখের উপর লাল রক্ত ফেটে উঠল। লজ্জিত হয়ে আমি মাথা নিচু করলাম।

আমি আবিষ্কার করলাম যে মনুষ্যকুল কদাচিৎ এইসব পশুগাত্রস্থিত মাছির আক্রমণে কষ্ট পায়। হয়ত আমার দৈহিক রক্তের বিস্ময়কর সমাবেশে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই কথা বাড়িওয়ালী বল্‌বেন। কারণ তিনি নিজে কখনও কিছু অনুভব করেন নি। আমি একটা পাউডার কিনে এনে বিড়ালটার গায়ে ছড়িয়ে দিলাম। দুঃখের বিষয় এই পাউডারে তেমন কোনো কাজ হলনা। কেমিষ্ট আমাকে উপদেশ দিলেন ঘরের মেঝেটা পেট্রোল দিয়ে ঘসতে। তার ফলেই ধীরে ধীরে মাছির উৎপাত কমল। এমন কি বিড়ালটাও যেন সুস্থ বোধ করল।

আমার বাড়িওয়ালীর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল। আগে আমরা দু-চারটে মামুলী কথা বলতাম মাত্র। এখন এই মাছিঘটিত আলাপ আলোচনার পর আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। এই আত্মীয়তার ফলেই আমি আমার স্বাধীনতা লাভ করলাম।

প্রথম দিকটায় অবশ্য ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সূত্রপাত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—চিঠি লেখার কাগজ। কতবার আমি দোকানে দোকানে ঘুরে শেষ পর্যন্ত বালির কাগজ কিনে বাড়ি ফিরেছি। আমার বাড়িওয়ালী কিন্তু উৎকৃষ্ট

শ্রেণীর কাগজ সংগ্রহ করে দিলেন। মনে হল এই দৃষ্টিহীনা রমণীর চোখের শাদা তারা অতিশয় কড়া প্রকৃতির ব্যবসায়ীর মন ভেজাতে পারে। যার ফলে তারা কাউণ্টারের তলা থেকে লুকানো ভালো মাল বার করে দেন।

আমি এই সময়টা খুব বেশী লিখছিলাম তাই দিস্তার পর দিস্তা কাগজ প্রয়োজন হচ্ছিল—আমার বাড়িওয়ালী আমাকে 'কাগজ-খোর' বলে ডাকতে সুরু করলেন। তার ফলে আমি তাকে 'মাছি-জননী' বলতে লাগলাম। এই ভাবে আমাদের বেশ ভালোই সম্পর্ক গড়ে উঠল। 'কাগজ-খোর' এবং 'মাছি-জননী' ফলে আমরা এই কালের বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে এবং লাইপজীগের বোমাবিধ্বস্ত বাড়ি ও রাজপথ থেকে অনেক উচ্চে বিচরণ করতে লাগলাম। ছাদের ওপর স্বর্গরাজ্য! 'মাছি-জননী' সীপীয়েপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সারা জীবন এখানে কাটিয়েছেন বলে আমি চোর ডাকাত এবং যারা তাদের প্রশ্রয়দাতা তাদের সম্বন্ধে অসংখ্য কাহিনী শুনলাম। সেই সঙ্গে বেশ্যা ব্যাভিচারিণী, জমীদার ও পাহারাওলাদের গল্প। আমি একটা মোটা বই লিখে ফেলতে পারতাম—

এই মহল্লার এবং এখানকার মানুষজনের ইতিহাস।

কিন্তু আমার মনকে সবচেয়ে বেশী যা ঘিরে রইল তা এই 'মাছি-জননী'। তিনি পঞ্চাশ বছরের এক দুর্ধর্ষ চেহারার রমণী। তাঁর কণ্ঠস্বর কর্কশ, চেঁচালে অতিশয় তীক্ষ্ণ—তার দুগ্ধফেননিভ চোখের তারা কিঞ্চিৎ বেরিয়ে এসেছে। আর তারা অনেক সময় হতাশায়ে আকুল হয়ে ওঠে যেন কোনো অদৃশ্য বস্তুকে স্পর্শ করতে চায়, ধরতে চায়, জড়িয়ে ধরতে চায়, চিনতে চায়। আমার চোখের ওপর এখনও সুস্পষ্ট ছবি রয়েছে। সীপীয়েপের সরু গলিপথে 'মাছি-জননী' চলা ফেরা করতেন—বেশ শক্তিময়ী এবং প্রশস্ত হয়ত কিঞ্চিৎ অবহেলিত। তাঁর পরিচ্ছদের অংশ কুঞ্চিত, হাতে একটি হরিদ্রাভ কাপড় বাঁধা, দুটি সেফটিপিন দিয়ে গোঁজা, ডান হাতে বেড়ানোর ছড়ি, তাই দিয়ে তিনি পৃথিবীটা অনুভব করেন। অন্ধরমণী, মাঝে মাঝে রাজপথে দেখা যায়। কিন্তু উনি কি সত্যই অন্ধ। দিনের আলো কি সম্পূর্ণ দেখতে পান না। এমন অনেকদিন গেছে যে আমার সন্দেহ হয়েছে, যেমন সেদিন বিড়ালটা মাথা নীচু করে নীচে পড়ে গিছল।

আমি আমার টাইপরাইটার নিয়ে বসেছিলাম। সেই সময় উঠান থেকে

একটা কাতরধ্বনি ভেসে এল। প্রথমটায় মনে হল শিশুর ক্রন্দন। 'মাছি-জননী' রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দুড়-দাড় করে নেমে গেলেন।

আমি শুনলাম ব্যাপারটা কি ঘটেছে। বিড়ালটা রান্নাঘরের টেবিলে লাফিয়ে পড়েছিল, সেখানে সিকি পাউণ্ড সসেজ (শূকর মাংস) পড়েছিল। 'মাছি-জননী' দোর গোড়ায় এসে পড়ায় বিড়ালটা সসেজ ছেড়ে দিয়ে জানলার দিকে লাফ দেয়, তার হিসাবে ভুল ছিল সে ছাদের সামান্য অংশটুকু অতিক্রম করে একেবারে নীচে পড়ে গিয়েছিল! একেবারে চারতলার নীচে শান বসানো মেঝেতে পড়ে গেলেও বিড়ালটা এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কয়েকদিন একটু খুঁড়িয়ে চলা ফেরা করেছিল, নাকটা একটু থেঁতলে গিছল কিন্তু তা এমন বিশেষ কিছু নয়। আমার কাছে ব্যাপারটি সম্ভাব্য মনে হয়নি। আরো বিস্ময়কর মনে হল, কি ভাবে আমার বাড়িওয়ালী ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিলেন। একজন অন্ধ-রমনী কি ভাবে এত সব খুঁটিনাটি জানতে পারেন! প্রতিটি বিস্তারিত তথ্যের নিখুঁত বিবরণ। 'মাছি-জননী' নিশ্চয়ই বেড়ালটা কি ভাবে লক্ষ্য করে টেবল থেকে ঝাঁপ দিয়েছে এবং কি ভাবে জানলার পাশটা থেকে ছিটকে গেছে তার নিখুঁত বর্ণনা।

আমার সন্দেহ হল স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ অন্ধ নন। একবার আমি সবিস্ময়ে একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে 'মাছি-জননী'র চোখের কাছে ধরেছিলাম। কিন্তু সেই চোখ শীতল এবং স্পন্দহীন হয়ে রইল। নগ্ন অক্ষি তারকা কাঁপতে থাকে আর আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে চোখে পরিচিতির ছাপ ছিল। আমি ভাবলাম হয়ত অন্য কোনো একটা জবাব আছে, কথায় বলে কানা মানুষের দৃষ্টি শক্তির অভাব অন্য দিক থেকে পূরণ হয়, অন্য শক্তি বৃদ্ধি পায়। সেই সব শক্তি জোরদার হয়ে উঠে। যারা মূক এবং বধির তারা পিয়ানো, বা অন্যান্য সঙ্গীতযন্ত্রের পিছনে পিঠ দিয়ে ধ্বনি তরঙ্গ অনুভব করেন?

একদিন সন্ধ্যায় একটু দ্বিধাভরে 'মাছি-জননী' আমার দরজায় ধাক্কা দিলেন। শেষ শরতের সন্ধ্যা—দিনের পর দিন বেলা ছোট হয়ে আসে, স্মরণ করিয়ে দেয় বছর শেষ হয়ে এল। মনে হতাশা আনে।

আমি যখন বল্লাম—'ভেতরে আসুন।' তখন 'মাছি-জননী' দরজায় সামান্য ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মৃদুগলায় বললেন:

'গ্যাসের গন্ধ বেরোচ্ছে।'

আমি অনেক চেষ্টা করলাম, আমি সব ঘর ঘুরলাম, বারান্দা, দালান তারপর সিঁড়ি—কিছুই গন্ধ নেই। ওকে শান্ত করার জন্য আমি বললাম—'নিচে হয়ত কেউ গ্যাস-কুকার জ্বেলেছে। নিচের ঐ মাইকেলরা যারা তেতালায় থাকে, ওদের ওখান থেকে মাঝে মাঝে গ্যাসের গন্ধ বেরোয়।'

অবাধ্যের ভঙ্গীতে 'মাছি-জননী' মাথা নাড়লেন। পরদিন প্রভাতে কাছাকাছি একটা বাড়ির দরজা ভেঙে দেখা গেল গ্যাসের বিষে একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

এইসব ঘটনার উত্তরে অবশ্য যে যার মনের মত কথাই বলেন। 'মাছি-জননী'র একটা বিশেষ শক্তি আছে বলা যেতে পারে, তিনি আগে থেকে বুঝতে পারেন, অনুভব করেন। আপনি বলতে পারেন, উনি সত্যি গ্যাসের গন্ধ পেয়েছিলেন, অগ্নি নিবারক দেওয়াল ভেদ করে সেই গন্ধ ভেসে এসেছে। তাঁর বিশেষ ধরণের ঘ্রাণ শক্তি তাঁকে সাহায্য করেছে।

কিন্তু আমি 'মাছি-জননী' কি ভাবে ছাদে উঠতেন সে কথা বলতে চাই।

আমাদের বাড়ির ছাদ তীক্ষ্ণ ভাবে ওপরে উঠে যায়নি। নানা অংশটুকু তৈরী বারন্দার মত উচ্চতা বিশিষ্ট, সেই ভাবে উঠেছে, তারপর কোনাকুনি গতিতে একটা সমতল অঞ্চল সুরু হয়েছে। তার ওপর ঘুরে বেড়ানো যায়, বাগানের ওপর দিয়ে সেখানে পৌছানো যায়। আমি আগে এসব কিছুই দেখিনি, এমন কি যে রাত্রে পুলিশ এসে ওর ওপর থেকে একটা দলকে পাকড়াও করল আমি তারপর দিন সকালে অনেক বেলা অবধি ঘুমিয়েছি। আমাদের ছাদ থেকে পুলিশ ষোলো জনকে ধরেছিল। আর যখন শুনলাম যে এই চোরের দল মাসের পর মাস ধরে এই জায়গাটিতেই তাদের দৈনন্দিন আড্ডা করে তুলেছে, সেখান থেকেই ওরা কোথায় হানা দেবে ঠিক করে এবং লুটের মাল বখরা করে, আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হইনি। আমাদের এই বাড়িতে ও পাশের বাড়িতে মাসের পর মাস ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছে, আমাদের বাড়ির নকল চাবি ওদের কাছে ছিল, নীচের কুঠুরী, চোরা-কুঠুরি, সব কিছুর চাবি। কেউ সে সব লক্ষ্য করেনি, শুধু এই অন্ধ-স্ত্রীলোক, 'মাছির-জননী' এই চোরের দলের কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন—অনেক রাত্রিতে তিনি ছাদের ওপর লুকিয়ে থেকে আড়িপেতে ওদের কথাবার্তা শুনেছেন।

আমার কাছে 'মাছি-জননী' পরে বলেছিলেন পুলিশকে খবর দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিলনা। আমাদের এই সীপীয়েপে—তিনি বলতে থাকেন, পুলিশের কাছে যাওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই। উর্দী পরে দৌড়ে গিয়ে গুলি চালনা করার চেয়ে বরং এটা-সেটা সিগারেটটা ছেলেরা চুরি করুক।

আমার বাড়িওয়ালী যুক্তি দিয়ে বল্লেন, তা ছাড়া তিনি পুলিশকে ডেকে এনেছেন শুধু এইটুকু জানার জন্য, কি ভাবে ওরা চুরি ছেড়ে ডাকাতি শুরু করেছে। 'মাছি-জননী'র পক্ষে এ এক অসহনীয় অবস্থা।

আমার বাড়িওয়ালী আমাকে যখন এই সব বলছিলেন তখন আমি একেবারে অবাক হয়ে গিছলাম। আমার সংশয় চেপে রাখতে পারিনি। 'মাছি-জননী' তাঁর চওড়া হাত দুটি আমার দাড়িতে রাখলেন যেন আমার মুখের অবিশ্বাস ভরা হাসিটুকু অনুভব করতে চান, তারপর সজোরে বললেন, 'তুমি এসব বিশ্বাস করছ না কেমন ?'

তারপর উনি সোজা জানলায় চলে গেলেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আমাকেই অনুসরণ করতে হয়, আমরা দুজনে ওপরে ছাদে উঠলাম, আমি ওপরে উঠে হাঁফাচ্ছি এবং তার জন্য লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু 'মাছি-জননী' অবলীলাক্রমে ওপরে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন।

ওপরে ওঠার পর নির্মাহী-বাস্তুকাররা কি ভাবে শহরের বড় বড় স্মৃতি-সৌধ গড়ে তুলেছেন শুধু তাই দেখতে লাগলাম। অসংখ্য চিমনী আর টালির ছাদ। ছাদের ওপর দাগরাজি করা আর ছাদের ধারে আলিসার সার—কোথাও নেমে গেছে, কোথাও আবার মাথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে। ধারে পাশে ভেতরে বাইরে কোথাও বেঁকে গেছে, কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধ-রমনী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন ডাকাতের দলটা কোথায় লুকিয়ে ছিল, তাঁর নিজের লুকানোর জায়গাটাও দেখিয়ে দিলেন, আমি সবিস্ময়ে সব কিছু দেখতে থাকি, তখনো আমার মনে সংশয়, তখনো ভাবিনি যে শীগ্‌গীর আমারই এ সব প্রয়োজন হবে। আমি এই বিষয়ে একটি ছোট গল্প লিখতে চেয়েছিলাম, সীপীয়েপ, মাছি-জননী, এখানকার বিস্ময়কর জগৎ এই সব নিয়ে লিখতে চেয়েছিলাম। শুধু এইটুকুই চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কি আমাদের ইচ্ছা, আমাদের আশা, আমাদের আগামী কালের জন্য পরিকল্পনা সব কোথায় যায়! কাল কি হবে সেই বিষয় আমরা কতটুকুই বা জানি! তাই আমার এই ছোট চিলেকোঠার

স্বর্গের দিন শেষ হয়ে এল। হয়ত ন্যায় বিচারের পক্ষে এটা বিপরীত, কেউ যখন ছাদে ওঠে, প্রায় আকাশের সীমানায়, তখন নীচের শহরের উদ্বেগের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, সেখানে তার অংশ কোথায়, সেখানকার অধিবাসীদের ভাগ্য সূত্র সম্পর্কে তার কি জ্ঞান! হয়ত, তাহলে কারো পক্ষে শুধু তাদের নিয়ে গল্প লেখা নিষিদ্ধ, তারা একদিন ইতিহাসের পাতায় প্রবেশ করবে, কারণ আমরা যে কালে বাস করছি সেই কাল কি এক যন্ত্রণাময় যুগ নয়—একটা বিরতি, একটা অন্তবর্তীকালীন বিস্তার—দুটি কালের মধ্যকার একটা সময়—দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে বিরাট অবক্ষয়ের, বিরাট ভ্রান্তির পর। একটা সময় উপস্থিত হয় সেই সময়ে জগতের যাঁরা শক্তিমান নতুন সংঘাতের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে নেয়।

এমনই এক সন্ধ্যায় 'মাছি-জননী' আমার দরজায় ধাক্কা দিল। আমি তখনই দরজা খুলে দিলাম, তার মুখখানি ভয়ে ধূসর হয়ে গেছে, সেই মুখ থেকে সব চতুরতা বিদূরিত। তাঁকে যতই প্রশ্ন করি উত্তর পাই না, কিসের তাঁর এই ভয় জানতে পারি না। কিন্তু তাঁর এই অবর্ণনীয় অস্বস্তি আমার মধ্যে অন্তরিত হল। রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি, তারপর যখন ভীষণ জোরে ঘণ্টা বাজতে লাগল তখন আমি জানলা দিয়ে পালিয়ে গেলাম। আমি ছাদের ওপরকার সেই লুকানোর জায়গাটায় গেলাম তারপর সারারাত সেখানে নিঃশব্দে বসে থাকলাম। ভোর বেলাকার ধূসর আলোয় অন্ধ-রমনী আমার সেই গুপ্ত আশ্রয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় উপযুক্ত যা কিছু প্রয়োজন উনি সব এনে দিলেন।

চলে আসার সময় 'মাছি-জননী' আমার হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন, 'শয়তানের নামে বলছি, তোমার ভালো হক, কপাল ফিরুক।' তারপর তিনবার আমার কাঁধে থুতু নিক্ষেপ করলেন। এই বস্তুটার নাম কি কেউ জানো—? এর নাম কি কৃতজ্ঞতা?

সবুজ জ্যাকেট

জারড্ গেইসার

উইনি ওর চেয়ে অনেক ছোট, ছোট বোন, মানে মেয়ে নয় বটে তবে একেবারে মেয়ের মত, ভাগ্নীও বলা যায়। ওর বোন টেরেসা ইতিমধ্যেই বেশ বয়স হয়েছে, সংক্ষেপে সবাই রেসা বা রেস বলে ডাকে, তিনি উইনিকে বল্লেন, 'এই জ্যাকেটটা তোমাকে মানায়, এটা আমার সাইজের বটে, তবে তোমাকে মানিয়ে যাবে বেশ।'

টেরেসা এই কথা বল্লেন অথচ মাত্র কয়েকদিন আগে দোকানে এই জিনিষটা গায়ে দিয়ে দেখার সময় সে মনে মনে জ্ঞানীর মত বলেছিল, 'ভারী সুন্দর! তবে আমার মত মানুষকে মানায় না।' তার পর প্রায় মাসীর মতো ভঙ্গীতে উইনিকে বলেছিল, 'তোমার আরো একটু বাড় বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এটা তোমাকে মানাবে না'—এই কথা বলে সে জ্যাকেটটা উইনির গা থেকে খুলে নেয়—খুব যে কর্কশ ভাবে তা নয় তবে তেমন মোলায়েম ভঙ্গীও বলা চলেনা।

ইতিমধ্যে আবার টেরেসাকে নিয়ে পুলিশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পুলিশ ইতস্ততঃ ভঙ্গী নিয়ে প্রবেশ করে, কিছুটা আতুরে ভঙ্গী, কিছু সংসারীর ভাব, যেন এই সংসার সচেতন ভিওম শহরে পুলিশরাও এটা অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে। 'আমরা বরং মাঝপথে দেখা করব। ব্যাপারটা নিঃশব্দে এবং তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাবে বরং।'

গাজেল, গ্রীন-গাজেল লেদার, জলপাই বর্ণ কৃষ্ণসার চর্ম। রেসা এখন আইনের কাঠগড়ায়। বরং বলা যায়, ঠিক এখন ও আইনের কবলে পড়েনি, শুধু পুলিশের সামনে হাজির হয়েছে। পুলিশ তাকে বসতে পর্যন্ত বলেছে। রেসা একটা জিনিষ নিয়েছিল, সবুজ চামড়ার জ্যাকেট। এখন সেটা ফেরৎ দিতে হবে, এসব রেসার অভ্যাস আছে তবে এইবার গ্রহণ করাটা এবং সেই সঙ্গে ফেরৎ দেওয়াটা এড়িয়ে যেতে পারলেই ভালো হত বরং। যাই

হোক, ওকে জিনিষটা ফেরৎ দিতে হবে। অবশ্য পুলিশ একটু সহৃদয়তা দেখালেও অন্ততঃ উপস্থিত তাই করা যাবে।

ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরে এই ধরণের চুরি হয়ে থাকে। কোনো দোকানের চুরির ব্যাপার নিয়ে কেলেঙ্কারি সৃষ্টি হয় না, প্রকাশ্য ভাবে নাড়াচাড়া হয় না, তবে এর পরই একটা বিচার ও শাস্তি হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে সব কিছুই পাত্র-পাত্রীর ওপর নির্ভর করে কারণ, এমন সব মানুষও চুরির দায়ে দোকানে ধরা পড়েন এমন কুকর্ম যে তাঁরা করতে পারেন একথা কেউ বিশ্বাস করে না।

রেসার ক্ষেত্রেও এ নিয়ে একটা বিরাট কেলেঙ্কারী হয়ত ঘটত না। সে তেমন পরিচিত নয়, তবে তার অবস্থানুসারে এতটুকু কেলেঙ্কারিও কেলেঙ্কারি। কারণ, রেসা এক বিখ্যাত জায়গায় কাজ করে, সে অফিসের বেতনের হার বেশ উঁচু তাই তাঁরা বিশেষভাবে নির্বাচিত বিশ্বাসী লোকজনকেই কাজে নেন। ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরে টেরেসা 'গেফ্‌জন' নামক দামী জ্যাকেটটা এই কারণেই সরিয়েছিল, গেজেল-গ্রীন। কেউ তাকে নিতে দেখেনি। সে ঠিক বেরিয়ে আসত অক্ষত দেহে শুধু যদি না দ্বিতীয় এক রমণী এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না হত, সে গাড়িতে অপেক্ষা করছিল। রেসার জন্য সত্যি সত্যি অপেক্ষা না করে সে চলে গেল গাড়ি চালিয়ে। হয়ত এড়িয়ে যাওয়ার জন্য—কিংবা হয়ত আকস্মিক ভয়ের আক্রমণ। তাই রেসা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধরা পড়ল এবং অস্বীকার করতেও পারল না। ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের কর্তৃপক্ষ তাকে পুলিশের হাতে দিলেন।

এই দোকানটার নাম শুধু 'ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর', কিঞ্চিৎ ছলনা, কিঞ্চিৎ ফ্যাসানগতভঙ্গীতে অতিবিনয়—আসলে বেশ বড় দোকান, শুধুমাত্র নির্বাচিত এবং উঁচু দরের জিনিষই রাখে, এই দোকানে ট্রিটি কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারীই জিনিষপত্র কেনেন, এখানে এই জাতীয় দুস্কৃতির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। এই সব খরিদ্দার প্রয়োজনের খাতিরে চুরি করে না, তারা এমন একটা আবেগবশে চুরি করে যার তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণ হয় না। নিছক প্রয়োজন বলেই একজন চোরকে আদর দেওয়া চলে না। কয়েকবার সচতুর কর্তৃপক্ষ ভারী সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে এই মার্জনার প্রতিক্রিয়া হল বিশ্রী। তাই সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ হুকুম দিয়েছেন ধরতে হবে। তাই রেসাকে, হয়ত দুঃখের সঙ্গে হলেও পুলিশের হাতে দিতে হল।

রেসা তার ব্যক্তিগত পরিচয়, বয়স, ট্রিটি পাওয়ারের ট্রেড মিশনের কর্মচারী এবং এই অশুভ জিনিষটা কেনার উপযুক্ত টাকাও তার সঙ্গে ছিল। ডিউটিতে ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই সব খরিদ্দারের দিকে নজর ঠিক ঠিক রাখেন, তিনি তবু এক মুহূর্তের জন্য তাঁর প্রীতিময় ভদ্র ভঙ্গী থেকে সরে আসেন নি। তিনি একটা চুক্তির উপায় বল্‌ছিলেন, যেন নিজের সুবিধার জন্যই একটা দরাদরি করছেন।

'বেশ, একটা চুক্তি করা যাক্,—আমরা বরং একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা করি। ব্যাপারটা তখন নজরেই আসেনি এইভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে সে ব্যাপারের দু-একটা ছোট খাটো সর্ত আছে।'

এই চোরাই দ্রব্যটি কিন্‌তে হবে, অফিসার এক মুহূর্তের জন্যও চোরাই মাল বলেননি। বলেছেন স্বাভাবিক দরে নগদ কিনতে হবে। তারপর ক্যাসেই একটা দোষহীন রসিদ দিতে হবে ভিওম রেড ক্রসের জন্য সমান মূল্যের চাঁদা। কোনো ফাইলে এই সব নিয়ে উচ্চবাচ্য থাকবে না, কোনো রকম মামলাও হবে না।

গ্রীন গাজেল, অলিভ গ্রীন, জলপাই রঙের সবুজ কৃষ্ণসার চর্ম। অফিস ঘরের টেবলের ওপর দ্রব্যটি ছড়ানো রয়েছে, সেইখানেই অপরিচিত ভঙ্গীতে বস্তুটি পড়ে আছে, সেটা এখানকার বস্তু নয়, অফিস ঘরের গুমোট গন্ধে সুগন্ধ বিতরণ করছে, কোমল, জলপাই সবুজ রঙের কৃষ্ণসার চর্ম, তার ওপর একটা আঙুলের চাপ দিলে একটা ভেলভেটের দাগ পড়ে যায়। তোমার জন্য নয়, নয় টেরেসা! কিংবা তাই কি? জলপাই? কৃষ্ণসার? অফিসার বেশ সহিষ্ণু, তিনি ওকে এক পাশে নিয়ে গেলেন না, কারণ, বিশেষ ভাবেই তিনি জানেন টেরেসার অন্য কোনো কিছু আর করার নেই। সে তৎক্ষণাৎ জবাব না দেওয়ায় উনি কলমটা আবার তুলে ধরলেন, এতক্ষণ সেটা নামানো ছিল, উনি একটা ফাইল পড়ছিলেন। রেসাও তাই একটু চুপ করে থাকে।

অনেক দূরের দেশ—গেজেল অলিভের দেশ। জলপাইকুঞ্জেও কৃষ্ণসার হরিণ চরে বেড়ায়। রেসা অনেকদিন এর স্বপ্ন দেখেছে—হরিণের দেশ, ছোটবেলা থেকেই সে কল্পনা নেত্রে কত ভেবেছে। এখন সে সব অতীতের বস্তু। এখন তার কেমন বাসনা হয়েছে যে এই ভদ্র অথচ দৃঢ় পুলিশ অফিসারটার সঙ্গে

কোনো চুক্তিতে আসা ঠিক হবে না। একটা উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল কিছু কাজের দ্বারা বরং ওকে উত্তেজিত করা যাক, তারপর লোকটাই বেশ ধরা পড়ে যাবে, একটা নোঙরা ভাবে ধরা পড়বে, নোঙরা একটা চোর—তারপর ভিওয়ের সেই কুৎসিৎ আদালতের সামনে হাজির করা হবে। ব্যক্তিগত পরিচয়, বয়স, পেশা ও কাজ কর্মের হিসাব—তারপর যে বস্তুটা রেকর্ড করা হয় নি, যা অনেকদিনের স্বপ্ন হয়ে মনের মাঝে লুকিয়ে আছে। তারপর সব স্বপ্ন শেষ হয়ে আসে যখন সে সহসা দেখতে পায় যে তার বয়স বেড়ে আসছে। তার মা জীবনের শেষের দিকে আর একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছেন। তারপর তিনি কিছুকাল রোগজীর্ণ শরীর নিয়ে থাকার পর তাঁর মৃত্যু হয়। এখন টেরেসার কাছেই শিশু, তা ছাড়া দুটি ভাই। সে এখন মেট্রন, ঠিক ঠিক দেখতে গেলে তাই। একদিন দরজা ভেজান ছিল পাশের ঘরে স্কুলের পড়া নিয়ে ওরা হাসাহাসি করছে শোনা গেল।

একটি ভাই বলছে অপরকে, 'রেশ বরং রেশমী বা রেথ বলাই ভালো—'

'রেথ'[১]—মদ্যপ্রস্তুতকারকের কথা ওদের মধ্যে প্রচলিত, মদ যখন আর তেমন মধুর নয় অথচ ঠিকমত গাঁজেনি তাকে বলে 'রেথ'। যেমন 'রেথ পারসন'—দরকোঁচা!

অন্য ভাই বল্‌ছে—'রেস, রেই, রেই রেম—'

আর একজন বলছে—'স্পেস, স্পেই, স্পেম্‌'—'কিন্তু আশা ছেড়ে দাও।'

প্রথমটি জবাব দেয় 'আমি বলি রেস। রেস কথাটি স্ত্রীলিঙ্গ, তবে শুধু ব্যাকরণে তাই, সেখানে রেস, রেই, রেই, রেম—তা ছাড়া রেস হচ্ছে ক্লীবলিঙ্গ।'

'কথাটি হল নিউটার—ক্লীবলিঙ্গ।'

'মানে নিউট্রাল—'

---

১ রেস, রেই, রেম এই কথাকটিতে জার্মান ভাষায় তিনরকম ভঙ্গী, তা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। 'রেস' মানে তিক্ত অম্ল। ইংরাজীতে Rathe রেথ কথাটি সুরা প্রস্তুতকারকের কথা নয়, চাষীর কথা। যে জিনিষ অকালে পেকে দরকোঁচা হয় তাকে Rathe বলে। কবিরা মানুষ সম্পর্কেও ব্যবহার করেছেন—যেমন—"The men of rathe and riper years"—Tennyson.

—অনুবাদক

টেরেসা একেবারে স্পন্দহীন হয়ে দাঁড়ালো। কয়েকবার বকা-ধমকানি দ্বারা এই সব কুড়েদের ও চটিয়ে রেখেছে, তার মনে হয় এরা সব অবিবেচক অসভ্য জন্তু। টেবলে চামচ রাখতে গিয়ে সে শুখনো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। আমি তোমাদের জন্য রান্না করতে পারি, তোমাদের নোঙরা ঘাটতে পারি কিন্তু তোমরা আমাকে বলছ ক্লীবলিঙ্গ। আমি বড় হয়ে জন্মেছি তাতে কি আমার অপরাধ হয়েছে ?

ব্যক্তিগত বিবরণ যখন যা সবচেয়ে ক্ষতিকর তা সহ্য করা যায়, ওরা সব নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে, শুধু ছোট বোনটা ছাড়া, রেসা একটা মাঝামাঝি অবস্থায় দাঁড়াবে তখন আর অন্য কিছু শেখার কথা সে ভাবতে পারে না। সে কাজ করতে পারে, তা ছাড়া ঠাণ্ডা মাথা রাখার স্বপক্ষেও যুক্তি আছে, সে বিশ্বাসী, এবং সময় নষ্ট করে না। কনস্যুলার কর্মে সে বেশ দ্রুত। এখন সব বেশ সহজ হয়ে গেছে, বলা যায় যে তার ভালোই হয়েছে, তার বোনটিকে নিয়ে এখন আর তেমন বেশী মাথা ঘামাতে হয় না।

না বিশেষ কি হাঙ্গাম, উইনি পালকের মত হালকা, তাকে টেনে নিয়ে যেতে হয় না কখনও, কোনো ঈর্ষা নেই, বিনা চেষ্টায় তাকে নিয়ে চলা যায়, বিনা চেষ্টায় সে শেখে। সম্প্রতি সে রেসার সঙ্গেই থাকে। একটা ফ্যাসন স্কুলে যায়, এখন সে ভিওমের উচ্চকোটির মানুষের আদব কায়দা শিক্ষা করছে। রেসা হিসাব মেটায়, তার নিজের হিসাব তৈরী হয়। এই সব কথা সে ভাবে তারপর একদিন সে জানতে পারল যে লোকে ভাবে সে উইনির মাসি। বেশ তাই না হয় মাসিই হোক, সে গলাধঃকরণ করে, তবু উইনি যে তার ঘর দিয়েই যায় এ একটা বিশেষ সুযোগ। উইনি মজার মেয়ে, ঠিক যেমনটি তেমন, তবে ভারী মজা কিছু অল্প বিস্তর খরচও হয় তাকে সন্তুষ্ট রাখতে। ওকে কোনো রকম উপহার দেওয়া সহজ। রেস তার সঙ্গে অনেক সময় বেড়াতে যায়—সে গাড়ি দেয়, মানুষ-জনকে আমন্ত্রণ করে। এ সব ওর জীবনে আগে কোনো ঘটেনি। এখন কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণেই অতিথিরা আসেন।

উইনি প্রশ্ন করে, ফুলদানিতে ফুল সাজানো, আর ঘরটা দেখে বোঝা যায় এইমাত্র কাউকে আপ্যায়ণ করা হয়েছে। সে প্রশ্ন করে—'কে এসেছিল ?'

শুখনো গলায় রেসা বলে—'ফয়েলনার, তোমাকেও অবশ্য প্রীতি জানিয়েছে।'

উইনি বলে—'ফয়েলনার? আহা বেচারী! আর আমাকেই বাইরে যেতে হল!'

রেসা আর কিছুই বলে না। সে নড়েও না, চড়েও না। তার হাতের মুঠিতে একটি সিগারেট প্যাকেট প্রায় বেঁকে যেতে বসেছে। স্কার্ট, আর ব্লাউসে বেল্ট্ এঁটে ও সেখানেই বসে পড়ে। তার কথা শোনার দিকে উইনির আগ্রহ নেই, সে ঘরের মাঝখান গিয়ে বেল্ট খুলে তার আধা-হাতা ছোট কোট গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার ভঙ্গীতে সহানুভূতি ছিটিয়ে পড়ে।

সহসা রেসা তার বোনকে তীব্র তীক্ষ্ণ ভঙ্গীতে বলে, 'তোমার কি মনে হয় ফয়েলনার তোমার জন্যই এসেছিল?'

উইনি থমকে দাঁড়ায়, আর ঘুরে বেড়ায় না। সে সহজ ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ওর বোনের কণ্ঠস্বর আর পরিচিত নয়। তার মুখ লাল হয়ে যায়, রেসা যা অবশ্যম্ভাবী তাই ভাবছে, সেই বিশেষ কথাটিই ভাবছে। সেই কারণে, যা বলার বাসনা ছিলনা সেই কথাটাই সে বলে ওঠে—'সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।'

ওর কণ্ঠস্বর আর চাপা যায় না। সে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। হাতে সিগারেটের সেই দোমড়ানো প্যাকেট। নিজের সম্পর্কে তিক্ত হয়ে সে বলে প্যাকেট! প্যাকেট! একটা আকস্মিক রাগে সে জ্বলে ওঠে! 'নিশ্চিত করে বলা যায় না।'—কিছুই ত' নিশ্চিত নয়। আমি কি তবে ফুরিয়ে গেছি! ক্লীবলিঙ্গ! বাচ্চা শিশু মাত্র! আর ঐ আমার বোনটি। এইভাবে ভেতরে ভেতরে রাগে সে গুমরে মরে তারপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

যখন আবার সে বেরিয়ে এল, কৃত্রিমভাবে সে বেশ তাজা ভাব নিয়ে এসেছে। সে শুখনো গলায় আত্মগতভাবে বলে ওঠে—'আমি একটা হাস্যকর বস্তু।' তারপর নীচে নেমে গিয়ে গাড়িটায় বসে গাড়ির দূরদর্শী আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে নেয়, তারপর নিজের মাথাটা গদীতে হেলান দিয়ে বলে ওঠে—'না না, আমি হাস্যকর নই। হাস্যকর! কেন হাস্যকর হব?'

ওরা দুজনের কেউই সেই সামান্য ঘটনাটি নিয়ে কোনো প্রসঙ্গ তোলে না। কিছুই বদলায় না। রেসা প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে অফিসে যায়। আর

বোনটিকে সেই পথে তার ইনষ্টিট্যুটে নামিয়ে দেয়। ক্ষণকালের জন্য আত্ম-সচেতন হয়ে ভাবে—উইনি-উইনি—এখন শীকার উপযুক্ত পাখি। হয়ত সেই কারণেই রেসা বিবেচক এবং সহৃদয়তার ভঙ্গী মনে নিয়ে এল। ঠিক প্রতিবাদের আশায় নয়, তবে এমনই তার ভঙ্গী যার ফলে সূক্ষ্ম দূরত্ব সহজবোধ্য হয়। বিরক্তিকর দূরত্ব, তথাপি উপযুক্ত বলা যায়। উপযুক্ত—এই ছোট পাখির চলার পথে কে বাধা দিতে চাইবে। সে যেই হোক, তাকে দিতে হবে। তবু যে যার কালে সবায়ের ভালোই লাগবে।

একটা সমঝোতার ভঙ্গীতে পুলিশ অফিসারটি বল্লেন: 'তিনশ ষাট রেঘিন (টাকা)। যে বিলটি ষ্টোরের তার রসিদ এই। তাহলে হল সাতশ কুড়ি রেঘিন (টাকা), কোনো বাড়তি খরচ নেই—এইভাবে বিষয়টার নিষ্পত্তি হতে পারে।'

'তিনশ ষাট রেঘিন'—'গেফজন' ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের সেলস-লেডী এই কথাই বলেছিল ওদের দুই বোনকে। পরস্পর কারো ওপর কারো রাগ নেই, আর সর্বদা যেমন হয়, রেসার উদ্দেশ্যটা ছিল মহৎ। এটা ভ্রমণ নয়, আগেকার মত দোকানে পায়েচারি করা, তাই উইনিকেও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। যে জ্যাকেটটা দেখে দুই বোন মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে একটা বিশেষ নির্বাচিত বস্তু,—'মাদাম, আয়নায় একবার নিজের আকৃতিটা দেখুন। আগে ভাগে কিছু বলবেন না।'

টেরেসাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা দেখে নেয়। গেজেল—ভেলভেটের মত সবুজ, না এ আমার অদৃষ্টে নেই।

তাই টেরেসা বলে—'চমৎকার বটে, তবে আমার জন্য নয়।'

'আপনাকে চমৎকার ফিট করেছে মাদাম।'

'হবে হয়ত,—তবে বলেছি ত আমাকে মানায় না। যাই হোক, আমরা এখানে তাহলে কি করছি। আমার জ্যাকেটের কোন প্রয়োজনই নেই।'

উইনি বলে—'কি বলতে চাও রেসা! জিনিষটা একবার দেখো। তা ছাড়া তোমার জ্যাকেট কেনার সামর্থ্যও আছে।'

রেসা বলে—'সামর্থ্যের কথা হচ্ছে না,' খরচের টাকাকড়ির ভার ওর হাতে, সেলস্-লেডী সোজাসুজি বলে—'হয়ত অন্য মহিলাটি একবার দেখতে পারেন।'

এর ফলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও উইনিকে জ্যাকেটটা একবার অঙ্গে পরতে হয়। ইতিমধ্যে রেসা অন্য একটি বস্তুর দিকে ধাবিত হয়েছে। তারপর ফিরে এসে দেখল—আয়নায় উইনিকে দেখল—তারপর নিজেকেও দেখল সেই সঙ্গে। তারপর জ্যাকেটটি হাতে নিয়ে তেমন কর্কশ না হলেও কণ্ঠে মধু ঢেলেও নয়, বলল—'এ সব বাজে ব্যাপার শেষ হোক। আর আমি যা বলেছি এই জ্যাকেট আমাকে মানায় না—আর খুকী তোমাকেও এটা মানায় না—, (রেসা ইচ্ছে করেই বলল—খুকী) অন্ততঃ যতদিন না তুমি একটু আধটু বড়ো সড়ো হয়ে ওঠো।'

যখন এই ভাবে উইনির সঙ্গে কথা বলছিল তার কণ্ঠস্বরে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এই কণ্ঠস্বর শুনে বলা যায় না যে সেই কণ্ঠস্বরে প্রেম নেই, বা তা প্রেমের উপযুক্ত নয়। তথাপি এই কণ্ঠস্বরের তলায় আছে মৃদু স্থর যে কণ্ঠে রেসা সম্প্রতি বলেছিল যা সে বলতে চায়নি—'তুমি ত মনে কর এইটাই সুনিশ্চিত।'

তাই কেনা আর হয়ে ওঠেনি। রেসা 'পার্কিং-লট'-এ (গাড়ি রাখার জায়গা) পৌছে বলে—'বরং, তুমি এখন গাড়ি চালাতে পারো, আমরা ওপারে গিয়ে কিছু খাব, এই 'সুম্মাপন্টে' যেতে পারি। ওরা একটু দূর যেতে না যেতেই, মাগুরা ব্রীজ পার হতে না হতেই, রেসার মনে পড়ল ওর হাল্কা কোটটা 'গাফজনে' ফেলে এসেছে। তৎক্ষণাৎ ও উইনিকে বলে ওঠে—'ও, যাক গে, কাল ওটা নিয়ে নিলেই হবে।'

তখন উইনি মনে করিয়ে দিল যে 'সুম্মাপন্টে' বেশ ঠাণ্ডা হবে সন্ধ্যার দিকে, বিশেষ যদি বাইরে বস ত' ঠাণ্ডা লাগবে। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে টেরেসাকে বলে—'আমরা অনেক সময় পাব। ওরা বন্ধ করার আগে গিয়ে পড়ব।'

'গাফজন' যদি বন্ধ হয়ে যেত তাহলে এত সব ঘটনা ঘট্‌তোই না। কিন্তু ষ্টোরটা তখনও খোলা ছিল। সাধারণতঃ যে প্রবেশপথটা কদাচিৎ ব্যবহৃৎ হয় সেই পথের সামনে এসে টেরেসা ওর বোনকে বলল: 'তুমি বরং গাড়িতেই থাকো, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।' কারণ, টেরেসার

তাড়া ছিল। সে একতলার লিফট দিয়ে উঠতে পারে না, তাই ও অব্যবহৃত সিঁড়িটাতেই উঠল। ওপরে যখন উঠল কেউ দেখেনি, মোটা পাপোষ বিছানো তাই কোনোরকম শব্দ শোনা যায় না। চারদিকে তাকিয়ে দেখে কথা বলার মত কাউকে দেখা যায় না। তার ফিরে আসার কারণটা শোনাবার মত কেউ নেই। শো-কেসের আয়নাগুলির সামনে যায়, অতি দ্রুতগতিতে যায়—তারপর সেই জায়গাটায় ফিরে দেখে চেয়ারের হাতলের ওপর ওর সেই বিস্মৃত কোটটা পড়ে আছে। জায়গাটা ওর ঠিক ঠিক মনে ছিল। আর একটু দূরে কাঁচের কাউণ্টারের ওপর পড়ে আছে সেই সবুজ জ্যাকেট।

সেলস-লেডী জিনিষটা যথাস্থানে রেখে দেয়। রেসা একটু থমকে দাঁড়ায়, সে নিজের কোটটা উঠিয়ে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নেয় হালকাভাবে—চারদিক স্তব্ধ। যেন সমস্ত ওপরতলাটাই খালি হয়ে গেছে, বিরাট শূন্যতা। রেসা কোনো দিকে না তাকিয়ে এবং নিজের কর্ম বিষয়ে এতটুকু ইতস্তত না করেই কেউ কাছে নেই—কারো কণ্ঠস্বর শোনা যায় না—রেসা নিজের কোটটা আবার ফেলে রাখে তারপর জ্যাকেটটা তুলে গায়ে দেয়, গায়ে দেওয়ার সময় বেশ ঠাণ্ডা মনে হয়, তার ওপর নিজের কোটটা চাপিয়ে নেয়, সেটার একেবারে গলার কলার পর্যন্ত তুলে দেয়। কয়েকটি সেকেণ্ডের ব্যাপার মাত্র। এইবার স্বয়ংক্রিয় গতিতে চলে আসার জন্য নিঃশব্দে ও যেতে থাকে, কখনো চাপা গতিতে, কখনো দ্রুত, শুখনো মেঝেটা খস খস করে সরে যায়। তারপর যেই লিফটের উলটো দিকে পৌঁছায় তখন দরজাটা খুলে গেল। যে লোকটা লিফট চালায় সে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রেসাকে অবনত ভঙ্গীতে সেলাম জানায় এবং তাঁর প্রবেশের উদ্যোগ করে দেয়। এক হাতওলা মানুষ, লোকটার অঙ্গে একটা উর্দি চাপানো, অঙ্গহীন মানুষ, ওর পকেটে জামার শূন্য হাতটা ঢোকানো। তার একটিমাত্র হাত দিয়েই সে লিফট চালায়, নিয়ন্ত্রিত করে, রেসা পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। লিফটম্যানের প্রশ্ন—'মাদাম নীচের তলায়।' শোনামাত্র সে মাথা নেড়ে জবাব দেয়। লিফট গন্‌গন্‌ করে নীচে নেমে যায়, দরজা আবার খুল্‌ল। বায়ু, রেসা মুক্ত বায়ুর নীচে দাঁড়িয়ে।

তারপর রেসা মনে মনে ভাবে, আমি তাহলে কি করেছি! একি পাগলামি! তথাপি নিজের দিকেও তাকিয়ে দেখে। মাগুরুণ ব্রীজ কিংবা

ঘোরালো পথে সুম্মাপণ্টে যাওয়া যাবে। নিজের পুরানো কোটটা খুলে উইনিকে বলে—'তোমার একটু অবাক লাগছে না? আমি মনস্থির করে ফেললাম। যাই হোক তাড়াতাড়ি করা গেল।'

ইতিমধ্যে পুলিশ অফিসার রসিদ বানিয়েছেন, সেইগুলি একটি খামের ভিতর পুরে রেসার হাতে দিয়ে দেন। রেসা সেটি তার হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতব রাখে, তারপর সে সেটি বন্ধ করল, এখন সে পালাতে চায়, নিরুদ্দেশ যাত্রা। অফিস থেকেও পালাতে চায়, কিন্তু পুলিশ অফিসার ওকে ডেকে বলেন—'আমাকে মাফ করবেন মাদাম। আপনি কিন্তু জ্যাকেটটা ভুলে যাচ্ছেন, এই জ্যাকেটের মালিক এখন আপনি!'

রেসা অফিসারকে বলে—'আপনি জ্যাকেটটা নিয়ে যা খুসী করুন, আমার যথেষ্ট হয়েছে।'

'যাই হোক্, আপনাকে বলা আমাদের কর্তব্য। আমাদের পক্ষে ওর কোনো দাম নেই।' তারপব রসিকতা করে বল্লেন—'ওর জন্য একটা ফাইল পর্যন্ত নেই।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি জোর খাটাবেন না।'

'তা আর কি করে করব? তবে জ্যাকেট আপনার কাছে সবকারিসূত্রে গিয়ে পৌছাবে। আপনার কিছু ডাকমাশুল লাগবে।'

রেসার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে। সে মাত্রা হারিয়ে বলে ওঠে—'আপনার যা খুসী করুন। বাড়িতে আমার কাঁচি আছে, এইখানে নেই। ঐ দ্রব্যটাকে ছিঁড়ে কানি বানাবার যোগ্য কাঁচি আমার আছে। সে এক আনন্দ হবে।'

'এমন একটা মূল্যবান বস্তুর পক্ষে তা লজ্জাব বিষয়।'

'আমি ওটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি, কাউকে দিয়ে দেবেন। আমি বলি কি আপনার যা খুসী হয় করুন।'

'সেই কাজটা কিন্তু সবরকম আইনের বাইরে এবং বিরোধী। তবে আপনি যদি দ্রব্যটা উপহার দিতে চান তাহলে একটা উপায় আছে, ঐ রেড ক্রসের কথা ভাবুন। এইবারও একটা রসিদ পাবেন, একটি বস্তু দান করছেন। সই করতে হবে, মালিকানার পরিবর্তন হল।'

'বেশ মালিকানা বদলের ব্যবস্থা করুন।. তবে একটু তাড়াতাড়ি।'

রেসা বলল—'অনুগ্রহ করে একটু তাড়াতাড়ি।' ব্যাপারটি কিন্তু তেমন তাড়াতাড়ি হল না। কারণ, কারা যেন একটা অতি জরুরী ব্যাপার নিয়ে ঘরে এসে হাজির হল। তারপর টেলিফোন বাজতে থাকে, কেবলই বাজতে লাগল। পুলিশ অফিসার নামিয়ে রাখতেই আবার বেজে ওঠে। তারপর পুলিশ অফিসার বলেন—'আপনি কি আপনার গাড়িটা কোনো আত্মীয়ার কাছে রেখে এসেছেন, একজন তরুণী?'

রেসা বলল—'হা ভগবান! ও কথা ভাবিনি এতক্ষণ। এখন সেই হাঙ্গামাও জড়ালো। কেন, গাড়িটার কি হয়েছে?'

'ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি কাগজপত্র তাকে দিতে ভুলে গেছেন। মাগুরা ব্রীজের কাছে একজন শান্ত্রী গাড়ি থামিয়েছে—ওঁর কাছে কাগজপত্র নেই। আপনাকে খোঁজা হয়েছে। আপনি বাড়ি নেই। আপনার কাছে কাগজপত্র আছে নিশ্চয়ই।'

'হাঁ, তা অবশ্য আছে।'

'তাহলে, আপনার আত্মীয়ার জামিন হতে হবে।'

আর শেষকালে অফিসার বল্লেন, 'আপনার আত্মীয়া কিন্তু জানতেই পারবেন না, আপনি এইখানে আটকে আছেন কেন সে-সব জানা যাবে না।'

যেখানে দাঁড়ানোর কথা টেরেসার গাড়িটা যদি সেখানেই থাকত, কারণ টেরেসা তার বোনকে বলেছিল—'এক মিনিট'। কিন্তু টেরেসা যদি তা না করত—সে ঠিক ফিরে এসে শূন্য স্থানটা দেখেছে—তার স্নায়ুতে আঘাত লাগার পক্ষে এই ব্যাপারটি যথেষ্ট। যে মানুষটা এই মাত্র চোর হয়েছে এবং প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসেছে তার স্নায়ুর কথা স্মরণ করতে হবে। দেহে একটা সবুজ জ্যাকেট আর হাতটা কোটে—আর যেখানে হোক, অতি দ্রুত আত্মগোপন করার প্রবল বাসনা তখন তার মনে। কিন্তু এই সব নয়, উদ্ভট স্বপ্নে যেমনটি ঘটে। রাস্তার অপর পারে কে একজন অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সেও যেন একটা গাড়ি খুঁজছে কিংবা নয়—সে যেন কাউকে খুঁজছে, পিছন থেকে কাউকে খুঁজছে, সেই তার চেষ্টা—হয়ত পথ চলা মানুষ, নয়ত একটা গাড়ি দ্রুত আসছে।

লোকটা এইবার মুখ ফেরালো। এ ফয়েলনার, উইনি যাকে বেচারী

বলেছিল, কারণ সে উইনির সঙ্গে দেখা করেনি। সে মুখ ফেরাতে টেরেসাকে আবিষ্কার না করে উপায় নেই। টেরেসার অঙ্গে সেই গেজেল-গ্রীন জ্যাকেট, তার ওপর ওর জামাটা—সে সেইখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। ফয়েলনার এইবার ওর দিকে হাত তুলে অভিবাদন করে। সবুজ জ্যাকেট পরে রেসা কেবল পিছু হটে—সে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। তারপর সেই সিঁড়ি, কয়েকধাপ ওপরে উঠে পড়ে, তারপর সেইখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, একেবারে দম ফুরিয়ে গেছে। সে ঠিক সেই জায়গাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে দাঁড়ালে গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

টেরেসা সম্প্রতি ওর বোনকে বলেছিল—এটা অবশ্য নিশ্চিত নয়—সে যদি সে কথা না বলতে পারত তাহলে উইনি হয়ত ঠিক থাকত। সে এই বিষয়ে এতটুকু ভাবত না। সে বরং বেশ খুসী মনে গাড়িতে বসে থাকত, গাড়ি নিয়ে একেবারে ঠিক জায়গায়। এবং ফয়েলনার, যে হাত উত্তোলন করে মাথার টুপি উঠিয়ে অভিবাদন জানিয়েছিল সে রাস্তা অতিক্রম করতে পারত, সে ওর সঙ্গে খুসী মনে গল্প-গুজব করতে পারত, এবং বোনের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে পারত।

কিন্তু তা হল না। কারণ সহসা উইনি ফুলতে লাগল, চট করে মাথা গরম করার মত তারুণ্য তার আছে। তার সৌভাগ্য যে সামনের আলো সবুজ হয়ে গেল—একপাল গাড়ি মুক্তি পেল। গাড়িগুলো ওকে অতিক্রম করে ছুটে যায়—লোকটাকেও। যতক্ষণ পর্যন্ত হলদে আলো থাকে তার মধ্যে ও ছুটে গিয়ে ঐ গাড়ির ভীড়ে হারিয়ে যেতে পারে। একেবারে লক্ষ্যহীনের মত নিরুদ্দেশের পথে ছুটতে পারে। উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন।

কি করে সে ফিরে আসার পথ খুঁজে পাবে! তারপর তাকে ব্রীজের ওপর পুলিশ আটকালো, সে কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।

সব ব্যাপারেই পুলিশ বেশ নরম ভাব দেখিয়েছে। উইনি একটা মুচলেকার হুঁসিয়ারী পেয়েছে, রেসার কাছ থেকে রেড ক্রস এককালীন দান হিসাবে অর্থ পেয়েছে। তাছাড়া একটা দ্রব্যও পেয়েছে। সবই বেশ সহজ, কোনো কিছুই ব্যক্তিগত ফাইলে লিখিত হয়নি। রেসার চাকরী পরিবর্তনের কোনো হেতু

নেই। তাই রেসা যখন চাকরী ছাড়ার নোটিস দিয়ে একটা চাকরী গ্রহণ করল তখন সবাই বিস্মিত হয়েছিল। এই কি হবে? এই রকম!

টেরেসা বলেছিল—'ব্যাপারটি অন্য রকম স্যার! এই রকমই হতে হবে!'

এমন একটা কাজের মানুষকে সহজে ছাড়া যায় না। কিন্তু টেরেসা চলে যাচ্ছে—সে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, বিশ্বস্ত লোকের দরকার। রেসা এসব বেশ নিঃশব্দে সারল। তার আবেদন যতক্ষণ না বিবেচিত হচ্ছে ততক্ষণ যেন গোপন রাখা হয়।

সে তারপর বলে—'গেজেল থেকে অনেক দূরে চলে যাব। একটু দেরী হয়ে গেল বটে—ওদের অনেকেই হয়ত গুলি খাবে। তবে তত বেশী দেরী হয়নি।'

সব জিনিষপত্র বাঁধা-ছাদা হয়েছে। রেসার পরিচিত মহল তার এই পরিবর্তনের সংবাদ জানতে পারে। মিশনের গ্রীষ্মকালীন ভোজসভায় রেসা তার টেবলে বসে আছে, সন্ধ্যাটা বেশ জমে উঠছে। রেসা কিন্তু এখনও সেই সবুজ জ্যাকেটের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়নি। যথারীতি লটারি হচ্ছে, যে সব টিকিট তখনও বিক্রী হয়নি তার নীলাম হচ্ছে। এমনই ভঙ্গীতে নীলাম হচ্ছে, যে নীলাম ডাকবে তাকে নগদ টাকাটা বাড়াতে হয়। এর ফলে রেড ক্রসের টাকাটা অনেক বেড়ে যায়। অবশেষে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। অনেক সব মূল্যবান প্রাইজ, আর কতকগুলি উপহার দ্রব্য এমন যে বিজয়ীরা হেসে উঠছেন।

অবশেষে প্রধান পুরস্কারটি দেখানো হল। চমৎকার দ্রব্য, একটি জ্যাকেট, জলপাই-সবুজ রঙ, কৃষ্ণসার চর্ম নির্মিত। সবাই প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। ঈর্ষাপূর্ণ চীৎকার। ঘোষক নম্বরটা দু-বার তিন-বার উচ্চারণ করলেন।

উইনি বলল—'কিন্তু ওটা যেন! রেসা দেখো ঠিক যেন।'

রেসা কিন্তু সেইখানে বসে নেই। সে কি একটা ফেলে দিয়ে পায়ের নীচে মাড়িয়ে ফেলে। তারপর মুখখানি কালো হয়ে গেছে, সেই সুসজ্জিত হল ত্যাগ করে সে বেরিয়ে পড়ে।

ফয়েলনায় উইনির পাশে বসেছিল, বলল—'তুমি কিছু দেখছ না?' সে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে ঠিক করে নেয়, তারপর বলে—'তোমার নামটা বলো। দেখছো না তুমি প্রাইজ পেয়েছ।'

উইনি হতভম্ব হয়ে গেছে, সে বলে ওঠে—'ননসেন্স। ও টিকিট রেগার।' তারপর টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

ইতিমধ্যে রেসা স্টেজে এসে দাঁড়ায় এবং সেই জিনিষটা গ্রহণ করে। হাততালির মধ্যে সে ফিরে আসে। তার কাঁধে জ্যাকেটটা, সে বলে—'কথাটা ঠিক, এই নাম্বার আমার। সাইজটাও আমার মত। কিন্তু আমি আমার সব জিনিষপত্র বেঁধে ফেলেছি। তোমার গায়ে চমৎকার মানায়। নাও পরে নাও, তুমি ত' এটা একবার পরেছ।'

টেবলের লোকজন প্রশ্ন করে—'গায়ে দিয়েছ মানে?'

রেসা বলে ওঠে—'সে এক বোকামো কাণ্ড। তবে ব্যাপারটা চিরকাল গোপনই থাকবে।'

বিসংবাদ

উলফ ডিয়েট্রিচ স্কনের

আগষ্ট, ১৯৫৯।

জানলার ধারে মেয়েটি ওয়ালাটরের জন্য অপেক্ষা করছিল। অন্ধকার। মার্কস-এঙ্গেলস প্লাজার ওপর থেকে সিমেণ্ট আর ডিজেল তেলের গন্ধ ভেসে আসছে, আর বার্গষ্ট্রাসের (একটি রাস্তার নাম) সামান্য কয়েকটি পথের আলো 'স্প্রী'তে পড়ে চক চক করছে, তার চার পাশে কুয়াশা।

ওকে চিঠি লিখে দিলেই বরং ভালো হত। এমন কি টেবলের ওপর একটা ছোট চিঠি দিয়ে এলেও হত। সে যে ওকে বোঝেনা তা নয়, ওকে বেশ ভালোই বুঝেছে, কিন্তু এই বোঝাপড়ার এখন আর কোনো মূল্য নেই। মন কি ভাবছে সেটা বড প্রশ্ন নয়, হৃদয় কি অনুভব করছে সেইটাই হয়ত বড় কথা। তবে যে বস্তু তাকে তাডিয়ে নিয়ে চলেছে তাব প্রতিই তার হৃদয় আকৃষ্ট হয়ে আছে, সুতরাং এখন আব সে কি আশা করতে পারে ?

সে ভাবে এতদিনে প্রায় কুড়ি বছর হল ওরা একত্রে বসবাস করেছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সত্যি কথা, কিন্তু এক সঙ্গে থাকায় অর্থ কি। সকালে উঠেই ছাপাখানায় চলে যাওয়া—সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত সেইখানে, তারপব কুপফারগ্রাবেণে মাছ ধরতে যাওয়া বা কাজের পর 'স্প্রী'তে যাওয়া আছে, আর এদিকে ওকে সারাদিনে দশ ঘণ্টা HO (ট্রেডিং অর্গানিজেসনে) কাজ করতে হয় (পূর্ব-জার্মানীতে এই প্রতিষ্ঠান সরকারি ব্যবস্থায় যে সব দোকান, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি পরিচালনা করে থাকে)। যাই হোক, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অবশ্য আছে, রাতের বেলায় পবস্পবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পাশাপাশি শুয়ে শোনা যায়, আর রবিবার প্লানটারওয়ালডে বা হাগোলসে কখনও একত্রে বেড়াতে যাওয়া ঘটে যায়। এই সবই স্বভাবতই সম্মিলিত সংযোগ। তারপর, ১৯৪৫-এ সেই সৈনিকের সঙ্গে যখন ঘটনা ঘটে, তখন ডাক্তারকে ধরে গর্ভপাত করানোর জন্য ওয়ালটার যদি জেদ না ধরত, তাহলে সেই শিশু ওদেরও হতনা, সেই অপরিচিতেরও হত না—তবে মিলন নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ দৃঢ়তর হত।

আলোক উজ্জ্বল বিরাট শুঁয়োপোকার মত ওর ডান দিক ঘেঁষে এস-বান (গাড়ি চলাচলের পথ) 'স্ত্রী'র ধার দিয়ে চলে গেছে। ঐ দিকে জানোউইটস ব্রীজ, তারপর আলেকজান্দার প্লাজা, তারপর মার্কস-এঙ্গেলস প্লাজা, তারপর ফ্রিডরিশষ্ট্রাসে। অনেক সময় বাতাস যখন ডান দিকে থাকে তখন ও শুনতে পায় ইনস্পেক্টর লাউড স্পীকারে হেঁকে বলছেন—'ডেমোক্রেটিক সেকটরের এই হল শেষ ষ্টেশন—'

অনেক সময় স্বপ্নে সে এই কণ্ঠস্বর শুনেছে, আর আজ আর একবার জীবনে এই সর্বপ্রথম কাছ থেকে শুনবে, তারপর জীবনে আর নয়। আর কখনো নয়। কোনোদিন নয়।

এখনই এই বিষয়ে কোনো এক রকমের আঘাত সে পেতে চেয়েছিল। অন্ততঃ রোমাঞ্চ হওয়া উচিত। কিন্তু যখন আর কখনো নয়, এই চূড়ান্তবাণী মনে মনে কল্পনা করেছে তখনও তার নাড়ির গতি দ্রুত হয়নি।

আশ্চর্য! সে ভাবে। এই অঞ্চল আজ চল্লিশ বছর ধরে আমার পরিচিত। তার চিন্তা হয়ত আরও কিছুদূর অগ্রসর হত, কিন্তু নিজের বয়সের কথা ভাবতে সে রাজী নয়—ওর পরিকল্পনা তার সঙ্গে খাপ খাবেনা—তাই—আমি যখন শিশু ছিলাম—, এই বলেই সে শেষ করল।

তবে মনে হয়, ও এই সব ব্যাপারে একেবারে জেরবার হয়ে গেছে কারণ পশ্চিম-জার্মানীতে একটা নতুন জীবনের সূত্রপাতের চিন্তা এখনও ওকে উত্তেজিত করে তোলে। এ ছাড়া কল্পনার পক্ষীরাজে চড়ে ইতিমধ্যে অনেক-বারই এই সব সে পার হয়ে এসেছে। তাই আর এতটুকু রোমাঞ্চ দেহে জাগেনা!

দরজায় আওয়াজ হল। ও ঘুরে দাঁড়াল, ওয়ালটার ঘরে এসে ঢুকল। ও তার দিকে মোট তাকালই না।

'ইভনিং, এলস।'

এতক্ষণে বুক কাঁপছে। 'ইভনিং, ওয়ালটার।' মনে হয়, ও সিঁড়ির আলোটা জেলে দেয়নি। অন্যথায় ওর চোখে কখনো ঘরের এই অন্ধকার এত চটপট সইতো না। আর কাউচে রাখা ছোট্ট সুটকেসটাও ওর চোখে পড়ত না।

ওর পাশের জানালায় মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে ও প্রশ্ন .করে—'চলে যাচ্ছ নাকি ?' সে আবার ওয়ালটারের গায়ে ছাপাখানার কালির গন্ধ পেল, এখনও এই গন্ধটা ওর ভালোই লাগে।

'চলে যাওয়ার আগে তুমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম।'

ও কিছুই বলল না, নিজের জড়ো করা হাতগুলির ভেতর দিয়ে নীচে তাকায়। কিংবা তারও বাইরে স্পন্দহীন কোনোখানে। একটা বদ্ধ জায়গার চারপাশে এঁদো জল। এটা হল ওর মাছ শীকারের দৃষ্টি ভঙ্গী, আর ঠিক এই জিনিষটাই এলসা ভালোবাসেনা, ঘৃণা করে প্রাণ ভরে।

'নাও, কিছু একটা বলে ফেলো।'

ও এক মুহূর্তের মত নিঃশ্বাস রোধ করে রইল। এলসা তা লক্ষ্য করল। কিন্তু ওয়ালটার কিছু বলেনা, দু-বার ঢোক গেলে।

এলসা বলল—'আমি ভেবেছিলাম এই অবস্থা কেটে যাবে। কিন্তু ক্রমশই সব কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি যে ট্রেড অরগানিজেসন থেকে ফিরে আসতে পারব কোনোদিন তা ভাবিনি, অবস্থা এমনই খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা এখানে সব কিছুই কেমন ধূসর ছন্নছাড়া। আর কেমন শূন্য—স্তব্ধতার স্বর।' এতক্ষণে রোমাঞ্চ জাগছে। ও কেঁপে ওঠে, 'যেন চাঁদে এসে পৌচেছি, অন্ততঃ কয়েকটা প্রচার মূলক প্রাচীর-পত্র আছে।'

ওদের পায়ের তলা দিয়ে একটা বড় মোটর চালিত নৌকা চলেছে, আর ষ্টীয়ারসম্যানের মুখের পাইপের তামাকটা নিয়মিত বিরতির অবসরে জ্বলছে।

ওয়ালটার বলে, 'আমার মনে হয়, তুমি ভুল করছ এলস্, তুমি কেবল ভাবছ এ জায়গাটা কেমন যেন! তুমি কি স্বজনদের ভুলে যাওনি ?'

মাথাটা একটু তুলল ওয়ালটার কিন্তু ওর দিকে না তাকানোর দিকে তার লক্ষ্য। ,

এলসা বলে—'স্বজন ?···কেমনতরো স্বজন ?' তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—'হা, তাদের দেখি নিয়তই দেখি, ট্রেড অরগানিজেসনে তাদের কাজ করি। ওদের গলা দিয়ে খাবার নামে, মদের বা বীয়ারের গেলাসে চুমুক দেয়, চাপা গলায় কথা বলে, যখনই কেউ ওদের টেবলে গিয়ে বসে তখন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। কখনো হাসেনা, কখনো মুখে হাসির রেখা দেখা যায় না, চটপট নোট নিয়ে দলা পাকায়, শেষ আধলাটি পর্যন্ত মিলিয়ে খুচরো ভাঙানী

পয়সা নেয়, তারা ক্লান্ত এবং জর্জরিত হয়ে উঠে পড়ে, তারপর ঠিক যেভাবে এসেছিল তেমনই ধূসর বিবর্ণ মুখে চলে যায়।'

ওয়ালটার বল্লে—'ওরা ঐ রকমই! আমি যখন ভোর বেলায় মোটর চলার পথ দিয়ে ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে ওদের যেতে দেখি তখনও ওরা ঐ রকম। কিন্তু তুমি কি জানোনা যখন বারান্দায় সার বাঁধা ঐ রকম তন্দ্রাচ্ছন্ন নীরব মানুষ দেখি তখন আমার দারুণ অস্বস্তি হয়? এই মানুষগুলো কখনো কেউ কারো সাথে কথা বলে না কিন্তু তবু ওরা কত বেশী ঐক্যবদ্ধ এক অদৃশ্য বন্ধনে জড়িত দোদুল্যমান গাড়িতে মুখোমুখি বসে আছে, আমার কষ্ট হয়!'

এলসা বলে—'তোমার কথা ঠিক। তবু তুমি ওদের বার্লিনের মানুষ বলেই জানো। কিন্তু এটা কি দেখতে পাওনা যে রাতের নিশুতি পথের মত আমরা মৃত এবং শূন্য হয়ে পড়ে আছি। আমি আমার নিজের মধ্যে তা দেখেছি। নইলে, আমি কেন নিওন সাইন, দোকানের জানালা, সুসজ্জিত মানুষ, হাসি, কিংবা অল্প সল্প ঘনিষ্ঠতার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকব? কারণ আমি বাঁচতে চাই। কারণ এখানে এভাবে থাকা যেন স্তুপের মত নির্বৃক্ষ প্রান্তরে বসে থাকা। কারণ আমরা মজে যাচ্ছি, ঝরে পড়ছি, শুখিয়ে যাচ্ছি, জনহীন শুষ্কতায় ক্ষিন্ন!'

ওর কণ্ঠস্বর কম্পমান। সেটা অনুভব করেই ও থেমে গেল।

ওয়ালটার গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তারপর বলে—'আর সবাই যদি এমনই করে? তাহলে ইস্ট-বার্লিন চালু থাকবে কি করে? পার্টির বুকনি দিয়ে কয়েকজন লোক বেঁচে থাকতে পারে না নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরাই বার্লিন বাকী ওরা নয়।'

'এমন ভাবে তুমি কথা বলছ যেন সর্ব শক্তি আমাদেরই হাতে।'

'কিন্তু এই যে দুর্ধর্ষতা এটা কোনো কালে দুর্বলতা হয়েছে? আমার জানতে ইচ্ছে করে।'

—'কিন্তু আমি কখনই দুর্ধর্ষ নই।' ক্লান্ত গলায় এলসা বসে 'আমার শেষ হয়ে গেছে, আমি আর পারিনা, দেখ আমার জন্ম এইখানে, আমি ভেবেছিলাম তুমিও এইখানেই থেকে যাবে, যাই কিছু হোক তুমি থেকে যাবে। আমি জানি আমাদের দুজনেরও তাই প্রয়োজন। কিন্তু এখন আমি একেবারে হাফিয়ে পড়েছি। ১৯৫৫-এর পর থেকে আমার যা কিছু শক্তি ছিল সব ব্যয় করেছি। ভেবেছিলাম আবার ফিরে পাব, কিন্তু ফিরে আর পাওয়া যায় না।'

ওয়ালটার বল্‌ল, 'ফিরে পাওয়া না পাওয়া তোমার ওপর নির্ভর করে—' তারপর হাত নেড়ে কুরফরস্টেন ব্রীজের দিকে অঙ্গচালনা করে বলে—'ঐ দিকে ঐ উজ্জ্বল আকাশে দিকে তাকিয়ে দেখ কিংবা এইখানে—এই স্ত্রী। সব জায়গাটাতেই শক্তির চিহ্ন পাবে, যে দিকেই তাকাও সর্বত্র।'

প্রায় রেগে এলসা বলে—'তুমি পারো, আমি পারি না। আমার অনেক বেশী সান্ত্বনার প্রয়োজন, আমার দম আটকে আসছে।'

এই কথার উত্তরে ওয়ালটার কিছু বলে না, সে আবার কাঁধের ওপর দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখে তাঁর মৎস্য শীকারীর দৃষ্টি। তার হাত দুটি বুকের ওপর জড়ো করা। এলসা লক্ষ্য করল যে ওর ওপর একটা ঈর্ষা জাগছে, এখন যাওয়ার সময় হোল।

না নড়েই এলসা বলল—'আচ্ছা। আমি তাহলে যাচ্ছি।' সে অনুভব করে ও যেন আবার দম বন্ধ করে আছে হয়ত বা গিলেও ফেলছে। কিন্তু সে এগিয়ে আসছে না, তার হাত দুটি যেন সীসা বেঁধে ভারী করা হয়েছে।

ধীরে ধীরে কাউচের কাছে গিয়ে এলসা তার স্যুটকেশটা উঠিয়ে নেয়—এখন আবার তার মনে সেই পুরাতন শূন্যতা জাগে—কোনো উত্তেজনা নেই, নেই এতটুকু অনুশোচনা।

'বিদায়—ওয়ালটার!'

দরজা বন্ধ হল। সিঁড়িতে আলো জ্বলে ওঠে। চলে গেল।

নীচে প্রাঙ্গনে ভেজা ছাই এবং পচা কাঠের সোঁদা গন্ধ। ও যে চওড়া হিলওলা জুতাটাই পরেছে একথা ভেবে খুসী হল। তার অর্থ পদে পদে মুচির চিন্তা করতে হবেনা। ব্রীটষ্ট্রাসের পথের ওপর বাতাস শন্ শন্ বেগে প্রবাহিত। তার সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ—স্প্রী। ওর সেই স্প্রী। এলসা বাড়ির গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলে। কত লোক আজ ছাদ হীন, মাথার ওপর ছাদ নেই, ওপরের আকাশটা অকটোপাসের মত দেখায় আর সুদীর্ঘ গহ্বর সদৃশ ফাঁকগুলি মনে হয় অকটোপাসের বাহু। যেন সেই বাহু দিয়ে আমাদের ছিঁড়ে টেনে ওপরে উঠিয়ে নেবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়ির সারি শেষ হয়ে গেল, ও একেবারে মার্কস-এঙ্গেলস প্লাজার ওপর এসে পড়েছে, সামনেই সেই পথ। একজনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না—শুধু ডানদিকে ওর পিছন থেকে ক্যাথিড্রালের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

কার্নিশের ওপরকার পরীগুলি নীরবে বংশীবাদন করছে—একটা পোষ্টারের একটি কোন দেখা যাচ্ছে—তার অক্ষরগুলি অসমান। এইখানে একদা প্রাসাদ ছিল কিংবা মাত্র ন'মাস আগে ঐখানে ছিল ক্রিসমাস মার্কেট, আলট্রা-ভায়োলেট উষ্ণ ব্যবস্থা স্টলগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত, কার্ডবোর্ডের তৈরী আরৎসগ্রে ব্রিজের বামনমূর্তির বিরাট আকৃতি দেখে মনে হত যেন লাল ফৌজের কড়া চেহারা সেনাদল। এর দ্বারা কারো পক্ষে চোখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হত না। সবদিক থেকেই শূন্যতা বিশেষ করে পরিস্ফুট, পাশের দিকে ছোট্ট সুটকেশটা চেপে ধরে এলসা কুপফারগ্রাবেণের ব্রিজের দিকে এগিয়ে চলে।

আনটার-ডেন-লিনডেনের দিক থেকে একখানি বাস ওর দিকে এগিয়ে এল, বাসটা চলে যেতে ও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল জানালার পাশের ধূসর আশাহীন মুখগুলি দেখে।

ৎইউঘাউসের এলাকাটা পার হতে পারলে ভালো। পথের আলো জ্বলছে, লিনডেন গাছগুলির পাতার মর্মরধ্বনি, এমন কি আশে পাশে কিছু লোকজনও ঘুরছে, আর পুর্ণগঠিত ওয়ার মেমোরিয়ালের রেলিংএর ওপর দুটি নর-নারী F D J-র উর্দি পরে (ইস্ট-জার্মানীর কম্যুনিষ্ট যুব-সংগঠনের নাম—স্বাধীন-জার্মান-তরুণ) হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে পিছন দিককার শূন্য পানশালার দিকে হতাশার ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে।

এলসা ভাবল, ওরা শীগ্‌গীর আবার আগুন ছোঁড়াছুড়ি সুরু করবে ; যতই এগিয়ে চলে এলসার ততই মনে হয় সে যেন একটি স্কুলের ছাত্রী, তার আশপাশে আগে অনেক মেয়ে ঘিরে আছে—দারুণ সংশয়ময়চিত্তে ৎইউঘাউসের প্রহরী বদলের পালা জানলা দিয়ে দেখছে। কয়েকটি কঠোর মূর্তির ইস্পাত শিরস্ত্রাণ মণ্ডিত প্রহরী, ওদের দেখে একবার ছুটির সময় ওয়ালটার দাঁতের ওপর দাঁত চেপে তার টুপির প্রান্তে হাত রেখেছিল—সম্ভ্রম প্রকাশের প্রচেষ্টা।

ব্রাণ্ডেনবার্গ গেটের আঘাতচিহ্নিত স্তম্ভের ওপর ফ্লাড-লাইট ফেলা হয়েছে ; পাতার প্রোজ্জ্বল সেই দৃশ্য অনেকদূর থেকেই এলসা দেখতে পাচ্ছে। তার-পরই সুরু হয়েছে ও যাকে বলে—'নতুন জীবন'। অর্থাৎ সেখানে কিন্তু কিছুই নেই, কিছুই সুরু হয়নি। শহর এগিয়ে চলেছে। এমন কি এখানকার মত ওখানেও সেই একইরকমের আগাছা গজিয়েছে। একদিন রবিবার সকালে

ও আবিস্কার করেছিল যে টিয়ারগার্টেনের কাকগুলি সিনকেল-প্লাজার কাক যেভাবে কা—কা করে ঠিক সেই একই ভাবে ডাকছে, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ও দেখত, কিংবা সর্বদাই দেখতে পেত, এখনও তেমনই দেখবে।

যাই হোক, আর একটি জগৎ— এরপর থেকেই আর একটি জগৎ সুরু হয়েছে। এখানকার বাতাস হয়ত এখনও ঠিক মুক্তির হাওয়া নয় কিন্তু সে যাই হোক, এ হাওয়া আশার হাওয়া। ও ভাবল, ওদিকে গিয়ে কিছু একটা দেখব এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, এমন কি গোড়ার দিকে সাফাই-কারের কাজ সুরু করলেও অনেক ভালো।

ফ্রিডরিশস্ট্রাসের দিকে মোড় ঘুরে সে লক্ষ্য করল ওর বুক কাঁপছে। এখানেও জীবন, চওড়া ঝলমলে ট্রাউজার পরা তরুণ দল, মাথায় লম্বা চুল, চওড়া উত্তমরূপে বাঁধা টাই এঁটে নৃত্যশালার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান করছে আর বাজনার তালে তালে দুলছে।

রেলওয়ে ব্রীজের ওপরের বাতির পর্দায় শামুকের গতিতে কি সব অক্ষর নিওনের আলোয় লিখিত, পথ চলতে সেইদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে এলসা। কোথায় যেন কোন ডেলিগেসন অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে অভ্যর্থিত হয়েছে। ওদের কাছে এইসবই ভালো, এই ওদের উপযুক্ত।

টিকেট অফিসের শূন্য টিকেট হলের দিকে এগিয়ে দিয়ে ও বলল—'একখানি একশ কুড়ি দিন দয়া করে।'

সে অনুভব করে যেন সে একটা টিউবের ভিতর দিয়ে কথা বলল, সে আশ্চর্য হয়ে গেল, কাঁচের জানালার ওপাশের মেয়েটি সোজাসুজি একটা টিকিট ওর হাতে তুলে দিল। কিন্তু ওকি লক্ষ্য করেনি যে ও চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে, ওরা যাকে বলে—'রিপাবলিক থেকে পলায়ন'।

হ্যাঁ, ওরা ঠিকই লক্ষ্য রেখেছে ওর দিকে। ওপরে প্লাটফর্মের ওপরকার ট্রান্সপোর্ট পুলিশ ওর দিকে এবং ওর সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তারপর ভারী পদক্ষেপে এগিয়ে এল, তার আঙুলগুলি বেল্টের বগলসের ওপর।

হতভাগা সুটকেশ, ওর ভেতর মাত্র দু-একটা কাপড় জামা, দু-একটা অন্তর্বাস, হাত মুখ ধোয়ার জিনিষপত্র আর একটা এক হাত ভাঙা স্মৃতিচিহ্ন ডল পুতুল, এই ত আছে।

লোকটা কিন্তু অন্য কিছু ভাবছে হয়ত। কেননা ও বেশ হাসছে। অনেকক্ষণ অবশ্য এই হাসি রইল না, ওর মুখে ঠিক সেই সময় আলো পড়ে থাকবে তখন পুলিশম্যানের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, সে মৃদু স্বরে শীষ্ দিতে দিতে চলে গেল।

এলসা একটা ফিল্‌ম পোষ্টার বোর্ডের ওপর দেহের ভর দিয়ে দাঁড়াল তারপর এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে।

এর পর ট্রেন এসে পড়ল—তারপর সেই কণ্ঠস্বর। ওর স্বপ্নের সেই কণ্ঠস্বর। লাউড স্পীকার হাকছে, স্বপ্নের ঘোরে শোনা যাচ্ছে—'ফ্রিডরিশস্ট্রাসে, ডেমোক্রাটিক সেকটরের শেষ স্টেশন।'

এলসা ভাবে—'আমেন'।

বেশ শক্ত হয়ে হাতের মুঠিতে স্থটকেসের হ্যাণ্ডেলটি সজোরে চেপে ও জানলার পাশে গিয়ে বসে। এত জোরে চেপেছে যে হাতটা শাদা হয়ে গেছে। কিছু ভাবা চলবে না। বেশ উদাসীন মুখের ভাব নিয়ে থাকতে হবে, ওরা এখনও ধরে ফেলতে পারে।

না, আর বেশী ভয় নেই। দরজা বন্ধ হল। ট্রেন ছেড়ে দিল। গাড়ির ভেতরকার কেউই ওর দিকে তাকিয়ে নেই।

কি যে সে করতে চাইছে সেই বিষয়ে মনে মনে একটা বেশ সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে চায় কিন্তু সেই এস-বান বা মোটর চলার পথের বাইরে ও যেতে পারে না।

তারপর সহসা, হয়ত মনের অস্পষ্ট ধারনায় বার্লিন যেন জানালার ভেতর দিয়ে ছাড়িয়ে চলেছে। রাইখস্টাগের ধ্বংসাবশেষ, দুটি লৌহ তুরঙ্গমের কঙ্কাল দু-পাশে, দিনের বেলা ওর ওপর তুমি আরোহীদের বসার চিহ্নও হয়ত দেখতে পাবে, তবু আজ অনেকদিন হল তা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। স্প্রীর চারপাশে জঞ্জাল এবং কয়লার স্তূপ। হামবোল্ড বন্দর আর তার ইটের বাড়িগুলি পিছনে পড়ে—লেহরতার রেলওয়ে ষ্টেশন—মোয়াবাইটার গুডস্ সেড, অনেক দূরে অন্ধকার টিয়ারগার্টেন পার হয়ে বিচ্ছিন্ন তারার আলোর মত ঝকঝক করছে অন্য বার্লিন—উজ্জ্বল—অনেকদিনের আশার সামগ্রী, সুখের সংসার। জানলার ওপর নিজের মাথাটা চেপে ধরে এলসা বাইরের পানে তাকায়।

হ্যাঁ, এই সেই! এখনও ওকে ঘিরে আছে, এই সব আলোভরা ঘরগুলির

মধ্যে যে কোনো একটি ঘরকে ওকে একদিন সাফ করতে হবে। ও যে সাফাই করার কাজ পাবে।

সে ভাবতে থাকে, হয়ত একটা অফিস ঘর, যতক্ষণ না লোকজন আমাকে ঘিরে ধরছে এমনই ভাবা যাক। কিন্তু ইতিমধ্যে বেলিভিউতে ওরা এসে গেল। হাসতে হাসতে সুন্দর পোষাক পরা নর-নারীর দল। মেয়েরা পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা, সুন্দর সেজেছে। তরুণ দলের মুখ বেশ পুরুষ্টু, দাড়ি কামান, জুতা পালিশ করা আর সার্ট এমনই শাদা যে চোখে দেখতে পারা কঠিন। ওরা স্বর্গরাজ্যের মানুষ!

কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! এলসা এতদিন ওদেরই চেয়েছে তবু আজ চোখের ওপর দেখে কেমন সহ্য হচ্ছে না। এ সব যাই হোক ভালো নয়, সে মনে মনে বলে। কি যেন তাকে বাধা দিল—একটি পুরুষ, একটি শীর্ণ মানুষ সামনে ঝুঁকে এল, তার গায়ে ছাপাখানার কালির গন্ধ, আর সে বুকের ওপর হাত দুটি জড়ো করে নিঃশব্দে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন সে অনুভব করল একটা বাস সোজা ওর ডান দিক ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। সে আবার সেই আলো, সেই ক্লান্ত, প্রাণহীন মুখগুলি দেখতে পেল, তাদের গাল ভাঙা, চোখ বসা, জানালার ভেতর থেকে ওদের দেখতে পাওয়া যায়। সহসা হন্‌সা জেলা বাইরে প্রকাশিত হল—বিরাট বিরাট অতিকায় বাসাবাড়ি, ভীষণ উঁচু, কট্‌কটে আলোয় ভরা, ইটের পর ইট, স্তরের পর স্তর, যেন মৌমাছির চাক আকাশে হাত বাড়িয়েছে বাতায়নে তা প্রতিবিম্বিত। একই সঙ্গে এই সব নাগরিক স্কাইস্ক্রাপার গড়ে উঠেছে, এলসার মুখটিতে যেন দরজা, জানলা, জানলায় পরদা, বাড়ির নম্বর, সিঁড়ি, বারান্দা সব আঁকা, ফুটে উঠেছে, একে একে। কাঁচের বাইরে থেকে ওর মুখের ওপর তাকিয়ে আছে। যেন তারা প্রশ্ন করছে—'এই যে এলসা, তুমি এখানে কি করছ?'

চোখ বন্ধ করল এলসা, সে এখন ইনডাসট্রিয়াল অরগানিজেসনের রান্নাঘরের কথা ভাবার চেষ্টা করে। সেই বাষ্প, সেই বমি উদ্রেককারী গন্ধ, যেখানে তার পোষাক টাঙানো থাকত, সেই মরিচা ধরা আলমারি, অন্য স্ত্রীলোকটির শ্রান্ত, উজ্জ্বল মুখ, সে শুনতে পেল যেন বলছে—'আইডেনটিটি কার্ড প্লীজ'—পরিচয় পত্র দিন। নতুন খরিদ্দার এসে কোনো কিছু চাইলেই একেবারে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত উচ্চারিত হবে—'আইডেনটিটি কার্ড প্লীজ।'

খরিদ্দারদেরও যেন দেখা যাচ্ছে, তাদের সে যথাসম্ভব ধূসর এবং সমান আকারের ভাববার চেষ্টা করতে থাকে। সব বৃথা। তাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছে ঠিকই, তাদের স্পষ্টই দেখছে, সবই যেন একেবারে ঠিক ঠিক বাস্তবরূপে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু সহসা একটা বিতৃষ্ণা, একটা বিবমিষা, শ্রান্তি—তার সব কিছু প্রতিবাদ কোথায় অন্তর্হিত হল।

ঐত সামনে সব লোকজন বসে আছে। ওর মতই মানুষ হয়ত ঢুল্‌ছে। ক্লান্ত তবে ওরা বার্লিনের মানুষ। যে সব বার্লিনবাসী এইখানে জন্মেছে, যারা চলে যায়নি, যারা তাদের আলেকজান্দ্রা প্লাজা আঁকড়ে ছিল। যারা তাদের শূন্য, খানা-খন্দর বিশিষ্ট রাজপথকে রিক্ত করে চলে আসতে পারেনি, যারা তাদের পুরাতন বাসার প্রতি অবিচল নিষ্টা প্রকাশ করেছে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, হালভাঙা-নোঙরা ছেঁড়া বাসাবাড়ি আর উঠান। অবশ্য এদের মধ্যে বুরোক্রাটরা আছেন, উচ্চকোটির মানুষ তাঁরা, দলপতি, বড় কর্তা, আমলাতন্ত্র। কিন্তু অন্যদের পাশে তারা কি? কিছুই নয়!

আমরা বার্লিনবাসী। তার অন্তর থেকে একটা বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে, ওরা নয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার মনে হল, যে ভাবে তখন বুক কাঁপছে, সেই সময়েই যেন ওয়ালটারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বাইরের আকাশ উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, বিজ্ঞাপনের আলো জ্বলে উঠছে—সবুজ, লাল, এবং হলদে। সংবাদপত্রের কাঁচের বাক্সের ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে, উজ্জ্বল আলোক শোভিত একটি বিশাল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার বর্হিরেখা অগ্নিশিখার মত দেখাচ্ছে, গাড়ি থামতেই অনেক যাত্রী ভীড় করে এসে পড়ছে, —রঙদার, আনন্দময়, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন বেশধারী। আর এলসা লাফিয়ে উঠল তার সুটকেসটি হাতে ধরে-তারপর প্রায় সজোরে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

জু— তার দিবাস্বপ্নের এইটাই সব সময় একমাত্র স্টেশন হয়ে ভেসে উঠেছে। তার সামনে নবজীবনের যাত্রাপথ প্রসারিত। তারপর এখন? সে মনে মনে ভাবে আমি একটা ভুল করেছি, যদি এটা স্বপ্ন না হয় তাহলে ভুল—আমি এখানে অপরিচিত। আমি পথ হারিয়েছি।

এই সব কংক্রিটের তৈরী বাক্স—আমি যেন চন্দ্রলোকে এসে গেছি।

একটা বেঞ্চে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে এলসা, চারদিকে তাকায়। তার চোখে

জল ভেঙে পড়ছে, সে তাকিয়ে থাকে আলোকোজ্জ্বল হারডেনবার্গষ্ট্রাসের দিকে, আলোকিত মেমোরিয়াল চার্চের দিকে—আর একবার পেনসিল সদৃশ স্কাই-স্ক্র্যাপারে গিয়ে তার নজর ধাক্কা খায়, সে একটা বিশ্রামের আশ্রয় সন্ধানে চারপাশে তাকায়।

এই সব লোকজন, সে ভাবে—হাজার হাজার মানুষ, তারা সবাই নীচেকার রাস্তায় ভীড় করে চলেছে, প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছে, বারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—ওপর-নীচে যাতায়াত করছে, ওর পাশে এসে বসছে—তবে ওরা সবাই অপরিচিত। এলসা প্রতিদিন যে সব লোকের খিদমদ খাটত তাদের কারো সঙ্গে ওদের সম্পর্ক নেই।

ইনডাষ্ট্রিয়াল অরগানিজেসনের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়ালে ওরা সবাই পোষ্ট-কার্ডের ছবির মত।

সে ভাবে—এখন কি করা যায়? কি করবে সে? এখন ত হাসি, আলো, পরিস্কার কাপড়-চোপড় সবই পেয়েছ, এখন ভগবানের দোহাই অন্ততঃ একটু খুসী হও।

সে খুবই চেষ্টা করল। কিন্তু ভেবে পায়না কি নিয়ে সে খুসী হবে। সহসা তার মনে হল সে মাত্র চারটি ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছে। চারটি ষ্টেশন পার হয়েই তুমি আর এক দেশে পৌছে গেছ। ঠিক সেই সময়েই তার মনে আর এক চিন্তার উদয় হল। মাত্র চারটি ষ্টেশন পিছিয়ে গেলেই সে শুনতে পাবে সেই কণ্ঠস্বর—'ফ্রিডরিশস্ট্রাসে! রাত্রির নিঃশব্দ ভেদ করে লাউড স্পীকার হাঁকছে —'ফ্রিডরিশস্ট্রাসে।'

অন্য দিকের ট্রেনে গিয়ে ওঠবার সময় এলসা নিদারুণ অভিভূত হয়ে পড়েছে। লাগেজ র‍্যাকের ওপর স্যুটকেশটা যেন তেন প্রকারে রেখে দিয়ে সে দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রেন যেই চলতে সুরু হল আর জু ডিষ্ট্রিক্টের আলো আবার দেখা যেতে লাগল তখন তার মনে কুপফারগ্রাবেনের কথা উদিত হল।

একটি খাটো মানুষ, গায়ে তার ছাপাখানার কালির গন্ধ ইনসেল ব্রীজের কাছটিতে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে—তার বুকের ওপর হাত দুটি জড়ো করা, মাথা নীচু করে মাছ ধরার ছিপের দিকে তাকিয়ে আছে।

তার পাশে নিঃশব্দে গিয়ে ও দাঁড়াতে চায়, তাকে জানার চেষ্টা করবে, ওকে জানলেই এইসব কিছু ভোলা সহজ হবে।

জুন, ১৯৬৩।

খালের ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে ছিল ওয়ালটার। এটা কুপফারগ্রাবেন, ও তার ছিপে 'স্প্রী'র তরঙ্গ অনুভব করে, সেই তরঙ্গ মাছের টিপ্‌কে রোগা পাথরের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে খালের মুখটিতে।

রাত হয়েছে। অপর পারে মারকিসখেনের বাড়ির অল্প কয়েকটি আলো অনেক আগেই নির্বাপিত। ইনসেল ব্রীজের দুই প্রান্তে শুধু দুটি গ্যাসের আলো এখনও জ্বলছে—তার শিখা ধূমউদ্‌গীরণ করছে, সহসা একটা ঝলক মাঝে মাঝে সাঁকোর নীচের কালো জলে ঝলকিত হচ্ছে। 'স্প্রী'র পথ থেকে একটা সন্ধানী আলো নোঙর করা গাধা বোটের ওপর গিয়ে পড়ছে।

ভুল হয়ে গেছে। নাইট-সিফটের যথারীতি দীর্ঘ-সংলাপের পরিবর্তে ও বরং চলে গেলেই ভালো করত, কারণ সে পর্যন্ত ওরা রেগে উঠ্‌ত, মেসিন চালু থাকায়, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার না করলে কোনো কথাই শোনা যায় না।

কিন্তু সে কি আর করতে পারে? একই প্রতিষ্ঠানে পনের বছর ধরে শুধু রোটারি অপারেটর হয়ে থাকা যায় না। বাড়তি আধঘণ্টা ধরে সিলিণ্ডারের ওপর কাগজের রোল প্রবাহিত হচ্ছে, অন্তহীন গতিতে। এদিকে প্রাণান্তকর একটা গন্ধ, উত্তপ্ত তেলের আর ছাপাখানার কালির উৎকট গন্ধ।

ওর বন্ধুরা—ওদের মধ্যে দু-জন সবে কাজ সুরু করেছে, ঠিক ওর মতই নতুন করে সখেরেলের এই ছাপাখানায়—জেনসালেমার স্‌খেরেল, সাখ্‌সেন-ষ্ট্রাসের মোড়ে ঠিক সেখানটায় প্রাচীর সুরু হয়েছে। ওদের মধ্যে একজন এসেছিল কি একটা উৎসব দিবসে, নাকে নকল নাক বসানো, হাঁটুতে হারমণিকা, আনটার-ডেন-লিনডেনে একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্রানডেনবার্গ গেট পর্যন্ত গিয়েছিল। এই সব মুহূর্তে এইরকম সব কথাই মনে পড়ে। তবে অবশ্য প্রশ্ন এই, যে আজকের এই দিনে, আর সব দিনের চাইতে বেশী করে এই দিনটিতে এ সব জিনিষ নিজের মনের ভেতরই রেখে দেওয়া উচিত। কারণ, যদি তোমাকে অল্পভাষী বলে সবাই জানে তাহলে বেশী কথা বলাটা সন্দেহ জাগায়। এই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ওদের চোখে সে লক্ষ্য করেছে।

ওর পিছনে ক্লোনিসখের ফিস মার্কেটের দিক থেকে একটা যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেল; এ ট্রামগাড়ির আওয়াজ, হোহেনডাম ব্রীজ থেকে ট্রাম নীচে নামছে, ব্রেক চালু রেখেই নামছে। এর পর স্পিটল মার্কেট, তারপর

ডেসোফ-প্লাজা, ফ্রিডরিশস্ট্রাসে। উইলহেলমস্ট্রাসে, এরপর ট্রাম গিয়ে থামবে প্রতিধ্বনিমূলক জলাজমির কাছে বিধ্বস্ত ওয়ারথহাইম স্টোরের প্রায় সমান স্তরে, ড্রাইভার আর কনডাক্টার ফিরতি পাড়ির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

ট্রাম লাইন কিন্তু আরো দূরে চলে গেছে। সেই ত' হল ব্যাপার,—ঐ লাইনের নাম "রিপাব্লিককে এড়িয়ে"—

রাষ্ট্র যদিও তাদের বিরুদ্ধে পাথরের ভার চাপিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তথাপি ওরাও অবিচল। ওরা নানা রকম বহুরূপীর বেশ ধরে, সাষ্টাঙ্গ শুয়ে পড়ে প্রাচীরের ধার ঘেঁসে বুকে হাঁটে। জনগনের পুলিশ তাদের বাধা দিতে পারে না, সহসা কোথা থেকে বেরিয়ে আগ্রহ ভরে আর এক ট্রামের চাকায় গিয়ে পড়ে।

খালের রেলিং এবং হাণ্ডেল বেষ্টনীর মধ্যে ছিপ গাছা ঝুলিয়ে দেয় ওয়ালটার। তার হাত কাঁপছিল, ওই ট্রাম লাইনের কথা মনে এলেই হাতটা কাঁপে।

আজ আবার এর সঙ্গে অন্য উপসর্গ জুটেছে—সে সহসা দেখল পটসডামার প্লাজা অন্ধকারের ভেতর থেকে যেন আবার জেগে উঠছে। যে দিকে তাকান যায় সেদিকে স্বল্পালোকিত জলাভূমি, একটা শ্লিট্-ট্রেঞ্চ (বোমা এড়ানোর গুহা), রেল রাস্তার এলোমেলো অংশ নিয়ে গড়া ব্যারিকেড্ (বাধার বেষ্টনী), ইউ-বান-রাস্তা লোহার বেড়ার বাহুল্যে কালো দেখাচ্ছে, সযত্ন কনক্রিট নির্মিত একটি দ্বিতীয় প্রাচীর তার সামনে অন্য দিক থেকে গড়ে উঠেছে, একটা তোরণের কাঠামোর ওপর বিজলীবাতির মালা দিয়ে তৈরি পর্দা বানানো, তার ওপর আলোর অক্ষরে অতি দ্রুতগতিতে পুলিশের সংবাদ ঝলতিক হয়ে ওঠে। কিন্তু কেন ? কার জন্য ?

এখানে কোনো জীবন নেই—খালি দারিদ্র আর মৃত্যু। ওয়ালটার যদি তখন চোখ বুজোয় তাহলে সে যে অন্তরে স্তেপ-সদৃশ শূন্যতা অনুভব করবে সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এমন কি যে ট্রাম লাইন পটসডামার প্লাজা অতিক্রম করে যায় এই অসহায়ত্বের সর্বগ্রাসী অনুভূতি থেকে সেও ত কই ত্রাণ করতে পারে না। বরং, ওদের সকলের মনে হচ্ছে ওরা যেন কোথায় চলেছে—কোন এক নামহীন শূন্যতায়।

ও মনে মনে ভাবে—দাঁড়াও! এই চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন কোরোনা। ও

নিজের সুতোটা তুলে নিয়ে মাছের টোপটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখে নেয়, পোকারা নিজেরাই আহত হয়ে আছে বড়শি'র গায়ে, মণ্ডলাকার হয়ে আছে। তাকে কোনো মাছ স্পর্শও করেনি, অক্ষত দেহ। ওয়ালটার তার ওপর থুতু ফেলে তারপর ভার সহ সেটি আবার জলে ফেলে দেয়।

সেই শেষবার, ঢেউটা থিতিয়ে যাক তার পর আমি জাল গুটিয়ে নেব।

ওর দেহের উত্তমাঙ্গ খালের রেলিং থেকে বেরিয়ে পড়েছে, যে অংশটা ঠিক মসৃণ জলের আয়নায় গিয়ে মিশেছে সেই জায়গাটা দেখারও চেষ্টা করে—ঠিক ঠিক নজর রাখতে গভীর মনঃসংযোগের প্রয়োজন। অতল জলের অন্ধকার কিন্তু অনেক ঘনীভূত, তার ওপর এক প্রস্থ হাল্‌কা কুয়াশা পড়েছে। তার ফলে ঠিক এই মুহূর্তে নিজের প্রতিবিম্বের বহিঃরেখাও ওয়ালটার দেখ্‌তে পাচ্ছে না। এই মুহূর্তে হয়ত তাতেও একটু সাহায্য হত, কারণ সে মনকে প্রবোধ দিয়েছিল।

মিথ্যা আশ্বাস যে ও চলে যাওয়ার পরও কুপকারগ্রাবেনে ওই ছায়া থেকে যাবে, আর ওর প্রতিবিম্বের ভেতর থেকে একটা মাছ লাফিয়ে উঠবে, কিংবা একটা মাছের পোনার ঝাঁক সহসা এসে পড়বে, আর ব্রীজের ওপরকার অধিবাসীদের ছায়া বা বৃষ্টি তাকে ঢেকে দিতে পারবে না।

হয়ত, আর আমার কোনো ছায়া নেই, সকালে দাঁড়ি কামানোর সময় আয়নায় যা দেখেছি সে নেহাৎ আমার চোখের ধাঁধা। এই দু-বছরে যা সব সে হারিয়েছে এইটা তার মধ্যে একমাত্র বস্তু নয়। সে মনে মনে এই সব ভাবে।

সে আবার মাথাটা তুলে দাঁড়ায়। রপস্ট্রাসের সিঁড়ি গুলি নেমে গেছে। ওর মনে হল যেন একজন স্ত্রীলোকের পায়ের আওয়াজ কানে এল। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল, না ও কিছু নয়—সে যেই হোক সে সময় নিচ্ছে! আর যাই হোক, সে জানবেই বা কেমন করে? ও শুধু ওর সাইকেল আর মাছধরা ছিপটা বাসার নীচতলা থেকে এনেছে প্রতি সন্ধ্যায় যেমনটি করে। আর ওপর তলায় রান্নাঘরের ড্রয়ারটা ঘেঁটেছে।

এখন পদধ্বনি রপস্ট্রাসের ব্রিজের ওপর এসে পৌঁচেছে। এইবার ক্ষণ-কালের জন্য থামল—তারপর আবার ধীর গতিতে চলে। এ তার পদধ্বনি।

সে তার ছিপের সুতোর দিকে তাকায়। একটা মাছ। সে ছিপটা টানে, ছিপের প্রান্তে মাছটা দ্রুতগতিতে পাক খায়। তারপর বরাবর বড় মাছ ধরলে

যে অনুভূতি মনে জাগে সেই বৈদ্যুতিক সক্ তখন তার দেহ স্পর্শ করে, তার বাহুতে যেন সেই স্পর্শ। মাছটা সাঁতার কেটে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। ওয়ালটার তাকে সুতো ছাড়ে একটু একটু করে। এই অবস্থা তাকে বিভ্রান্ত করে। সহসা বাধা মুক্ত হয়ে সে গতি সম্পর্কিত চেতনা হারিয়ে পিছনে তাকায়। অজ্ঞাতসারেই ওয়ালটার আবার ছিপের সুতো ঘোরায়, মাছটা ঠিক ওর তলায়—ও দ্বিতীয় বার টান দেয়, এইবার আর মাছটির এদিক ওদিকের অঙ্গ ভঙ্গী কোনো সহায়তা করতে পারে না। মাছটাকে জল থেকে টেনে তোলে ছিপটা। মাছটার পাংশু নিম্নভাগ চক্ চক্ করছে, ওয়ালটার তাকে জালের ভেতর ধরে রাখে।

এলসা বল্‌ল—'বেশ ধরেছ। সুন্দর।'

এই সর্বপ্রথম ও লক্ষ্য করল যে সে ওর পাশেই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

কণ্ঠস্বর ভারী করে ওয়ালটার জবাব দেয়—'হ্যাঁ, প্রায় পাকা দু-পাউণ্ড হবে।'

একটা ঝাড়ন দিয়ে মাছটা চেপে ধরে তার পুরুষ্টু চোয়াল থেকে বড়শিটা টেনে খোলে ওয়ালটার। সেই মাছটার বাঁচার আগ্রহ আর একবার ওয়ালটারের অন্তরে সেই বৈদ্যুতিক সক্ সঞ্চারিত করে।

ওয়ালটার মাছটাকে তার মাছ ধরার টিনের ভেতর ফেলে দেয়। সাইকেলের পিছনে সেটি বাঁধা ছিল। তারপর বলে—'কি করব। উপায় নেই। কথা রাখতে পারলাম না।'

এলসা বলে—'আশ্চর্য! তোমার যেন কি হয়েছে। জলের দিকে আগের মত আর যেন চেয়ে থাকেনা, এ যেন অন্য রকম দৃষ্টি।'

ওর দৃষ্টি এড়িয়েই ওয়ালটার জবাব দেয়—'তাই নাকি!'

এলসা বলে 'তুমি কি এটা খুঁজছ! আগে তোমার সেই বস্তু ছিল, এখন আবার তার সন্ধান করছ।'

ওয়ালটার নীরব, তারপর যতদূর সম্ভব সাবধানতার সঙ্গে তার হাতটা ছিপে রাখে। মনে মনে ভাবে অন্ততঃ যতক্ষণ না কাঁপুনি আসে—সতর্ক থাকি!

সেই কুয়াশায় দীর্ঘশ্বাস টেনে এলসা বলে—'কি হয়েছে ওয়ালটার?'

সে বলে—'কি আবার। কিছুই নয়।'

'আমি অনেকদিন ধরেই অনুভব করেছি, কি একটা বিষয়ে তুমি অস্বস্তি বোধ করছ।'

এলসার অঙ্গে তখনও তার কাজের পোষাক। রসে যাওয়া খাদ্যের গন্ধ থেকে ওয়ালটার তা বুঝতে পারে। শেষ পালার কাজ শেষ করে ও হয়ত একটা কোট গায়ে দিয়েছে।

ওয়ালটার বলে—'এলসা তুমি শুয়ে পড়লেই পারতে, জানো ত' আমি কত কম ঘুমাই।'

'আমি হয়ত শুয়ে পড়তাম, কিন্তু একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি।'

'লক্ষ্য করেছ ?' এই প্রথম ওর দিকে তাকাল ওয়ালটার। তৎক্ষণাৎ তার মনে হল সে যা করেছে তা করা উচিত হয়নি মোটে। ওর কাছ থেকে সব কিছু গোপন করেছে, ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছে নির্মমভাবে, ওর শ্রান্ত, কর্ম-ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে মেঘ জমে ওঠে। সে প্রশ্ন করে—'কি দেখেছ বলো দেখি!'

'রান্নাঘরের ড্রয়ারে ওয়েষ্ট মার্কস ছিল মনে আছে ?'

মনে পড়ল। এলসার পুরাতন হিসাবের খাতায় এই নোটটা ছিল স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে। আজ সন্ধ্যাতেই সেই নোটটা তার চোখে পড়েছে।

এলসা বল্‌ল—'সেটা আর নেই।'

অন্যদিকে নারকিসত্থেন উফার ওপর দিকে একটা সিন্ধু শকুন ডানা ঝাপ-টানি দিয়ে উড়ে গেল। অত্যন্ত করুণ গলায় ডেকে ডেকে সেটা আবার খালের রেলিং এ বসে পড়ল তারপর ডানা দুটি নিজের দেহের সঙ্গে জড়ো করে নেয়।

'আর কি কি গেছে জানো ?'

ফটো, ওয়ালটার মনে মনে ভাবে। ভুলের ওপর ভুল। এসব ব্যাপারে আমি কাঁচা। ফটোটা নেওয়া আমার উচিত হয় নি। বিশেষতঃ ঐ ফটোটা।

এলসা বলে—'আমাদের বিয়ের ছবি। সেই পোষ্টকার্ড ফটোটার কথা বলছি। রান্নাঘরের কাঁচটার তলায় সাঁটা ছিল। নোটটার মত, সেটাও উড়ে গেছে।'

ক্লান্ত গলায় ওয়ালটার বলে—'তাইত! তাইত!'

মাছধরার সরঞ্জামে ভারী পুরাতন হ্যাভারস্যাকে অন্য মনস্কভাবে টোকা দিতে দিতে এলসা বলে—আমি আশ্চর্য হইনি ? বুঝলে, আশ্চর্য হইনি। আমি

শুধু বোঝবার চেষ্টা করছি। এইখানে ঐ পশ্চিম জার্মানীর টাকা তোমার কোনো কাজেই লাগবে না। আর ফটোটা স্মারকচিহ্ন হিসাবে রাখতে চাও?'

দুবার ঢোঁক গিলল এলসা, তারপর বলে, 'এর একটা কিন্তু অর্থ হয়, তা হল তুমি পালাবার পথ খুঁজছ। পালিয়ে যেতে চাও!'

গম্ভীর গলায় ওয়ালটার বলে—'বারে, আমি ত' এখানে শুধু মাছ ধরছি।'

'তাতে আমার বক্তব্য আরো নিশ্চিততর হয়। যখনই কিছু অঘটন ঘটেছে তখনই তুমি মাছ ধরতে বেরিয়েছ। গোড়ার দিকে তুমি এভাবে মনটা অন্য দিকে চালাতে পারতে, এখন এটা একটু আত্মস্থ হওয়ার জন্য করে থাক। মনটাকে সংহত করার চেষ্টা।'

একটা হালকা হওয়া বয়ে গেল, এই হাওয়া এসেছে মার্কস-এঙ্গেলস প্লাজার দিক থেকে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে সিমেন্টের ধূলোর গন্ধ আর একটা গর্জনশীল লরীর আওয়াজ।

'একটা কিছু বলো ওয়ালটার।' এলসার গলা ভাঙা শোনায়। অতি-কষ্টে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'বলো—এই সবই একটা স্বপ্ন।'

যতটা সম্ভব কঠিন করে ছিপগাছটা চেপে ধরে ওয়ালটার। ছিপটা ভাঙেনা, শুধু সুন্দর ভাবে বেঁকে পড়ে—'না, এ সব স্বপ্ন নয়। এলসা, স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে তুমি চেঁচিয়ে উঠ্‌তে পারো।'

'আমি এখনও ত' চেঁচিয়ে উঠ্‌তে পারি।'

'তা কোরোনা। শুধু বাজে লোকরাই সে আওয়াজ শুনবে। এক-বার ভেবে দেখ তাদের কথা যারা চেঁচিয়েছে এবং তাদের কি পরিণতি ঘটেছে!'

এলসার কনুই দুটি খালের রেলিং-এ ঝুঁকিয়ে নামিয়ে দিয়েছে, তার সেই একত্রিত করা হাতদুটির ভেতর দিয়ে সে অতল জলের পানে তাকিয়ে থাকে। তার মুখে কথা নেই। সে নীরব।

ওয়ালটার বলে—'তুমি নিজেই জানো আমি কতবার চেষ্টা করেছি, সন্ধ্যা-বেলার প্রচার ক্লাস, পার্টির রাজনৈতিক লেকচার, অস্ত্র-শিক্ষা, কুচ-কাওয়াজ, ছোটখাটো গোয়েন্দাগিরি, জ্ঞানবৃদ্ধি করা, মিথ্যা বলা—। সব কিছুই বার বার গিলেছি। তবে একটা সময় আসে, যখন আর চলে না। তখন আর অন্য কোনো পলিটব্যুরোর কর্তাব্যক্তির কথা শোনা যায় না, মনে হয় রাইফেল

ধরার চেয়ে বরং নিজের হাতখানা কাজ করতে গিয়ে নষ্ট করা ভালো। খুদে অফিসার তোমার কাঁধের ওপর বীয়ার ঢেলে চুমুক দেবে তা সহ্য করার চেয়ে বরং ক্যান্টিনের বারে শক্ত হয়ে এঁটে বসে থাকা ভালো। যখন বলে ওঠো "দায়যুক্ত কোটা" "উৎপাদন কার্যস্থচী" তখন তোমার মনে হয় চীৎকার করে উঠি। এই সব কথা যে মানুষের উদ্দেশ্যে রচিত এই কথা মনে হলে কি ভাব মনে জাগে?'

এলসা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলে—'আমি বুঝতে পারি! যাই হোক, ওদের সঙ্গে আমাদের ভাষার প্রভেদ আছে। তাই নয় কি! আমাদের কি এমন অংশ নেই যেখানে খুদে অফিসার পৌঁছাতেও পারে না। যা কিছু করুক সেখানে সে প্রবেশ করতে পারে না। আর এই রাইফেল? তুমি যদি নির্বোধ বা কাপুরুষ না হও তাহলে কি কোনো রকম বিপদ এড়িয়ে কি তা ব্যবহার করা যায় না? রাজনৈতিক বক্তৃতা কি শুনতেই হবে? তার চেয়ে উত্তম কিছু চিন্তা করতে পারো না?'

নদীর ওপর দিয়ে একটা লঞ্চ সবেগে চলে গেল—তার ফ্লাড লাইটের আলো ঠিকরে পড়ছে। ওরা জল পুলিশ। সীলিং ও ওবারবাসের মধ্য দিয়ে নদীটা উভয় প্রান্তের সীমানার কাজ করছে, পুলিশদের এই দিকে আবার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে।

এলসা বলে—'ওয়ালটার, তুমি এখানে আর নেই বলা চলে।' নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে ওয়ালটার। কীয়েল ব্রীজের কাছ থেকে নগরের জল-প্রবাহ নেমে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। সে তখন বলল—'ঐ প্রাচীর!' তারপর রেলিংএর ওপর মাছ ধরা ছিপটা রাখে, কারণ, ওর হাত আবার কাঁপছে। সে বলে—'আমি কেবল পাঁচিল দেখছি, সব সময়ে ঐ পাঁচিলটা দেখছি। শুধু যদি এই পাঁচিল না থাকত তাহলে এত-শত সত্ত্বেও কোনোরকমে হয়ত থাকা যেত। কিন্তু এইভাবে—? এর সঙ্গে যুঝবার শক্তি কোথায় পাবে? পাহারা তোরণ? প্রাচীর? কাঁটা তারের বেড়া?'

এলসা ঢোঁক গিলে বলে—'একবার তুমি কিন্তু অন্য কথা বলেছিলে।' ওয়ালটার উত্তর দেয়—'হ্যাঁ, ইস্ট বার্লিন তখনও প্রাণবন্ত ছিল। আর এখন? তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো প্রাচীর কি ভাবে সব কিছু বিষিয়ে দিয়েছে। পথ-ঘাট কি ভাবে শুখিয়ে যাচ্ছে। পার্কগুলি শূন্য, বাড়িঘর

ভেঙে পড়ছে। শুধু আগাছাই বেড়ে চলেছে। আর, কবরখানায় অবশ্য গাছ-পালাগুলো বেশ পল্লবিত হয় উঠছে।'

এলসা বলে— 'আমার মনে হয় তুমি একটা ভুল করছ ওয়ালটার। তুমি ইস্ট বার্লিনের বাইরেটা বড়ো করে দেখছো। শূন্য পথ, ফাঁকা পার্ক আর বোমা বিধ্বস্ত জঙ্গলাকীর্ণ অংশ। যুক্তির দিক থেকে অবশ্য আশা কম।

কিন্তু এক সময় কি তুমি বলোনি যে মানুষকে আঁকড়ে থাকো, আশপাশের দিকে তাকিও না? আমি ত' সেই কথাই বেদবাক্য মনে করে হৃদয়ে গেঁথে রেখেছি।'

ওয়ালটার বলে—'তোমার তবু একটা বস্তু আছে আর আমার আছে ঐ প্রাচীরের পাথরগুলো।'

এলসা বলে—'কিন্তু সেটা যদি টেনে নিয়ে বলো তাহলে কি বোঝা হালকা হবে? না ওয়ালটার, যতদূরেই তুমি যাও বোঝা তোমার আরও ভারী হয়ে উঠবে।'

ওয়ালটার বলে—'আমি জানি, আমি স্বস্তির সন্ধানে যাচ্ছিনা, আমি যাচ্ছি আমাকে যেতে হবে বলেই।' নিজের বুড়ো-আঙুল দিয়ে নিজের দিকেই দেখায় ওয়ালটার—'এখনও আমার মধ্যে একটা মানুষের অংশ বিশেষ আছে যে একেবারে নিঃশেষিত হতে চায় না। সেই আমাকে জোর করে নিয়ে চলেছে—যেতে বলছে।'

এলসা বলে—'আর এখানকার মানুষ?' বাইসিকেলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সে বলে— 'তারা কি করবে?'

ওয়ালটার বলে—'ভবিষ্যৎবক্তা নই আমি, মহাত্মা নই। তবে একটা কথা সুনিশ্চিত, মানুষ হয়ে এখানে বেঁচে থাকা ওদের কাছে ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে উঠবে!'

উত্তেজিত হয়ে এলসা বলে—'ওরা কি করছে তা তুমি ঠিকমত দেখছ না। তারা ঠিক ঠকছে তা নয়। তারা বেঁচে আছে, কেমন বেঁচে নেই?'

ওয়ালটার মাথা নাড়ে—'ওরা চেষ্টা করছে। কিন্তু সত্যি বলো তো! ওরা কি কিছু করতে পারছে?'

'তুমি এখনও বুঝবে না।'

এলসা অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে তার মাথা এপাশে ওপাশে নাড়ায়। সে যখন

ঘুমাতে পারে না তখনও এমনই করে। অপরাধীর ভঙ্গীতে অন্যদিকে মুখ ফেরায় ওয়ালটার। কত রাত্রে পা টিপে টিপে মাছ ধরে ফিরে এসে দেখছে এলসা এমনই ছট ফট করছে বিছানায় শুয়ে।

এলসা বলে—'ঠিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যে কাল তার কথা মনে করো। তখন কি বার্লিন প্রায় মৃত ছিল না? আর তারপর ওয়ালটার কোথায় আবার যাত্রা সুরু হল? জীবন? ধ্বংসের মধ্যে জীবন? বিধ্বস্ত রাজপথে জীবন? পার্কগুলি রাবিশে বোঝাই ছিল সেইখানে জীবন? না জীবন ছিল আমাদের মধ্যে। আর যেখানে জীবন এর ভেতর থেকে এসেছে, সেইখানে জীবন এই রকম কালে এই ভাবেই চলে যায়। আমি স্বীকার করি মৃত্যু একটা উন্মুক্ত ক্ষতকেই আরো বেশী করে খুঁচিয়ে তোলে আর তা সেরে ওঠে না। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি এর কোনো যুক্তি নেই। নামের মানে নেই। কারণ আমরাই হলাম বার্লিনের প্রাণ।'

ওয়ালটার বলে—'আমরা…?' তার মুখের একটা প্রান্ত নেমে পড়ে—'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন আমাদের মত মানুষরাই শুধু আছে এখানে। তাহলে 'আমরা'টি কি বস্তু? এটা একটা সম্মিলিত নাম মাত্র। এর মধ্যে আছে পার্টির মানুষ—তারা এর অন্তর্গত। যারা এই প্রাচীরের সমর্থক তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। এই…এই অবস্থা জীবন নয়। এটা একটা পদ্ধতি মাত্র। আর এখন এই প্রাচীর একটা রাষ্ট্রের সীমানায় দাঁড়িয়েছে। এভাবে চলে না—একটি মাত্র কাজই করা যায়, বেরিয়ে যেতে হবে।'

এলসা তার কাঁধ ঘষে বলে—'নিশ্চয়ই বার্লিন ছেড়ে নয়।' তার শীত করছে।

ওয়ালটার বলে—'সেই কথাটি ভাবছিলাম। আমি ভাবতাম এই হল ইস্ট বার্লিন, ওদিকটায় অন্য। কিন্তু এ অবস্থা জটিলতর হয়ে উঠছে। প্রাচীর ওঠার পর থেকে সংঘর্ষ বেড়ে চলেছে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে ভয়, রুটিতে সিমেন্টের ধুলার গন্ধ, যেখানেই যাও সেই সিমেন্ট। বাড়িগুলো তোমাকে অস্বীকার করছে, পাথর যেন তোমাকে গ্রেপ্তার করতে চায়, পার্ক তোমাকে অপরাধী মনে করে। তোমার নিজের চার দেয়াল তোমাকে বন্দী করে রাখে। তুমি যতই কেন একা থাকো। অবিশ্বাস তোমার সঙ্গ ছাড়া নয়, সব সময় লেগে আছে। তারপর পার্থক্যটা বলো। তারপর সীমারেখার কথা বলো, তারপর

বলো—তাই ভালো এই আমাদের বার্লিন। অসম্ভব। এ সব চলে না এলসা, এ পারবে না। এখানকার কোনো কিছু থেকে যদি বিচ্ছিন্ন হতে চাও তাহলে এখানকার সব কিছুই তোমাকে ছেড়ে যেতেঃহবে।

ইতঃস্ততঃ করে এলসা প্রশ্ন করে—'আর ওয়েস্ট বার্লিন? সেখানে কি আশা করো?'

ওয়ালটার ছিপের সুতো টানার উদ্যোগ করে বলে—'কিছু না। বায়ু পরিবর্তন আমার কাছে যথেষ্ট। আর একবার অন্ততঃ একটু স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারব।'

'আর কি তোমার জীবিকা হবে?'

বেশ সাবধানতার সঙ্গে ছিপটা গুটিয়ে সাইকেলে বাঁধতে বাঁধতে ওয়ালটার বলে—'বাধ্য না হলে আমি কিছুই না করতে পারি। হয়ত খবরের কাগজ হেঁকে বেড়াব। অপেক্ষা করে দেখতে হবে।'

শীতে জমে গিয়ে এলসা তার কোটের কলারটা উঠিয়ে দেয়, বলে—'যাই হোক, কেউই সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবে না।'

—'না, এখানেই শুধু জনগণের পুলিশ আমাদের মত মানুষের প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।'

পানা থেকে ওর পানে তাকিয়ে ঢোঁক গেলে এলসা, তারপর বলে—'আর কি ভাবে তা এড়াতে হয় তার নিরাপদ রাস্তা তোমার জানা।'

ওয়ালটার বলে—'না, না, আমি কিছুই জানিনা। তবে আমি কি এখানেই নিরাপদে ছিলাম কখনো?'

এলসা নিরুত্তর।

মাছ ধরা ছিপ প্যাক করা শেষ। ওয়ালটার দেখে নেয় প্যাণ্টের পায়ে বাইসিকল ক্লিপ ঠিক মত আঁটা আছে কিনা। তারপর বাতাসটা অনুভব করে। যা ভয় করছিল, ভোরবেলার শীতল বাতাস বইতে সুরু করেছে।

'এলসা, এই অন্ধকারের সুযোগ নিতেই হবে।'

এলসা বলে ওঠে—'অন্ধকার! হ্যাঁ এর সুযোগ তোমাকে নিতে হবে।' নিজের কপালে নার্ভাস ভঙ্গীতে একবার হাত বুলিয়ে নেয় এলসা—'আশ্চর্য, তুমি কেমন ভাবতে পারো যে যখন আর চলে না তখনই বিচ্ছিন্ন হওয়া যায়।'

ধীরে বাইসিকলটা টেনে নেয় ওয়ালটার—'এই রকম যে হবে তাও কোনো দিনই ভাবতে পারিনি।'

এলসার কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠেছে—'কিংবা—কিংবা, একি আমাদেরই দোষ ওয়ালটার?'

ডাইনামোটার সুইচ ঠিক করতে ওর হাত কেঁপে ওঠে, সে বলে—'আমাদেরই দোষ?' সে ভাবে—সহজ মনে সব নাও, সহজ হও।

সে সাইকেলে উঠে পড়ে। এলসার ধূলিধূসরিত জুতার ওপর সাইকেলের আলো প্রতিফলিত হয়। প্রাচীর অতিক্রম করে সহসা সাইকেলের গতি বাড়িয়ে দেয়। ফ্রিডরিশস্ট্রাসের খালের ওপর একটা উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ। একটা ভেসে আসা হাওয়ায় পচা কাঠ আর বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসে, পথের ওপর আড়াআড়িভাবে ছায়া পড়ে, তারপর অন্ধকারে গিয়ে মিশিয়ে যায়। খালের রেলিং সরে যায় দ্রুতগতিতে, ডাষ্টবিনগুলিও যেন রেসে যোগ দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, সে পালিয়ে চলেছে। সব কিছুর হাত থেকে পালাচ্ছে।

আর একবার ব্রেক কস্‌তে হবে। গেটক্রডেন ব্রীজের ওপর কথাটি মনে পড়ল যে সেই মাছটা এখনও সাইকেলের পিছনে টিনের ভেতর আছে।

গাড়িটা থামিয়ে না নেমেই সেটা তুলে নেয় ওয়ালটার। বেঁচে থাকার বাসনা মাছটার মনে প্রবল। ওর হাতের ভেতরও সে প্রবল বেগে ছটফট করছে।

তিনবার তার গায়ে থুতু ফেল্‌ল ওয়ালটার, তারপর রেলিং গলিয়ে জলে ফেলে দিল। একটি মুহূর্তের জন্য মাছটির পাশের দিকটা রাতের আকাশের নীচে চকচক করে উঠল, তার লেজের ডানা ইতিমধ্যেই নাড়তে সুরু করেছে। সে অতল জলের আয়না নিঃশব্দে ভেদ করে জলের গভীরে প্রবেশ করল।

উষ্ণ আমেজের সন্ধানে

. যোশেফ মার্টিন বয়ের

যে সারল্যটুকু সাইমন স্খেনলার একান্তভাবে তার নিজস্ব বলে ধারণা করে নিয়েছে, সেই সারল্য সত্বেও সে অচিরাৎ আবিষ্কার করে বসল যে অতিথি হিসাবে যে-কোনো ব্যক্তি মন্ত্রকের দপ্তরের মনোরম উষ্ণ আমেজ সহজেই উপভোগ করতে পারে, একেবারে নিখরচায়, কোনো রকম অধিকার অবশ্য জন্মায় না এর জন্য, তবু যে-কেউ এখানে আবেদনপত্র, প্লান, রিপোর্ট বা রিপোর্টের পরিশিষ্ট হাতে করে এসে এখানকার কর্তাদের উত্যক্ত করতে আসে এই উষ্ণ আমেজটুকু সেও বিনামূল্যে উপভোগ করতে পায়।

এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে তার একটা নতুন পথ উন্মুক্ত হয়, স্থপতিদের অফিসের প্ল্যানের আবেদন আর তার চিঠিপত্র বয়ে নিয়ে আসার অজুহাতে। মন্ত্রীদের দপ্তরে কাজকর্ম অবিশ্বাস্য রকমের শ্লথ গতিতে অগ্রসর হয় এই কথা মেনে নিয়ে এমন কি প্রবেশ করতে গেলে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়, সাইমন স্খেনলার এই জাতীয় চিঠিপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ মাত্রাতিরিক্ত বিলম্বিত করতে থাকে—এই ব্যাপারে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শীতের মধ্যাহ্নটুকু উত্তাপযুক্ত এই বারান্দায় বা ঘরের ভেতর একটু বেশী সময় কাটিয়ে দেওয়া। কয়েক মাসের মধ্যেই সাইমন একটা বিশেষ জ্ঞান আহরণ করে ফেলল, মোটামুটি জ্ঞান নয়, সেই জ্ঞান ক্রমে গভীরতর হয়ে ওঠে। সে জেনে নিল কিভাবে ঘরগুলি বণ্টন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, এমন কি সেই সব বিভাগে কাজ করে তাদেরও জেনে ফেলল। তার ফলে, একমাত্র পত্রবাহকের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ না করলেও, সে নবাগত যেসব আবেদন-নিবেদনকারীর দল প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ে আসত, তাদের প্রয়োজন বুঝে নিয়ে কোথায়, এমন কি কত নম্বর ঘরে এবং কার কাছে যেতে হবে তা ঠিক ঠিক বলে দিত, (কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই বলে দিত) আরো বেশী প্রশ্ন করলে সেই সেই ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণও দিয়ে দিত। তাদের আচার আচরণ, মনোভঙ্গী এবং খ্যাপামির কথাও বলতে আটকাতো না।

আর যাই হোক, এই আটতলা বাড়ি, তারপর কয়েকটি মন্ত্রণাদপ্তরের

প্রাচীনত্ব কম নয়, তারপর স্থাপত্যের দিক থেকে কয়েকটি অলি-গলি রীতিমত গোলকধাঁধাঁর মত, প্রভৃতির কথা বিচার করে যে-কোনো নিরপেক্ষ বিচারককেও বলতে হবে যে এই জটিল ভাবে বিন্যস্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কে সাইমনের জ্ঞান বিস্ময়করভাবে প্রশংসনীয়।

যে কাজের প্রয়োজনে সাইমনকে মন্ত্রণালয়ে যেতে হত সেই কাজ করার আগে অনেকক্ষণ ধরে সুদীর্ঘ অলিন্দে ধীর পদক্ষেপে ঘুরত আর উদার উষ্ণতার স্পর্শ উপভোগ করত, তারপর তার নিজের কাজটুকু সেরে এই সব ঘরের ভিতর দিয়ে সে অলস অথচ সজাগ দৃষ্টি দিয়ে ঘুরত। অলসভাবে ঘোরার কারণ এই যে, তাহলে দীর্ঘ সময় ধরে উত্তাপময় নিরাপত্তার আশ্রয়ে থাকা যাবে, আর সজাগ দৃষ্টির কারণ অলিন্দের সব কটি রেডিয়েটারের ওপর দৃষ্টি রাখা, কিছু না নজর এড়িয়ে যায়। এই ভাবেই সাইমন সব জেনেছে।

সাইমনের এই জ্ঞানাভিসারের ফলে সে ক্রমে ঘরগুলির নম্বর জেনেছে, তারপর নাম ফলক, প্রধান প্রধান বিভাগগুলি, কামরাগুলির ভেতর যাঁরা কাজ করেন তাঁদের পদমর্যাদা, তাঁদের কর্মকাণ্ডের পরিধি প্রভৃতির সঙ্গে রেডিয়েটারের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটুকু সম্পর্কে সে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করত। সাইমনের যা কাজ তার বিনিময়ে যা পেত তা অতিশয় তুচ্ছ হওয়ায় সে কুড়িটি রেডিয়েটার অতিক্রম করে তবে একটা নতুন হাতে পাকানো সিগারেট জ্বালাতে পারত, কারণ তার বাজেট ছিল সীমিত।

মাঝে মাঝে, যখন এই আলস্যের চিহ্ন ওর মুখে চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠত তখন কোনো ইনস্পেক্টর বা অলডারম্যান জানতে চাইতেন সে কি চায়, তরুনীরা এবং অন্যান্য মহিলারা তার উপস্থিতিটুকু অগ্রাহ্য করতেন। তাঁদের সেই প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসার ভাব থাকত—বিরামবিহীন ধূমপানের জায়গা এটা নয়। এটা কাজ করার জায়গা।

প্রচুর অবসর উপভোগ করার ফলে সাইমনের স্নায়ু শিরা তার আয়ত্তাধীন ছিল, এর ফলে সব রকম পরিস্থিতিতে সে শুধু মুখে হাসি ফুটিয়ে অলসভঙ্গীতে কোনো একটা ঘরের দিকে আঙুল নির্দেশ করত। এই ইঙ্গিতের ভাষায় সে বোঝাতে চেষ্টা করত যে সেই দরজার পিছনে যিনি কাজ করেন, তার প্রয়োজন তাঁরই সঙ্গে।

অনেক কিছু ভেবে চিন্তে সে ভাবল যে অফিসের দরজার দিকে আঙুল

দেখানোর সঙ্গে ওর হাতে যদি কোনোরকম ফাইলপত্র থাকে তাহলে ভালো হয়, তাই সেই বিশেষভাবে সবটা ভেবে চিন্তে একটা ফালতু ফাইল-কভার হাতে করে উত্তাপ উপভোগ করতে সুরু করল। এই ব্যবস্থার ফলে তার সমগ্র জীবনধারার যেন একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল।

প্রতিদিনই কিন্তু মন্ত্রণালয়ে কাজ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটে উঠত না, আর কর্মহীন দিনগুলিকে পূর্ণ করে তোলাটাও সহজ ব্যাপার ছিলনা, তাই বিগতকালের সংবাদপত্র, নাগরিক ব্যবহারের ক্যালেণ্ডার, পুরাতন কিছু পরিত্যাক্ত বিলপত্র ইত্যাদি ফাইল-কভারের ভেতর রেখে এই যথাযোগ্য হাতিয়ার হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত একটা কৃত্রিম লড়াই করতে, এই রণাঙ্গণ হল মন্ত্রণালয়ের বারান্দা এবং অলিগলি—নিয়মিত যাতায়াত এবং দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই সরকারি দপ্তরেরই সে একজন হয়ে উঠল।

এরপর থেকে সাইমনকে কেউ আর মোটেই বিরক্ত করেনি। সাইমন জানত শীতের দিনের ফুল কি ভাবে তুলতে হয়, এরপর উষ্ণ আশ্রয় তার জন্য কায়েম হয়ে গেল, এবং সেই সূত্রে যেসব মহিলা এবং তরুনীর দল ফাইল হাতে বিচরণ করতেন তাদের সঙ্গে সৌজন্যসূচক হাস্য বিনিময়ও চলতে থাকে, আবার যারা ঠিক ধরতে পারেন না লোকটি বহিরাগত না এখানকার, সেই সব গম্ভীর দর্শন পুরুষরাও তাকে অভিনন্দিত করেন এমন কি মাঝে মাঝে স্বয়ং মন্ত্রীমহোদয়ও বলে ওঠেন ধন্যবাদ, মন্ত্রীমহোদয়ের আগমনের মুখে অনেকদিন সে অসামান্য উৎসাহে তাঁর দরজাটা খুলে দেয়। মন্ত্রীমহাশয়ের হয়ত সবে দিনের কাজ সুরু হচ্ছে।

যাই হোক্, ঠিক উষ্ণতার সন্ধানের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও একদিন অপরাহ্ণে একজন পাঁসনে পরা ভদ্রলোক—সাইমন অনেকদিন আগেই জেনেছে এঁর নাম অলডারম্যান কোওগল—বারান্দার মাঝামাঝি এসে ওকে ধরলেন, তাকে প্রিয় সহকর্মী বলে সম্বোধন করলেন—অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ সহকর্মী হিসাবেই অবশ্য, তাঁর বাচনভঙ্গীতেই তা প্রকাশিত। তিনি সাইমনের হাতে একটি ফাইল ধরিয়ে দিলেন তার ভেতর কয়েকটি নামের তালিকা ছিল, তার-পর অফিসারী কেতায় আধা আদেশসূচক ভঙ্গীতে অনুরোধ করলেন ডিপার্ট-মেণ্টের সবকটি অফিস এই তালিকাটি নিয়ে ঘুরে আসতে। সবাই অচিরৎ বুঝতে পারবে, ব্যাপারটি কি—একজন মৃতব্যক্তির জন্য একটা মালা কিনতে হবে তার চাঁদা। অলডারম্যান কোওগল ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। এই

সর্বপ্রথম সাইমন অফিসের ভেতরে প্রবেশ করল, সেখানকার সব কর্মীদের পদমর্যাদা, নাম, মুখ খুবই পরিচিত, শুধু সে কখনো ভেতরে আসেনি।

সাইমন তালিকাটি মহিলা টাইপিষ্ট থেকে সুরু করে একটু মর্যাদামণ্ডিত আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁদের সকলের সামনে নিয়ে হাজির হল, এই চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্য তালিকার প্রথমাংশে বর্ণিত সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, রীতি অনুসারে দাতারা যে যার নামের পাশে যে পরিমান অর্থের কথা লিখেছিল নগদে সেই অর্থ সংগ্রহ করল। চাঁদার পরিমান ত্রিশ ফেনিং থেকে এক মার্ক—সব জড়িয়ে আটত্রিশ মার্ক। এই তহবিল দেখে অলডারম্যান কোওগল একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। তাঁর সহকর্মী নির্দিষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া অন্যত্র গিয়ে সাফল্যের সঙ্গে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। যাঁরা মৃতব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাদের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে চাঁদা দিয়েছেন, বাইরের বিভাগের দাতারা।

ঘটনাটি ঘটেছিল বসন্তকালে, তখনই ধীরে ধীরে গরম পড়তে সুরু হয়েছে।

সারা গরমকালটা সাইমন অফিসে না গিয়ে বাইরে যেখানে সচ্ছল উত্তাপ সেখানেই উত্তাপ সংগ্রহ করল। ফাইল-কভারের হাত থেকে এই সময়টা নিষ্কৃতি। সময় কাটাল রৌদ্রতপ্ত রাজপথে, পার্কের বেঞ্চে আর নদীর ধারে—ছোটখাটো কাজ করে, ও সামান্য বার্তাবহণ করে যেটুকু অর্থ পেত তাতেই সে সন্তুষ্ট।

যাই হোক, গ্রীষ্মকালেও যাতে অন্যধরনের অবস্থা না দাঁড়ায় যে তার জের শীতকালে সামলানো যাবেনা—তাই সাইমন ঈশ্বরের সূর্যালোকের সুযোগ নিয়ে অবকাশের মাঝে ছোটখাটো কাজ নিয়ে দৌড়াত বিশৃঙ্খল অফিস পাড়ায় —যার ফলে কোনো রকম সংশোধনী ব্যবস্থার কোনো আবেদন যেন গ্রীষ্মের মাঝেই শেষ না হয়ে যায়।

সারা গ্রীষ্মকাল ধরে সাইমনকে আগের শীতকালের শেষ ঘটনাটি ভাবিয়েছে। তারপর, অনেক উত্তেজনাপূর্ণ চিন্তা ভাবনার পর সেই বছর আবার ঘুরে ফিরে অকটোবরে এসে পৌছাল তারপর তার সেই অনিবার্য পরিণতি যার ফলে সরকারি দপ্তরের অলিন্দের অপচয়িত সরকারি উষ্ণতা উপভোগ করা অধিকতর সুবিধাজনক মনে হল, এইবার আর সাইমন তার ফাইল-কভারের ভেতর পুরাতন পঞ্জিকা এবং পরিত্যক্ত বিলপত্র নিয়ে বেরোল না। তার পরিবর্তে

রুলটানা সাদা কাগজ, এই ব্যবস্থার পিছনে আছে দীর্ঘদিনের সুচিন্তিত কর্মপন্থা —অলডারম্যান কোওগলের সেই আদেশ তামিল করার পর থেকে সাইমন আর বিশ্রামভোগ করতে পারেনি।

একদিকে মন্ত্রকের রেজিমেণ্ট সদৃশ কর্মীবাহিনী আর অন্য পক্ষে আমাদের সাইমন। সবাই যখন ক্রমশঃই শীতজর্জর হয়ে পড়ছে, আর মন্ত্রণালয়ের বারান্দা উষ্ণতর হয়ে উঠছে সেইক্ষণে আবার পরস্পর বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। সাইমন তার ফাইলের প্রথমতম পৃষ্ঠায় একটি সংক্ষিপ্ত আবেদন লিখল—মহিলা এবং পুরুষ সহমর্কীদের কাছে নিবেদন যে সর্বজনপ্রিয় বাহান্ন বছর বয়স্ক সহকর্মী এমেরাম নোলের আকস্মিক এবং বেদনা দায়ক মৃত্যু ঘটেছে, তাঁর মৃতদেহে মাল্যদানের উদ্দেশ্যে সহকর্মী জনোচিত চাঁদা দান করুন। বলাবাহুল্য সমগ্র ব্যাপারটি সাইমনের মস্তিস্ক প্রসূত।

সাইমন যখন তালিকা নিয়ে ঘুরছিল তখন অনেকেই প্রশ্ন করল এ কোন 'নোল'? এই ইনস্পেক্টার নোল লোকটি কে? সাইমন বুঝিয়ে দিল এ হোল পাশের বিভাগের ইনস্পেক্টার নোল—সুন্দর ভব্য একটু খুঁড়িয়ে হাটত —তখন সবাই তাকে চিনতে পারল, এই অল্প বয়সে যে তার মৃত্যু ঘটল এর জন্য সবাই দুঃখিত। সাইমন কল্পিত মৃতব্যক্তির যে সব সদ্‌গুণ মাথা ঘামিয়ে বার করেছিল—তারা তার চেয়ে অনেক বেশী জানতেন। সবাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলতে লাগল, এবং সবজড়িয়ে মৃতব্যক্তিটি একজন সহৃদয় সহকর্মীর মূর্তি নিয়ে সবায়ের চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

ছাপান্নজন নাম সই করল, নগদ টাকা উঠল চল্লিশ মার্ক, চাঁদা-সংগ্রাহক সাইমনের প্রথম তালিকা শেষ হল, সে আবার একটা নতুন পরিকল্পনা রচনা করল—মানুষের অন্তরের করুণা ধারার উৎস যেন শুখিয়ে না যায়—কারণ অনেকেই হয়ত শেষে বলতে পারে এত সব চাঁদার পর আমার নিজের জন্য একটা বড়ো সড়ো মালার আর প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় তালিকার পর, তৃতীয় তালিকায় মৃত এমেরাস নোলের নাম ও সদ্‌গুনাবলী বর্ণিত হল—এই ভাবে নটি কাজের দিন অতিক্রান্ত হল, সাইমন মন্ত্রণালয়ের সবকটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে তার সারা মাসের মত জীবিকা সহজেই সঞ্চয় করে নিল।

অসামান্য নম্রতা এবং ভব্যতার প্রভাবে সাইমন স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয় এমন কি তাঁর ষ্টেট সেক্রেটারির কাছ থেকে সুরু করে কম মাইনের সর্টহ্যাণ্ড

টাইপিষ্টের কাছে পর্যন্ত চাঁদা সংগ্রহ করল। প্রকৃতপক্ষে, সবাই সাইমনকে জানে, বারান্দায় তার সঙ্গে প্রায় সকলেরই দিনে কয়েকবার দেখা হয়। তাই সবাই যেমন সাইমনকে চেনে, তেমনই যাদের কাছে চাঁদা চাওয়া হত তারা সবাই মনে করত মৃত এমেরাম নোলও তাদের নিশ্চয়ই পরিচিত। মন্ত্রী মহোদয় সবায়ের ওপর একটা সুদৃষ্টান্তের নজীর রাখার জন্য স্বয়ং একেবারে পুরো পাঁচমার্কের একটি নোট চাঁদা দিয়ে দিলেন।

এই সংগৃহীত টাকাটা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হওয়ার আগেই সাইমন আবার একটা নতুন তহবিল খুলে চাঁদা আদায়ে লেগে গেল। এইবার হল আটাশ বছর বয়স্ক হানস্ ক্রীইবেলের সঙ্গে আইরিন বাইয়ারলীনের শুভ-বিবাহ। হানস্ হল তদন্তকারী ইনসপেক্টার আর আইরিন একজন সামান্য কেরানী। যেহেতু বর এবং কনে দুজনেই একই মন্ত্রকের কর্মী, বাগ্‌দত্ত এই ভাবী দম্পতির বাসনা যে ব্যক্তিগত সুবিধার উপযোগী একটা বস্তু উপহার পায় তাদের সহকর্মীদের হাত থেকে, তাই একটা নতুন ধরণের, সুন্দর নরম কিন্তু ব্যয়বহুল ফোম রাবারের গদী তাদের বিবাহের উপহার হিসাবে পেলে বাসনা সহজেই পূর্ণ হয়।

সাইমন এমন কি শুভকামনা স্বয়ং বহন করে নিয়ে সেই কায়াহীন দম্পতিদের কাছে পৌছে দেওয়ার ভার নিল, কারণ, যা কিছু শুভকামনা অস্তিত্বহীন এই বর-কনের কোনো প্রয়োজন না লাগায় সাইমনকেই অর্শাবে। পরের মাসে এই ফোম রাবারের গদি ঘটিত ফন্দি বেশ সাফল্যজনক ভাবেই পূর্ণ হল।

এর পরের মাসে চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী টোবিয়াস লিংকের দশমতম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল—যেহেতু চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীর চিলড্রেনস্ এলাউয়েন্সের উপর দাবী দাওয়া নেই (সাইমনের মতে) তাই তার সাহায্য প্রয়োজন।

সংগ্রাহক সাইমনের এই আবেদনের প্রতিবাদ উঠল, কারণ এই চুক্তিবদ্ধ কর্মী টোবিয়াস একদফা চিলড্রেনস এলাউয়েন্স পেয়ে আবার চাইছে, একজন কর্মী ত' সাইমনের সামনে এইভাবে সন্তান জন্মের ফলে কি জাতীয় আর্থিক সুবিধা হচ্ছে এই টোবিয়াসের সেই কথা অতিশয় বিদ্বেষপূর্ণ ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন তখন সাইমন সবিনয়ে জানাল যে সন্তান জন্মেছে টোবিয়াসের। তার জন্য সাইমনের কোনো দায়ীত্ব নেই, তার নিজের সন্তানদের জন্য সে কিছু প্রার্থী নয়। তার প্রয়োজনেই সহৃদয় সহকর্মীদের শুভবুদ্ধির কাছেই আবেদন জানানো হয়েছে।

এই সাইমন কল্পিত চুক্তিবদ্ধ কর্মী টোবিয়াস লিংকের পরিকল্পনাটির সাফল্য হল একেবারে অভাবনীয়, সম্পূর্ণ বিস্ময়কর। এই সাফল্যের ফলে সাইমনের মনে হতে লাগল সেই যেন নবজাতকের জনক।

সবচেয়ে সার্থক সাফল্য হল সেক্রেটারি এলফ্রিডের উদ্ধার পরিকল্পনা—বলা বাহুল্য এই ব্যাপারটিও তার কল্পনা প্রসূত। এই এলফ্রিড রসমান এক আসমান্য সুন্দরী। ট্রামের তলায় পড়ে ছুটো পা-ই তার খতম হয়েছে। এইবারকার চাঁদা সংগৃহীত হওয়ার পর ন্যায়নিষ্ঠ সংগ্রাহক সাইমনের মনে একটা লজ্জার ভাব জেগে উঠ্‌ল। এই করুণার সমুদ্র মন্থন করে বার বার এইভাবে অর্থ-সংগ্রহের ফলে যে লাভ হয় সেই লাভটুকু উপভোগ করার মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ থাকে না।

সাইমনের মনে একটা নতুন চিন্তার উদ্ভব হল, মাসের মধ্যে বারো বা ততোধিক দিন সে এইভাবে অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু মনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি, একটা আত্মধিক্কার জেগে ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে এই ভাবে অর্থসংগ্রহ করাটা যেন একটা কাজের ভেতর দাঁড়িয়ে গেল। এই সব চিন্তা কিন্তু তার সার্টের বোতাম পর্যন্ত পৌঁছে আবার গলা দিয়ে ঢোক গিলে নামিয়ে দিত সাইমন—কারণ, শুধু এই চিন্তার বেশী আর কিছু নিয়ে মনকে ভারক্রান্ত করে তুলতে সাইমন রাজী নয়।

সাইমন একজন অফিস কর্মী নয়, একজন চুক্তিবদ্ধ কর্মীও নয়, তবু এই মাঝারি আকৃতির শীর্ণ দেহ মানুষটি মানসিক উৎকর্ষে একেবারে মুরগীর সমতুল—ক্রমশই সে সব বিভাগে এবং দপ্তরে একটা আইডিয়ার রূপ নিয়ে হাজির হল—তার মৃদু অনুনয়, অবশ্য অনেকের কাছে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে, কিন্তু সে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে মানবিক অদৃষ্টের এই শীতল, প্রাণহীন কামরাগুলিতে। সে কল্পিত বা প্রকৃত কিছু মানবিক ঘটনাকে আকৃতি দিয়েছে, রক্তে মাংসে গড়ে তাদের হাজির করেছে সকলের চোখের সামনে, কল্পিত জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, প্রতিদিনের নানা ধরনের ট্রাজেডি একটা সক্রিয় করুণা মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—সাহায্য করার প্রস্তাবনাতেই এই অবস্থা সৃষ্টি হয়। সাইমন যদিও অফিসের কেউ নয়, চুক্তিবদ্ধ কর্মীও নয়, সে একজন বারান্দার উষ্ণ-আমেজ উপভোগকারী অলস ব্যক্তি মাত্র, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উষ্ণতার প্রয়োজনও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে—তিনজন মন্ত্রী পরপর পার হতে সে দেখেছে, তাঁরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে ওকে জানতেন, বারান্দায় দেখা হলে মুখে

হাসি ফুটিয়ে অভিনন্দন জানাতেন। প্রায় হাসিই বলা যায়। এই অকিঞ্চিৎকর মানুষটিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—'গুডমর্নিং গুডমর্নিং !'

চতুর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের শাসনকালে উত্তর-শীতের এক নাতিশীতোষ্ণ অপরাহ্নে যখন সাইমনের ক্লান্ত মস্তিষ্ক নতুন একটা পরিকল্পনা নিয়ে একটা রেডিয়েটারের গায়ে হেলান দিয়ে চিন্তামগ্ন তখন হঠাৎ তার একটা 'স্ট্রোক' (আকস্মিক হৃদযন্ত্রের আক্রমণ) হলে সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেল। তার হাতে সেই ফাইল-কভার। একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যারা এই ভাবে অকালে সম্পূর্ণভাবে শ্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তাঁদের সেই বিদায়কে বলা হয় হার্ট-এ্যাটাক। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

আর কোথাও এই মুমূর্ষু মানুষটিকে শোয়ানোর স্থান না পাওয়ায় স্বয়ং ষ্টেট-সেক্রেটারির কাউচেই তাকে শুইয়ে দেওয়া হল, তিনি সেদিন অফিসে ছিলেন না, আর এরপর, যেহেতু সরকারি কাজকর্ম এই কারণে বন্ধ হতে পারে না, তাঁকে ন্যাশান্যাল বিল্ডিং অফিসের একটা ক্যাম্প বেডে রাখা হল। তৃতীয় দিনেও তার কি নাম বা কোথায় ধাম—তা কেউ বলতে পারল না। তখন তাব দেহ এক বিভাগ থেকে অপর বিভাগে পাঠানো হতে লাগল। চারদিনের দিন সে শেষ নিঃশ্বাস ফেললে। কিন্তু এইখানি কোন মন্ত্রণালয়ে যে সে কাজ করত বা কি কাজ করত তার কিছুই সাইমন মুখ খুলে বলে যেতে পারলনা এই অন্তিম মুহূর্তে।

সাইমন কোনোদিনই কেউকেটা ছিল না, কারো কাছেই তার কোনো মূল্য ছিল না। তার নাম বা অফিসের পদ মর্যাদা কিছুই কেউ জানতো না। সে শুধু সেই ব্যক্তি যে তার চাদা-সংগ্রহের তালিকাটি হাতে নিয়ে প্রতি নিয়তই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টের সম্ভাব্য পরিণাম। তার দেহ কবরস্থ হওয়ার জন্য যখন আবেদন পাঠানো হল তখন এলফ্রিড রসমানের নামে যে পরিমান অর্থ আদায় হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা সংগৃহীত হল। তাকে বেশ মর্যাদার সঙ্গে কবর দেওয়া হল। আর অন্য সকলের জন্য যে সব মালার উদ্দেশ্যে সে এতকাল অর্থ সংগ্রহ করেছে আজ যেন তার সব পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হল। কবরস্থ করার পরও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত রয়ে গেল—মৃত মানুষের দিক থেকে এই অর্থের উপযুক্ত সদ্ব্যয় সম্ভব নয়, যেমন নয় সমাধানহীন মানবিক সমস্যার।

আমার পদ্ধতির বিপক্ষে অভিযোগ বাড়ছে—

মার্টিন ভালসার

ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে যে সাহসের প্রয়োজন, সদর বারান্দার ঝক্‌ঝকে মেঝে অতিক্রম করে প্রশস্ত দিবালোকে নিজের পথ করে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে সাহস, জীবিকা অর্জনের দায়ে প্রয়োজন বলে আমার শিক্ষকরা পাঠ দিয়েছিলেন, সেই সাহস আমার ছিল না। আমি বন বিভাগের একজন চৌকিদার হলে খুসী হতাম, কিন্তু এই কাজ করতেও আমার মনে হয়েছিল যে ঐ ব্যাঙ্ক ডাকাতের দুঃসাহসের প্রয়োজন। কারণ বেশ ভালো করে ভেবে দেখলে, জীবিকা অর্জনের সব রকম পন্থায় ঐ সদর বারান্দার ঝক্‌ঝকে মেঝে অতিক্রম করে নিজের পথ করে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস থাকা চাই, হাতে গুলিভরা পিস্তল, বা ফাঁকা পিস্তল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ততক্ষণ যতক্ষণ না আপনি যা চান তা পাচ্ছেন—তারপরেও কে আবার মুখে হাসি টেনে রাখতে পারে তারপর পিছু হটে সহসা মিলিয়ে যেতে পারে।

শেষমেষ আমি একটা হল-রক্ষক খালাসী হওয়া স্থির করলাম। আমি একটা খেলনা তৈরীর কারখানায় হল-খালাসীর কাজ পেলাম। আমি অনুমান করতে পারি যে এই পদলাভ করে আমার সহকর্মীদের অনেকেই বেশ উদ্ধত হয়ে উঠেছে—ছুটির পর তারা মুখে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, চারপাশে একটা প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গী ছড়িয়ে রাখে।

আমি কিন্তু তা হইনি, অবশ্য আমি দৈনন্দিন কর্তব্যপালনের দায়ে একবারে নির্মম হয়ে কাজ করেছি। একেবারে গোড়া থেকেই আমার কাঁচের জানালার ভেতর থেকে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিলাম। আমাকে গোড়াতেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিভাবে কোন বোতাম টিপলে দরজাগুলি আপনাআপনি খুলে যায়, এই সব দরজার ভার আমার ওপর, আমিও তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলাম। একবার মাত্র পড়েই তৎক্ষণাৎ অভ্যন্তরীণ টেলিফোন তালিকা একেবারে আমার মুখস্থ হয়ে গেল। স্বীকার করতে হবে অবশ্য যে প্রথম দিকে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের কাছে একটু লজ্জাভাব হয়েছিল। যে সব প্রশ্নের

উত্তর দিতে পারিনি তার জন্য আমি লজ্জিত ছিলাম, এখন পর্যন্ত আমি ঠিকমত বলতে পারব না যে প্রশ্নকর্তা যে প্রশ্ন করেন আমি ঠিক তাঁর প্রত্যাশিত উত্তর দিতে পারি কিনা। এখন সব বেশ সহজ হয়ে এসেছে, সব দিক বিচার করে হল-খালাসী সহজেই অসার্থক প্রতিপন্ন হতে পারে।

একসঙ্গে অতিশয় উচ্চপদস্থ ধরনের ব্যক্তিরা ফ্যাক্টরীতে এলে, হল-খালাসী বুঝতে পারে না যে ওপরওয়ালা এঁর সঙ্গে আগে দেখা করবেন না ওঁর সঙ্গে। আর ফ্যাক্টরীর সবাই আপনাকে হল-খালাসীর চেয়ে উচ্চপদস্থ মনে করে। হল-খলাসীর কোনো সহকর্মী নেই, সবাই তার ওপরওয়ালা। তাকে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। আপনি হয়ত মনে করতে পারেন যে হল-পোর্টারকে টেলিফোন ধরতে হয়, অফিসে রিং করে সংবাদ দিতে হয়, জানতে হয় অমুক চন্দ্র তমুক কি গ্রহণীয় না নয়। কিন্তু অফিসের লোকজন আবার এমনই স্পর্শকাতর যে টেলিফোনে কোনো প্রশ্ন করে তাদের ভীষণরকম নার্ভাস করে দেওয়া যায়। তারপর তারা হল-খালাসীকে টেলিফোন-মাধ্যমে বেশ করে ঠোকে, ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণের এই এক পথ, নইলে যে তারা কান্নায় ভেঙে পড়বে। ও কিন্তু এসব করবে না, একটিমাত্র কারণে করবে না যে তার একেবারে সামনেই একেবারে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আগন্তুক, তাঁকে যে তৎক্ষণাৎ একটা কিছু জবাব দিতেই হবে।

এই যে জবাব, তার মধ্যে এইমাত্র দপ্তরের অধিক বেতনধারী ভদ্রলোক এইমাত্র হল-খালাসীর কর্ণে যে মধুবর্ষণ করেছেন তা সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখতে হবে—বরং হল-খালাসীর কাজ হল যে সেই নার্ভাস ভদ্রলোকের উত্তেজক উক্তিকে একটি বশংবদ হাস্যে রূপান্তরিত করতে হবে তা এমনই মোলায়েম যে আগন্তুক দরজার বাইরে চলে গিয়েও বুঝতে পারবেন না যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হল।

এ সব ছাড়া, অফিসের উত্তেজিত উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরকে চাপা রাখতে হবে—আমাকে অনেক সময় রিসিভারে ওপর হাত চাপ দিয়ে আমার ঝুলন্ত কোটের ধারে সরিয়ে ফেলতে হয়েছে, কারণ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আছে যে কোনোরকমই আগন্তুক হোক, তাকে যেন রূঢ় ব্যবহার না করা হয়। যদিও কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য, এ সেই হল-খালাসীকেই ঠিক ঠিক কার্যকারী করে তুলতে হবে। আমি সব সময়েই এসব বেশ আনন্দ সহকারেই

করেছি, কারণ এই কারখানার জন্য যে কোনোরকম হুকুমের চাইতেও এই হুকুমটাই আমার বেশী মনোমত ছিল।

আমি তাই যতটা কম পারতাম টেলিফোন ছুঁতাম, তার পরিবর্তে আমি নিজেই আগন্তুককে বেশ করে নিরীক্ষণ করতাম, তারপর বিচার করতাম যে চীফ বায়ার, বা হেডক্লার্ক, বা ডিসাইন ম্যানেজার, ক্যানটিন ম্যানেজার, ডাইরেক্টারদের কোনোজন, কিংবা পার্সোনেল ম্যানেজার প্রভৃতি যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যৌক্তিকতা আছে কিনা।

সম্ভবতঃ, প্রথমদিকটায় আমি অতিদ্রুত ভঙ্গীতেই অনেককে ভাগিয়েছি। কিন্তু ক্রমশঃই আমি অতি সুন্দরভাবে, কোনোরকম অজ্ঞতা না করে প্রশ্ন করতে পারতাম—এমন ধরনের বাক্য বিনিময় যা উত্তরপক্ষের কাছেই চিত্তাকর্ষক অথচ পরিপূর্ণভাবে তথ্যবহুল, এর মধ্যে এতটুকু গোয়েন্দাগিরি বা সাধারণ সংবাদ সংগ্রাহকের উৎকট আগ্রহ দেখানো হত না, পরিশেষে আমি এত বেশী সংবাদ সংগ্রহ করে নিতাম যদ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাঁর এই সাক্ষাৎকার কতটুকু উপযোগী সেই বিষয়ে আমি নিজেই একটা সিদ্ধান্ত করে নিতে পারতাম, কোনো আগন্তুককে অহেতুক না ফিরতে হয়। সজ্ঞানে কাউকে ফেরাতাম না। যাকে আমি ফেরাতাম—অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই করতাম—তাঁকে আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের যে ভদ্রলোকের সঙ্গে যে প্রয়োজনে তিনি দেখা করতে চান, তা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

আমাদের সকলপ্রকার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমি এমনই জ্ঞান অর্জন করেছিলাম যে কেউ যদি তার টিন-প্লেট সম্পর্কে চীফ বায়ার বা ক্রেতা অধিকারকের সঙ্গে দেখা করতে চাইত তাহলে আমি তাকে অবলীলাক্রমে বলে দিতে পারতাম তার প্রদত্ত রেট সম্পর্কে কোনো আশা আছে কিনা। যে সব প্রতিবাদী খুচরো বিক্রেতা সেলস্-ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাইত, কিংবা যে সব ছোট বেপারী আমাদের ক্যানটিনে মাল সরবরাহ করতে চাইত কিংবা যে সব রক্তহীন আমানতকারী তিনটি কি চারটি প্যাকেট নিয়ে ডিসাইন ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজারকে তৈলাক্ত করতে চেষ্টা করতো তাদের অপদার্থ মাল চালু করার জন্য, তাদের আমি ঠিক চিনে নিতাম। আমাদের পাব্লিসিটি ম্যানেজারের কাছে যে সব লেখক বা শিল্পীরা তাদের গায়ের ঝাল ঝাড়তে আসত তাঁর

প্রত্যাখ্যানজ্ঞাপক পত্রাবলীর জন্য তাদেরও আমি ঠিকমত বাধা দিতে পারতাম, অবশ্য আমানতকারী আর শিল্পীদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বিদায় করা ছোট-বেপারী বা ভ্রাম্যমানদের চেয়ে অনেক কঠিন ছিল, একথা স্বীকার করতে হবে।

সুতরাং প্রবেশ দ্বারে আমি কোম্পানীর সব অগ্রণী কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব করতাম, এছাড়া আরো সুষ্ঠুভাবে কথাটা বলা সম্ভব নয়। আর কোম্পানীর সদা বর্ধমান লাভের অঙ্কের জন্য আমার কৃতিত্ব কম নয়, কারণ আমি এই ফার্মের নেতৃস্থানীয় কর্তাদের বিরক্তির বাহিরের লোকদের হাত থেকে আগলে রাখি। অবশ্য, দুঃখের বিষয় এই সব ভদ্রমহোদয়গণ এই ব্যাপার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চলেন।

প্রথমতঃ তাঁরা বোঝেন না যে এই সব আগন্তুকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করার জন্য আমার কত সময় প্রয়োজন। তাদের ঠিক ঠিক বোঝাতে হবে, কোনোরকম অভব্যতা প্রকাশ না করে তাঁদের এই আগমনের অসার্থক দিকটা বুঝিয়ে দিতে হবে। অতিশয় দুর্ধর্ষ আগন্তুকের সঙ্গে অতিশয় ক্লান্তিকর কথোপকথন চালাতে হয় একটা জানালার ভেতর থেকে, এই সব সুরু হয় এই প্রতিষ্ঠান খোলা হওয়ার আধঘণ্টা আগে থেকেই, আগন্তুকদের দল কিউ বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকেন, প্রতি মিনিটেই তা বেড়ে যায়। এই ধরনের প্রতীক্ষা হয়ত কোনো সময় অভ্যবতা মনে হয়েছে যে তার ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়া সহজ হয়নি, কিংবা কোম্পানীর কোনো সিনিয়র পার্টনারের হয়ত তাড়াতাড়ি বেরোবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আধ সেকেণ্ড বেশী সময় লেগেছে এই জাতীয় প্রতীক্ষমান জনতার ভীড় ঠেলে যেতে। তাই আমার পদ্ধতি বিষয়ে অভিযোগ ক্রমশঃই বেড়ে উঠতে থাকে।

লোকে আমাকে বলতে থাকে আমি অতি শ্লথগতিতে কাজ করি। অতিশয় নোঙরা ভাবে কাজ করি, আমার কাজকর্মের পদ্ধতি তেমন বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই সব অভিযোগ এবং তিরস্কার এমনই স্থূলদৃষ্টির পরিচায়ক এবং আমার কাজ সম্পর্কে এতখানি অজ্ঞতার পরিচায়ক যে আমি আমার স্বপক্ষে প্রায় কিছুই বলতে পারতাম না।

আমার একবার দেখতে ইচ্ছা করে যে আমি যদি অতিথিদের প্রতি অভব্য এবং সংক্ষিপ্ত হই তা হলে কি হয়। তা হলে অবশ্য এই রিসেপশন হল সর্বদাই

শূন্য হয়ে থাকবে ; কিন্তু ম্যানেজারের অফিসের টেলিফোন অভিযোগে বোঝাই হয়ে সর্বদাই বাজবে, এই প্রতিষ্ঠানের নাম একেবারে নষ্ট হবে আর লাভের অঙ্ক নীচে নেমে যাবে।

কর্তৃপক্ষের হুকুম আছে যে কোনো অতিথিকে যেন অযথা অসন্তুষ্ট না করা হয়। সে হুকুম ত আর যুক্তিহীন নয়। স্বভাবতই আমি ত' আর ম্যানেজিং ডাইরেকটার মহাশয়ের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলতে পারি না যে যারা এই রকম অভিযোগ করছে তাদের একটু জিভটা সংযত করতে বলুন। একদিক থেকে তিনি স্পষ্ট বলবেন যে হুকুম তামিল কর। আর অন্য দিকে তা কোনো ভাবেই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বলবেন। কিন্তু আমি যদি তাদের তাড়া-তাড়িই ভাগাব তাহলে কি করে অতিথিদের ভদ্র ভাবে বুঝিয়ে দেব যে এই প্রতিষ্ঠানের কেউ এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না ?

অনেককেই আপনি মাত্র একটি কথা বলে শান্ত করতে পারেন যে তিনি লটারিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু কাউকে যদি উপযুক্ত ভঙ্গীতে বোঝাতে হয় যে তার মতলব কিংবা তাঁর বিজ্ঞাপনের কপি কিংবা টিন প্লেট, কিংবা শাক সবজি, এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কাছে অকিঞ্চিৎকর এবং সেই কথাটি এমন ভদ্রভাবে বলতে হবে যে তিনি এই প্রতিষ্ঠান থেকে যখন বেরিয়ে যাবেন তখন তার গুণগান করতে করতে যাবেন। আমার সমালোচকদের কেউ দু-মিনিটে এই কাজ করুক, আমি দেখি। কিন্তু আমি এখন করি কি ?

আমার জানলার বাইরে মানুষের ভীড় দিন দিন বেড়েই চলে এবং যেহেতু আমি বুঝি এ অবস্থা আমার কাছে কতখানি বিপজ্জনক আমি বেশ নার্ভাস এবং অনিশ্চিত অবস্থায় পৌছেছি। আমার কথাবার্তা ঠিক আগের মত সহজ গতিতে আর বেরিয়ে আসেনা। অতিথিদের মধ্যে দু-একজন আমাকে গাল দিয়ে দরজা খুলে রেগে প্রস্থান করেছেন। আমি আর কি করব ?

এসব আমার সাধ্যাতীত। সময় এসেছে আমার কাজের গতি এখন কোথায় এসে পৌছবে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য আমার স্বপক্ষে, আমার সমর্থনে কিছু বলা। কারণ আগামীকাল পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার হুকুম এসেছে। প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম এটা একটা হুঁসিয়ারি, একটা ওয়ার্ণিং মাত্র। কিন্তু এখন আর তা

মনে করি না। গতকাল আমার জানলার বাইরের কিউতে একজন খুব কড়া চেহারার ব্যক্তি ছিলেন, এই সরু ঠোঁটওলা ব্যক্তি আমাকে বললেন ম্যানেজিং ডাইরেকটারের কাছে তাঁর নাম ঘোষণা করতে। তিনি বললেন যে তাঁকে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

আমার আঙুল তখনই টেলিফোনের ডায়ালে, আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, কি কারণে তিনি ম্যানেজিং ডাইরেকটারের সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি বললেন, যে হল-পোর্টারের চাকরীর বিজ্ঞাপনের বশে তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

আমি পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট নাম্বারে ডায়াল করলাম এবং এই সর্বপ্রথম তাঁর নাম সোজাসুজি ঘোষণা করলাম, যদিও এই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে আঙুল দিয়ে ডায়াল করেছিলাম মনে হল সেই আঙুলটা খসে যাচ্ছে।

লোকটা অফিসে ঢুকে এল এবং আধঘণ্টা পরে বেশ হাসিমুখে বেরিয়ে এল। এমন কি শীষ দিতে আরম্ভ করল পর্যন্ত। আমি তাকে যেতে দেখলাম, প্রশংসাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমি ভাবলাম, ওর মত সাহস থাকাই দরকার। যাই হোক, সাহসটাই আসল ব্যাপার।

আমি এতদিন কিঞ্চিৎ লজ্জিত ভাবেই ছিলাম, নিছক হল-পোর্টার বলেই এই লজ্জা। এখন আমি বুঝি, একাজ করতেও দরকার ব্যাঙ্ক ডাকাতের দুর্জয় সাহস।

প্রকৃত পক্ষে, আমি এখনও সেই সাহসটুকুই সন্ধান করে ঘুরে মরছি।

একটি রজত খণ্ড

রোলফ সুখোরোয়ার্স

যদিও ওর সন্তান সংখ্যা মাত্র তিনটি, তবু হাসপাতালের কেসিয়াররা ত' আর মোটা মাইনা পায় না, আর কাউণ্টারের ওপর দিয়ে যে টাকাটা তার হাতে গুঁজে দেয় তা কেউ খুশী মনে দেয় না, যেমনটা সম্ভব হত সে যদি কোনো চক্‌চকে জিনিস বা সুস্বাদু মিষ্টান্ন বিক্রি করত, তাকে যারা টাকা দেয় তার সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে।

হাসপাতালের অফিসে সে যে রকম সক্রিয় এবং সজাগ তার ফলে কর্তৃপক্ষকে যে কি ভাবে টাকা বাঁচাতে হয় তা সে ভালো করেই জানে, জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন জানানো হয় রোগীদের ভালোভাবে দেখাশোনার দোহাই দিয়ে। কিন্তু তাঁরা কঠোর চেষ্টা করেও মূল্যবান ওষুধপত্র কেনার জন্য যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করতে পারেন না, এইসব মূল্যবান ওষুধ শুধু যে প্রয়োজনীয় তা নয় একেবারে অপরিহার্য। এর ওপর এই জাতীয় কেসিয়ারকে আর এক রকম হাঙ্গামার মুখে পড়তে হয়। তাকে ওষুধের গন্ধের মধ্যেই সবসময় কাটাতে হয়, চারপাশে সাদা ওভারঅল পরা মানুষ ঘিরে আছে, যাঁরা যন্ত্রণা সৃষ্টি করেন তা প্রশমন করার জন্য, আর বারান্দা দিয়ে এমনই মৃদু পায়ে চলা ফেরা করেন যেন পাছে মরা মানুষেরও ঘুম ভাঙে এই তাঁদের ভয়।

অফিস থেকে স্বামী যখন বাড়ি ফিরতেন তখন অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতে শিখেছিল ইনগে; অনেকে যেমন নিজেরই উচ্চহাস্যধ্বনি শুনতে ভালোবাসে তেমন নয়, বরং বেশ শান্তভাবে চোখের ভঙ্গীতে হাসি টেনে আনা মুখের হাসি নয়। আপনাকে সে সর্বদা সুস্থ রাখত, মাঝেমাঝে মুখে প্রসাধন প্রয়োগ করত এবং সারাদিন অবাধ্য সন্তানদের সামলেও সন্ধ্যার দিকে সবদিনই বেশ তাজা হয়ে থাকত। এর ওপর তার হাত থেকে মাইনের টাকা নিয়ে সেগুলি কি বাবদ খরচ হবে তার চিহ্নযুক্ত ছোট ছোট ব্যাগে রাখত তখন তার একটু লজ্জা করত।

সেই রবিবারে কেসিয়ার জোহান্নেস তাকে একখণ্ড পাঁচ মার্কের টাকা দিয়েছিল। সহসা পকেট থেকে টাকাটা বার করেছিল, শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠেছিল 'ধরো'. সে ঠিকই ধরতে পেরেছিল, তারপর ওর মুখের দিকে তাকায়। সে একটু ভয় পেয়েছিল, তারপর ওর ঠোঁটেও কেমন একটা আতংকের ভাব লক্ষ্য করেছিল। এর পর স্বামী হেসে উঠেছিলেন।

সে মৃদুগলায় বলে ওঠে—'মেলার জন্য এই টাকাটা। ছেলেমেয়েদের জন্য, সবাই মেলার টাকা পাবে।'

ইন্‌গে তেমনই মৃদুগলায় জবাব দিয়েছিল—'হাঁ।' জোহান্নেস তেমনই মৃদুকণ্ঠে বলে—'একটা জিনিস বিক্রি করে এই পাঁচ মার্ক পেয়েছিলাম।'

প্রকৃতপক্ষে এই টাকাটা ক্যাস রেজিস্টার থেকে তুলে নেওয়া—শনিবারের বারবেলা কোনো ভয়ই নেই—শুধু স্ত্রী যেন না জানতে পারে। সে অন্য ব্যাপারটিও যেন জানতে না পারে, সে যে রোগীদের জন্য প্রতি সোমবার রক্তদান করছে তা গোপন থাক। সব ঠিক হয়ে গেছে, একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত। রক্ত দিয়ে তার জন্য পাঁচ মার্ক পাবে। অবশ্য সোমবার পর্যন্ত এই পাঁচ মার্কের জন্য অপেক্ষা করা চলত। কিন্তু মেলা এই রবিবারই শেষ হবে আর ছেলেমেয়েদের জন্য মেলার টাকা চাই। এর জন্য সোমবার সে রক্ত দান করবে, মেলার ব্যাপারটা যদি না থাকত তাহলে নিশ্চয়ই সে এমন কাজ করার চিন্তাও করত না।

ইন্‌গে জানতে চায়নি সে কি বিক্রী করেছে। তার বুদ্ধি প্রখর আর টাকার জন্য সব সময়েই তার কিঞ্চিৎ উচু মনোভংগী হয়ে পড়ে। একটা উপেক্ষার ভাব তার সমস্ত মনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আচ্ছন্ন করে রাখে, যেন হঠাৎ তাদের সংসার খরচের জন্য একটা মোটা টাকা দেওয়া হয়েছে, তারা বেশ ধনী হয়ে উঠেছে, প্রচণ্ড ধনী।

সে সেখানেই চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার হাতে সেই রজত খণ্ড, মনে মনে কল্পনা করে প্রচণ্ড ধনী হলে কেমন লাগে।

তার স্বামী সোফায় দেহ মেলে দিয়ে পড়ে আছে, তার হাতে সংবাদপত্র। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় এমন অবস্থাতেই তাকে দেখে গেল। সে জানত স্বামী স্বয়ং বেশ গর্ব বোধ করছেন তাই এইভাবে সংবাদপত্রের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। জোহান্নেসকে সে গভীরভাবে ভালোবাসে। তার

অসহায়ত্ব, জীবনকে উপভোগ করার জন্য তার আধা-খেঁচড়া বাসনা, আর সবচেয়ে বেশী করে তার এই অসহায় ভঙ্গী সে ভালোবাসে।

জননী যেমন তাঁর সন্তানকে ভালোবাসেন প্রায় সেই ভঙ্গীতেই ও স্বামীকে ভালোবাসে, যেমন তার দামাল ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে, তারা ত কতরকম ভাবে ওকে জ্বালাতন করে তাদের উদ্দামতায়, যখন ছোট ছোট থলিতে ওর মাসমাহিনার টাকা নিয়ে ভর্তি করে তখনও ওকে এমনই ভালোবাসে। এইবার কিন্তু জোহান্নেস ওর সঙ্গে একটা চালাকী খেলেছে, অতিশয় ধূর্তের মত চালাকী, এখনও পর্যন্ত ইন্‌গে তা ধরতে পারেনি।

ছেলেরা যেমন যেমন চেয়েছে তেমনই ইচ্ছাপূরণ হয়েছে। ভিখারীদের হাতে কিছু কিছু দিতে হয়েছে। তারপর নাগরদোলায় ঘুরে পাক খেয়েছে, তারপর ঘোড়া আর দোলানি চেয়ারে দোল খেয়েছে, কফি-বরফি চুষেছে, রাইফেল স্ট্যাণ্ডে গিয়ে ওদের মাকে বন্দুক ছুঁড়তে হয়েছে। প্রত্যেকের জন্ত চওড়া ধারওলা খড়ের টুপি কেনা হয়েছে। ছোট্ট পার্কের মধ্যে ছেলেরা যখন এক নতুনত্বের পর আর এক নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণ করেছে, আর ইলেকৃট্রিক অর্গানে কর্কস আওয়াজ বেরিয়েছে, পাঞ্চ যখন জুডিকে ঘুঁসি মেরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, ইন্‌গে তখন হঠাৎ আবার বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, ঠিক যে সময়টি এই পাঁচ মার্কের রজতখণ্ড হাতে নিয়েছিল আর স্বামীর চোখে আতংকের ভাব লক্ষ্য করেছিল তখনও তার এমনই মনের ভাব হয়েছিল। সেই অর্থ এত দ্রুত যে খরচ হয়ে গেল এই তার চিন্তা, নাগরদোলা, বন্দুক ছোঁড়া, কফির বরফিতেই সব টাকাটা তচ্‌নচ্‌ করা হয়ে গেল।

একবার ভেবে দেখো, বাড়িতে ওরা মাখনের পরিবর্তে মাত্র মার্গারিন পায়, সবচেয়ে ছোট্টটার পায়ে কোনো জুতা নেই। কিন্তু যখন ঠোঁট দুটি বন্ধ করল তখন ইন্‌গে দুষ্টু চিন্তা বন্ধ করল, সে বুঝল এই অপচয় তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলেনি, যা তার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে তা অন্য বস্তু। একটা সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট বস্তু যা যে হৈ হট্টগোলের মধ্যে ছেলেমেয়েরা সময় কাটাচ্ছে আর যার মধ্যে হয়ত তার স্বামীও জীবন উপভোগ করছে তার মধ্যে ধরা পড়ে না।

কারণ ছেলেমেয়েরা বা স্বামীও বোঝেন না যে কি পরিমাণ অর্থ ওদের খরচ করতে হয়; সে একাই শুধু টাকার ব্যাপারটি জানে, শুধু তাই নয়, অন্ত

একটা কিছুও তারা ক্ষয় করছে, ওর নিজের একটা অংশ ওরা ধ্বংস করছে, হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে। এই নাগরদোলা আর ছোট্ট মিষ্টি খাবারের ভেতর দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে তাকে।

সে মাথা নাড়ল, তারপর কপালটা মুছলো। কিছুক্ষণের জন্য যে লোকটি নৌকা দোল দিচ্ছিল তার কাজ লক্ষ্য করল, লোকটার গায়ে কালো তেলধরা একটা আধা আচকান, তার মুখটা রোদে পোড়া, পেশীগুলি স্থূল; কিন্তু সে যে তার দিকে অঙ্গভঙ্গী করে একটা ইঙ্গিত করল তখন দেখতে পেয়ে সে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

যেটুকু টাকা তখনও হাতে ছিল তা ছেলেদের দিয়ে দিল ইন্‌গে। বয়স ও গুণ অনুসারে বেশ সতর্কতার সঙ্গে বণ্টন করে দেয় আর কিভাবে খরচ করবে তার উপদেশও দেয়। তখন যে লোকটা শুক্রবার মাছ দেয় সেই মেছো ওর সঙ্গে কথা বলল, তার গায়ে কেমন একটা আঁসটে গন্ধ লেগে আছে।

লোকটা উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে চওড়া দুটো হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বক্‌বক্ করে যায়, কাঁধটা ওঠায়, পায়ে ভর দিয়ে দেহটাকে মাঝে মাঝে সোজা করে নেয়। ইন্‌গে শুনতে পায় ও নিজেই হাসছে। বেশ জড়ানো রসালো গলায় ওর কথার জবাব দিচ্ছে। যেন একটা মই-এর ওপরে শির ডগায় ওঠার জন্য ক্রমেই ওপরে উঠছে। যখন এইভাবে লোকটার গায়ের আঁসটে গন্ধ শুঁকছে, হাসছে আর ওর কথার জবাব দিচ্ছে তখন ছেলে-মেয়েরা শূন্যহস্তে ফিরে এল, সব টাকা অপচয়িত। মার কাছ থেকে ওরা একটু দূরে রয়ে গেল, মাত্র একপা, ব্যস্তভাবে চারদিকে তাকায়, যেন মার জন্য কিছু এসে যায় না, আর শীর্ণ ক্ষুদে ক্ষুদে মুঠিগুলি পকেটের গভীরে ঢুকিয়ে দেয়।

মাছওয়ালা হেঁড়ে গলায় ওদের ডাক দিয়ে ছোট্টটাকে একটা মার্ক দেয় তারপর বলে—'যাও, এখন ভায়েদের সঙ্গে গিয়ে টাকাটা খরচ করে ফেলো।'

ইন্‌গে দেখলো টাকাটা কেমন উৎসাহভরে খুঁদে মুঠির ভেতর ডুবে গেল। সহসা তার মনে ঈর্ষা জাগে, সে ছেলেটার হাত থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নেয়। সে বলে—'আমি তোমার জন্য রেখে দিই, এই টাকাটা বাঁচিয়ে রাখা যাবে। আজ এর মধ্যেই তোমরা অনেক পয়সা নষ্ট করেছ।'

আবার সে অন্য আর এক রমণীর গলার স্বরের মত নিজের কণ্ঠস্বর শুনলো। মাছওলার সামনে এই কাণ্ড করার জন্য তার লজ্জা হল, যেন সে তার ঈর্ষাটুকু বুঝতে পারল। লজ্জিত হল ছোট বাচ্চাটির চুপসে যাওয়া মুখ দেখে, সেই মুখ হতাশায় ভেঙে পড়েছে। সে আপনাকে প্রশ্ন করে 'আমি কি ভয় পেয়েছি? কিসের জন্য আমার এই ভয়?'

অতি দ্রুত-তালে যেন কি একটা অন্যায় কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এই ভঙ্গীতে সে সেই মার্কটা ছেলের হাতে ফিরিয়ে দেয়। ছোট ছেলেটি টাকাটা হাতে নিয়ে দৌড়ায়, আর মাছওলা প্রসন্নচিত্তে হেসে ওঠে।

সহসা তার মনে হয় সে ঐ মাছওলাকে ঘৃণা করছে। যেখানে ছিল সেই-খানেই লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সে ছেলেটার পিছনে দৌড়ায়।

টাকাটা হারিয়ে গেল, তার জন্য দুঃখ নেই, আর নিস্পৃহ ভঙ্গীতে সে দেখতে থাকে জননী ওপরে নীচে, দলিত ঘাসে ঘাসে, কখনো নীচু হয়ে; কখনো আঙুলগুলো ছড়িয়ে, চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়ে খুঁজে চলেছে। সমস্তক্ষণ সেই আর্গানটায় সুর বাজ্‌ছে। একঘেয়ে একটানা সুর।

ওর মা যদি টাকাটার ওপর ওর অধিকার নিয়ে বিরোধ বাধাতো তাহলে সে নিশ্চয়ই কেঁদে উঠত। মাকে লক্ষ্য করে সে খুশীতে মেতে ওঠে।

ইন্‌গেকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হয়নি। সে জানত তার এই সন্ধান বৃথা। সে কিন্তু ক্লান্ত এবং শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সে ছেলেকে শাপান্ত করে বলে, 'তুমি যদি টাকাটা আমার কাছে রাখতে।'

বাড়ি ফেরার পথে সে সেই দলিত ঘাসের ওপর সেই হারানো মার্কটা খুঁজতে থাকে, যেন তার হারানো সুখ। তারপর সে সঙ্গীতের আওয়াজ আর ছেলেদের চীৎকার শুনতে পায়।

তারপর। আবার বাড়ীতে ফিরে এসেই সে স্বামীকে শাপান্ত করে। লোকটা দেউলিয়া, আর ছেলেরাও যদি এইভাবে মেলায় গিয়ে টাকা ওড়াতে শেখে তাহলে তারাও এমনই শিখবে।

জোহান্নেস তবু তাকে বলতে পারে না যে এই টাকাটা তাকে ফেরৎ দিতে হবে। সে শুধু আত্মসমর্থনে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিভাবে উপভোগ করতে হয় সেই কথা বলে। কিন্তু যখন ইন্‌গের রাগ কান্নায় পরিণত হল তখন সেই অবোধ্য চাপাকান্নার অর্থ না বুঝে সে তখনই নীরব হয়ে পড়ে।

মুক্ত অঞ্চল

হুবার্ট ফিক্‌টে

জানলার পাখির ভেতর থেকে মেয়েটি তার দিকে লক্ষ্য করে হাত আন্দোলিত করল। লোকটি চারতলার উদ্দেশ্যে হাত তোলে। মেয়েটি দেখল লোকটি বাসে উঠল, তারপর ব্রেকফাস্ট টেবলে ফিরে এসে কাপ, মার্গারিন, জ্যাম, কন্‌ডেনসড্‌ মিল্‌ক, শূন্য খোলা সহ ডিমের কাপ প্রভৃতি ট্রেতে তুলে নেয়। সে ভাবে, এই অঞ্চল আমার পরিচিত নয়। লোকটি তাকে দেখিয়ে দেবে বলেছিল তারপর এড়িয়ে গেছে। সে আবার মনে করিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ও একটা না একটা অজুহাত দেখায়—'এখন নয়...'। এখন ওর ভারী ঠাণ্ডা লাগবে। সে কথাটির অর্থ পর্যন্ত জানে না। সে একবার প্রসঙ্গতঃ যখন জানতে চেয়েছিল 'ফ্রী জোন' বা মুক্ত অঞ্চলটা কি ছেলেটি সে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছে।

এই জায়গাটাকে মুক্ত অঞ্চল বলে কেন? মেয়েটি ভাবে। এটা কি অন্য অঞ্চলগুলির চাইতেও স্বতন্ত্রতর। কাস্টমস অফিসার, নাবিকরা, ডকের লোকজন এখানে কি বেশ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে, অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে স্বাধীনভাবে! এখানকার সব কিছুর আইন কি বিভিন্ন? কিংবা এইখানে কোনো কিছুকে মুক্তি দেওয়া হয়, ছাড় দেওয়া হয়, অবাধ বিচরণের অধিকার—যেমন খোলা চিঠি?

কাউকে একথা জিজ্ঞাসা করতে তার মন সরে না। তার বন্ধুদের হাসতে এবং—'তুমি কি এসব জানোনা?' এই প্রশ্ন শুনতে তার ভয় করে। তারা বলবে—'তোমার স্বামীর এর অর্থ অনেক আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, উনি ত' অস্থায়ী কাস্টমস এসিস্ট্যান্ট। মনে হয় ও আপার গ্রেডটা পেয়ে যাবে। আমাদের যদি ভুল না হয় ও সোজা ইন্‌সপেক্টার হওয়ার তালে আছে। তাই, একজন কাস্টমস অফিসারের স্ত্রী হিসাবে 'মুক্ত অঞ্চল' কাকে বলে তা তোমার অনেক আগেই জানা উচিত।'

রবিবার ওর ছুটি থাকে, সেই দিনটায় ওর সঙ্গে এই মুক্ত অঞ্চলে ঘুরে

বেড়াতে সে চায় না। জুতে গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া বা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে ওর কাছে অনেক বেশী বিশ্রাম। হয়ত এর পরের ছুটিতে ওরা ইতালী যাবে।

কাজের সময়ের পর ও যদি আফিসের কাজের কথা বলতে না চায় তাহলে ওর সাফল্য বা হতাশার সংবাদগুলি নিজের মধ্যে রাখাই ভালো, বাধ্য হয়ে সেই বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়। পরীক্ষার পর—সে এর মধ্যে দু-তিনবার বলেছে-–'যাই হোক, অদূর ভবিষ্যতে পরীক্ষাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'—সে হয়ত আরো একটু বেশী কথা বলতে পারত।

মেয়েটি ভাবে, আমাদের সামনে এখন সারা জীবন পড়ে আছে।

এখন পর্যন্ত যেমনটি কেটেছে তেমনই যদি কাটে তাহলেই সে খুশী থাকবে। একথা সত্যি ও কোনো বাঁধা ধরা সময়ে কাজ করে না, আর যখন হঠাৎ সীমান্ত অঞ্চলে অতি ভোর থেকে একেবারে শেষের সিফ্‌টে ডিউটি বদল হয় তখন বাড়ি একেবারে ওলোট পালোট হয়ে যায়। তবে ওটা একটা সামান্য ব্যাপার। সে প্রায় চারশো মার্ক অপচয় করছে, ঠিক টাইমে ভাড়াটা দেওয়া যেত।

মেয়েটি ভাবে তার স্বামীর মধ্যে একটা বিশেষ বস্তু আছে। সে ঠিক আর পাঁচজনের মত নয়।

সে যখন চলে যায় তখন মেয়েটির বিরক্তি আসে না। যখন রুটিওয়ালাদের কাজের ভীড় বেশী তখন মাঝে মাঝে তাদের সাহায্য করে। নিজের কাচাকাচি নিজেই করে নেয়। কোনো রকম অনুযোগ না করেই কাস্টমস্ অফিসারের ভারী পোশাক সে নিজেই ইস্ত্রি করে নেয়। সে সব নিজের পছন্দ মাফিক্ জিনিস কিনে আনত, এবং বেশ মন দিয়ে রান্না করত। সীমানা থেকে কাজ করে স্বামী যখন ঘরে ফিরে আসতেন ততক্ষণে টেবলে খাবার সাজানো হয়ে গেছে।

কি ধরনের সীমানা এটি? মেয়েটি ভাবে আর ব্রেকফাস্ট টেবলের টুকরো-টাকরা একটা ক্রোমের বাঁটওলা ব্রাস দিয়ে ঝেড়ে একটি ক্রোমের ময়লা ফেলা প্যানে জড়ো করে।

উত্তর অঞ্চলে সীমান্ত আছে, সেখানে যুদ্ধের সময় সে সেনাবাহিনীতে ছিল।

'ও সে সব যা সময় গেছে। ভারী ফুর্তিতে কেটেছে।' একটি ছিন্ন খামের ভেতর থেকে ফটো বার করে দেখার সময় মাঝে মাঝে স্বামী বলে উঠত। লোকটার ঝোলা প্যান্ট একটা গান-সেন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

প্রতিবারেই সে প্রশ্ন করে—'তখন তোমার বয়স কত ?'

তর্জনী দিয়ে কয়েকটি হাস্যরত সৈনিকের দিকে দেখিয়ে স্বামী বলত—'ঐটে, ঐটে, ঐটে আর ঐটে পরে নিহত, রাশিয়ায় ওরা নিহত হয়েছিল।' তারপর বলত—'ঐ লোকটা আমার বিশেষ বন্ধু ছিল।' কিছুক্ষণের মত সেই ফটোগ্রাফের মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে থাকত।

মেয়েটি অনেকগুলি ছবির মধ্য থেকে একটা বিবর্ণ অস্পষ্ট ছবি তুলে নিয়ে বলে—'এটা কিসের ছবি ?'

'ঐ ছবিটা একটা বক্স ক্যামেরা দিয়ে তোলা হয় একেবারে আক্রমণের ভেতর। মনে পড়ছে না—ট্রেসার বুলেট, পাইন গাছ, কামানের ঝলক ?'

'না, আমি তখনও বেশ ছোট ছিলাম।'

'এখন ওখানটায় কি রকম দেখতে হয়েছে কে জানে ? দেখার ইচ্ছে হয়।'

মেয়েটি মনে মনে ভাবে দিনেমারদের সীমান্ত আজকাল আর প্রকৃত সীমানা নেই। এখনও আফ্রিকায় হয়ত সীমান্ত আছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সীমান্ত সে সীমানাকে খাঁটি সীমান্ত বলা যায়। আমাদের এই শহরের মাঝখানে এই মুক্ত অঞ্চলে – লোকে সীমানার কথা বলে।

সে ওকে প্রশ্ন করে—'আচ্ছা, ওখানে কি ভীষণ চোরা চালানি হয় ?'

'চোরা চালানি করার আগে তোমাকে নিষিদ্ধ বস্তু সংগ্রহ করতে হবে। তারপর তোমার সাহস দরকার। তারপর ধর কেউ যদি সাহস সঞ্চয় করে কয়েক টিন মাংস কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখে, কেউ না কেউ এসে সে যখন গেটে এসে পৌছাবে তার মধ্যে ইনস্পেকটারকে খবর পৌছে দেবে।'

'ইন্‌সপেকসন কি ?'

'একটা নির্বোধ প্রহসন !'

'তুমি কি এইভাবে সীমানায় থাকা পছন্দ করো না ?'

'আমি খুশী। আমাদের দুজনের প্রয়োজনের মত যথেষ্ট আমি রোজগার

করি—তুমি যা আনো খাই। হয়ত আপার গ্রেড পরীক্ষাটা দেব—হয়ত দেব না। আমি বেশ সুখেই আছি—তবে সবটাই বেশ সহজ নয়!'

'খুব কঠিন কাজ নয়?'

'না।'

'আমার জন্য তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না। আমি বেশ খুশীতে আছি।' সে বল্‌ল—'সব কিছুই ঠিক ঠিক আছে।'

'হাঁ—'

'তুমি কি সত্যি সত্যি তাই ভাবো?'

'নিশ্চয়ই কেন নয়?'

'তাহলে, তুমি মনে কর পরীক্ষার জন্য আর চেষ্টা করব না?'

কফির ধূলা যখন ধোয়ানিজলের ওপর ভাসতে থাকে তখন ও মনে মনে ভাবে—ওকে হয়ত একটু জোর করাই উচিত ছিল। ও যদি আবার এইসব কথা তোলে তাহলে আমি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওকে উৎসাহিত করবো। ও নিশ্চয়ই পাশ করবে, পাশ করতে বাধ্য।

সে মনে মনে ভাবে ওর জন্য একটি বাচ্চা হওয়া প্রয়োজন। রবিবার দিন যখন ওরা চিড়িয়াখানায় যায় সেখানে যে পাহাড়টার ওপর ছাগলরা থাকে সেখানে ওঠবার সময় ওর স্বামী যেমন নিঃশব্দে ভারী পায়ে ঘুরে বেড়ায় তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওকে তুলে নেয়, তেমনই বাপের মত তার ছোট্ট শিশু সেভাবে ঘুরে বেড়ালে বেশ লাগবে।

সাড়ে সাতটার সময় ডিয়েট্রিচ সীমানা থেকে ছুটি পেল। যে ব্রীজ পার হয়ে শহরে যাওয়া যায় ও সেদিকে গেল না। যে দিকে ডকের শ্রমিক আর নাবিকরা সস্তার সুরা পান করে, যেখানে সেমোলিনা মিশ্রিত লাইলাক-বেরী সুপ আর মাংসের টুক্‌রো বেকনের সহযোগে তৈরী হয় সেই পথ ধরল না। সে তার পরিবর্তে মুক্ত অঞ্চলের মাঝখানে চলে গেল।

হের স্থনফেলডার ডিয়েট্রিচকে বল্‌লেন, 'তেমন মন্দ নয়, আর এক রাউণ্ড হবে নাকি? কোনো কথা দেওয়া আছে? কিছু নিজের জন্য লাগাতে চাও?'

হের স্থনফেলডার হাসলেন।

ডিয়েট্রিচ বল্‌ল—'আমার একটা আইডিয়া আছে!' হের স্থনফেলডারকে

এড়াবার জন্য সে একটা অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করে। সে বলতে পারে না: 'আমি এই মুক্ত অঞ্চলে একা একা ঘুরে বেড়াতে চাই। অকারণে ঘুরে বেড়ানো এ ছাড়া আর কিছু নয়।'

ডিয়েট্রিচ ভাবে আমি একথা যদি বলি তাহলে কথাটা ভালো শোনাবে না।

সে বলল, 'আমি একটি বস্তুকে অনুসরণ করতে চাই। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। ব্যাপারটি কি তা এখন বলতে পারব না হের স্‌খনফেলডার।'

ডিয়েট্রিচের চোখের দিকে তাকিয়ে হের স্‌খনফেলডার বললেন, 'আমি বুঝেছি। কোনো নেশাখোরদের ব্যাপার?'

ডিয়েট্রিচ মাথা নাড়ে।

'গয়নাপত্র? সোনা?'

মাথা নেড়ে ডিয়েট্রিচ গুদামবাড়ির অন্ধকার চত্বর অতিক্রম করে যে রাস্তা ডকের দিকে গেছে সেই পথ ধরে। বোঝাই করার জন্য পীচঢালা চত্বরটা এখন সম্পূর্ণ শূন্য। সেডের মাঝখানকার জায়গাটিতে সার বাঁধা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে। পিপেগুলি দ্রুততালে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানুষ সমান উঁচু তারের বাণ্ডিল তার গায়ে সুইডিস ভাষায় ঠিকানা লেখা।

ডিয়েট্রিচ একহাত দিয়ে বোঝাই করার চত্বর কাটিয়ে গুদামবাড়ি আর জলের মাঝ দিয়ে, জাহাজের সাঁকো পার হয়ে একেবারে মালগাড়ির ওপরে এসে পড়ে। ওয়াগনগুলির দরজায় সীল করা। মাঝে মাঝে বিরাট ব্রাকেটে প্রলম্বিত নিওন আলো দেখে। তার ছায়া নিজেকেই ঘিরে ঘুরে মরে।

ডিয়েট্রিচ ভাবে রাতের এই সময়টায় এখানকার সবই মৃত। সব কিছুই হেলান দরজার পিছনে থাক দিকে রাখা—গন্ধ বেরোচ্ছে। কাঁচা মাল, আধা-তৈরী মাল, তামাক, পটাশ, সুলতানা। কাস্টমস্‌ ইনস্‌পেকটারের অফিসে এর দলিলপত্র বোঝাই হয়ে উঠেছে।

একেবারে দ্বীপটার মুখে না পৌছানো পর্যন্ত ও চলে গেল, সেখান থেকে শাখা প্রশাখা গিয়ে একেবারে মূল নদীতে পড়েছে। পুরানো গুদামঘর ভেঙে পড়েছে। নদীর পার থেকে যে বৈদ্যুতিক আলো এসে পড়েছে তার জন্য প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষকে বেগুনী দেখাচ্ছে।

ডিয়েট্রিচ ভাবছে কেমন সুন্দর মনে হচ্ছে, সীমানার শূন্য প্রহরগুলির পর এই বিধ্বস্ত দেওয়াল বেয়ে এই শান্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলা কত ভালো লাগছে, এই বাতাসে ভেঙে পড়া গুদাম ঘরের দেওয়ালের ধূলার গন্ধ আর উন্মুক্ত গর্ভগৃহের উৎকট গন্ধ।

সীমানায় আটঘণ্টা ডিউটির কথা ডিয়েট্রিচ ভাবে। গাড়িগুলি একেবারে মুক্ত অঞ্চলের ওপরে চলে এসেছে এখান থেকে আমার সীমানা অতিক্রম করে চলে যাবে। অন্য পথে যাবে। মোটর রাস্তার ঘুরপথ এড়িয়ে চলেছে। ওদের চেক্ করে কোনো লাভ নেই। কী হবে পরীক্ষা করে? ওদের কিছুই ঘোষণা করার নেই। আমাকে শুধু আইনমাফিক দেখে যেতে হবে, ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জারের চোখের দিকে দেখতে হবে তার কয়েক সেকেণ্ড থেমে—যা আমি আর এখন বিশ্বাসই করি না—ড্রাইভাররা যতটুকু করে তার বেশী নয়—তার পর চলে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করি।

নিচের পণ্টুনের দিকে ডিয়েট্রিচ এগিয়ে যায়। সে যেই জলের কাছে পৌঁছেচে একটি লোক ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলে ওঠে—'আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।'

ডিয়েট্রিচ বলল—'তোমার পিছনে আমার কিছু কাজ নেই, তুমি ভয় পেলে কেন?'

'হঠাৎ এইভাবে পণ্টুনে আপনি যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন!'

'তুমি কি এইখানে বে-আইনী কিছু করছিলে?'

'না, মানে আমি··· !'

'এত রাত্তিরে তুমি এই মুক্ত অঞ্চলে কি করছিলে?'

প্রকৃতপক্ষে এই মুক্ত অঞ্চলে লোকটা যা কিছুই করুক না কেন এই রাত্তিরে তাতে ডিয়েট্রিচের কিছুই করার নেই—কিন্তু ও সব সময়েই মুক্ত অঞ্চলে বাইসিকেল ভ্রমণকারীদের দাঁড় করায়, তারা যদি জোরে গতিবেগ বাড়িয়ে কাস্টমস হাট পার হয়ে চলে যায় তাহলে চীৎকার করে ওঠে, চেক করানোর জন্য তাদের ফিরে আসতে হয়।

লোকটা বলে ওঠে—'এখনও ত' সাড়ে সাতটা বাজেনি। যাই হোক, আপনিই বা এখানে কি করছেন?'

'আমি কাস্টমস এসিস্ট্যাণ্ট।'

'সত্যি !'

'হাঁ—আমি অস্থায়ী কাস্টমস এসিস্ট্যাণ্ট।'

'ও তাই···অস্থায়ী।'

'ওটা একটা মামুলী নিয়ম, কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি এখনো।'

'নদীর ধারে প্রস্রাব করতে নিশ্চয়ই কাস্টমসের অনুমতি লাগে না।'

ডিয়েট্রিচ এই ভাষার প্রতিবাদ করে না। সে বলে না যে লোকটার এই ভয় পাওয়ার জন্য সন্দেহ জাগে মনে। সে ওকে এখনই সার্চ করতে পারে—ওর দেহ তল্লাসী করতে পারে।

সে ভাবে ওদের নিয়ে আমার কখনো কিছু হয়নি। সে সৌভাগ্য হয়নি। আমার সমস্ত সোজাসুজি তল্লাসী বৃথা হয়েছে। কখনো সখনো কিছু সিগারেট বা বাঘের চামড়া বা কুমীরের চামড়ার ব্যাগ পাওয়া যায়। জিনিসটার যা মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী মেহনত করতে হয়। হের স্খনফেলডার বলেন এই অঞ্চলটায় মাদকদ্রব্যের গুপ্ত চালান কমে এসেছে। ওতে আর এখন আমাদের লোকদের মন ভরে না। যুদ্ধের পর ওরা ওর চেয়ে অনেক পাকাপোক্ত হিসাবে এসেছে। মাদকদ্রব্য কেন চোরা চালানি করতে যাবে ?

ডিয়েট্রিচ বলে—'কিছুই বলা বলা যায় না তুমি হয়ত এইখানে এই পণ্টুনে অশালীন কিছু করতে যাচ্ছিলে কিংবা রাতের দিকে জলে আত্মহত্যার মতলব করছিলে।'

'কখনই নয়।'

ডিয়েট্রিচের মনে হল তার সারা দেহে ক্ষুধার জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে। মনে ভাবে আন্‌কে হয়ত আলুর খোসা ছাড়িয়ে একটা সাদা ডিসের ওপর অন্য পাঁচরকম সব্‌জির সঙ্গে মিশিয়ে স্টোভে স্টু বানাচ্ছে। তার পায়ের তলায় পণ্টুনটা উঠছে আর নামছে জলের তালে তালে। সামনে তাকিয়ে দেখে নদীর তীর পথে নিওন টিউবের আলো জলজল করে জলছে। সে নৌকার প্রান্তরেখা দেখার চেষ্টা করল, অর্ধ-সমাপ্ত মাল জাহাজ, একটা মাল ও প্যাসেঞ্জার জাহাজ, তার প্রকাণ্ড খোল, সমস্ত মাল সে গিলে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে সংগ্রহ করে এনে এই মুক্ত অঞ্চলে এসে উগ্‌রে দেয়। পণ্টুনের

দোলানির সঙ্গে ডিয়েট্রিচ তাল রাখতে পারে না, সে টল্‌তে শুরু করে। লোকটার সঙ্গে আর কথা না বলে সে কাঠের সিঁড়িতে উঠে পড়ে। এখনও যেন জলের ঢেউ সে অনুভব করছে, অথচ এখন সে বাঁধা রাস্তা ধরে গুদামবাড়ির সামনে দিয়ে দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছে।

সে মনে মনে ভাবে পরীক্ষায় বসবে কিনা, আন্‌কে তাকে তেমন চাপ দিচ্ছে না। তার প্রত্যাশা হয়ত কমে যাবে—কয়েক বছর চাকরীর পর তার কিছু বেতনবৃদ্ধি হবে।

একটা টিক্ কাঠের দেয়াল আলমারির ওপর ভারী ঝোঁক আন্‌কের। প্রকৃতপক্ষে যে কোনোরকম ডানিস আসবাব বা আলোর ওপরও তার বিশেষ ঝোঁক।

সে মনে মনে ভাবে বিমানধ্বংসী এ-এ ব্যাটারি থেকে ডেনমার্ক তেমন দূর ছিল না।

বাড়ির জন্য আন্‌কে মজবুত আসবাবপত্র পছন্দ করে যা এই রকম মুক্ত অঞ্চলের ভেতর এসে পড়ে।

আপার-গ্রেড পরীক্ষার জন্য সে ওকে তেমন চাপ দেয়নি। তাহলে অচিরে ও উচ্চতর বেতনওলার শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়বে। সত্যি একজন পরীক্ষার্থীর কাছে ওরা যে কি জানতে চায় তা ও জানে না। সহকর্মীদের কাছে কোন কথা বলতে সে ইতঃস্তত: করে পাছে ওরা মনে করে যে সে আর আড়ম্বর না করে পরীক্ষায় বসে পড়বে। ওরা যখনই পরীক্ষায় কথা বলাবলি করত তখন কিছু না জানতে চাইলে তার ভেতর থেকে স্পষ্ট কিছু জানা যেত না।

ওরা সব সময়েই পরীক্ষার্থীদের কথা বলার বাধা এবং অন্য সব বাধার কথা তোলে। যাই হোক ও ধরে নিয়েছে যে ব্যাপারটা একটা সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা। সে আপনাকে নির্বোধ মনে করে না—তবে কাস্টমস অফিসের মাঝখানে যেমন সবাই কোনো আমদানীকৃত মালের খাঁটি ওজন ও তার কমবেশ বিচার করে, ওর ও তেমনই বিচার হবে এই চিন্তা ওর ভালো লাগে না।

কাস্টম্‌স আইনে ওকে পারদর্শী হতে হবে, আর সকল প্রকার দ্রব্য-বিশেষের উৎকর্ষতা, উৎপাদক দেশের নাম, বিক্রয় যোগ্যতা, আয়ু, রঙ এবং

ঠিক ঠিক ওজন ওকে জানতে হবে। ওর সামনে সেই দ্রব্য পাহাড় করে জমা করা হবে, ঠিক যেন শিখর শোভিত পর্বত, তার ওপর থাকবে ক্রোম বা লোহার জাল্‌তি, যে ঢালাই করা লোহার ট্রলী।

সেই সব স্তূপ ওকে বিশ্লেষণ করতে হবে, প্রতিটি দ্রব্য আলাদা করে ওজন করতে হবে। ফ্যাকটরির মাপকাঠি থেকে কোনোরকম বিচ্যুতি আছে কিনা দেখতে হবে আড়তদারের কাছ থেকে ক্ষুদে খুচরো বিক্রেতাদের কাছে পাচার হবার অ'গেই, তাদের কাছ থেকে যাবে খরিদ্দারের কাছে—আন্‌কের মত খরিদ্দার—ওদের বাড়িতে মাল যাবে।

সে তার কপালটা মুছে নেয়।

আমি নানারকম বিষয় কল্পনা করছি। আমার খালি পেট বলেই এরকম হচ্ছে, সে ভাবে। গ্যাস ওয়ার্কস কোকিং প্লাণ্ট ঘিরে লোহার গরাদের ওপর ও মাথা রাখল। পাইপ এবং চৌবাচ্চার ভেতর স্টীম ঘূর্ণ্যমান: মেঘলা আকাশের গায়ে আগুন গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, এই লাল আভার সঙ্গে দ্রব্যাদির স্তূপগুলিকে কাগজের ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছে, যেন তারা অগ্নিশিখার মধ্যেই ঘোরা ফেরা করছে।

বেরিয়ে যাওয়ার পথে যে চিহ্ন আঁকা আছে ডিয়েট্রিচ তা ঠিকমত বুঝতে পারে না সে মার্শালিং ইয়ার্ডের দিকে এগিয়ে যায়। গত বছরের ঘাস পথের ধারে দুল্‌ছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত গুদামঘরের গর্ভগৃহের পাশে ঘাসগুলি জন্মেছে। এইখান থেকেই সেই পচা গন্ধটা পাওয়া যায়। সে ভাবল কোক কয়লার নির্যাস থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসছে এই গন্ধ হয়ত তার। পরীক্ষার জন্য আমাকে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন বিদ্যা সবই শিখতে হবে। স্কুলে যদি এসব শেখা না হয়ে থাকে তাহলে এত শক্ত এত সহজে মাথায় প্রবেশ করানো সহজ ব্যাপার নয়। সে পিছন ফিরে অন্যদিকের কোক প্লাণ্টের দিকে তাকায়। ঘন ধোঁয়ার মধ্যে কালো কালো বৃত্ত এদিক ওদিক ঘুরছে! মই এবং খোলার ওপর থেকে অগ্নিশিখা লাফিয়ে উঠছে। এই বিরাট চুল্লী ডিয়েট্রিচের চোখে প্রতিফলিত। সে ভাবে যুদ্ধের সময় যখন গুদামঘরগুলি আগুনের ঝলকে এমনই উজ্জ্বল হয়ে ধসে পড়েছে, বিরাট কপিকলগুলি লাল থেকে লালতর হয়ে শেষ পর্যন্ত জলের প্রান্তে নুইয়ে পড়েছে তখন হয়ত এমনই দেখতে হয়েছে। আগুন যখন এই মুক্ত অঞ্চলে

নানাবিধ মালপত্র পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। ও তখন উত্তরাঞ্চলে এ্যান্টি এয়ারক্রাফট বাহিনীতে। সেই অঞ্চল দিনেমার সীমান্ত থেকে তেমন দূর নয়—তখন এইসব ঘাসও এমন অবাধ গতিতে বেড়ে উঠতে পারেনি।

এরপর কোকিং প্লান্টের অগ্নিশিখাকে নিভিয়ে দেওয়া হল।

এত দেরী করে বাড়ি ফেরার জন্য আন্‌কে ওকে বকুনি দেয়নি। সে শুধু বলল—'বাড়তি কাজ ছিল বুঝি?'

সে ওকে মিথ্যেকথা বলতে চায় না। কোনো রকম কৈফিয়ৎ দিতে চায় না। শুধু বলল—'না।'

আন্‌কে আর কোনো প্রশ্ন করে না। সে ভাবে এই দেরী করে ফেরার কারণ পরীক্ষা। সে তাড়াতাড়ি আলু নিয়ে আসে, দুবার করে গরম করার জন্য আলুর খোসা শুকিয়ে কুঁচ্‌কে গেছে। আন্‌কে রোস্ট করা মাংস পাতে দেয়।

'সস্‌টা শুখিয়ে এসেছে। আশাকরি তেমন বেশী নোনতা হবে না।' সে তার হাতে তোয়ালেটির ধার ধরিয়ে দেয়। ডিয়েট্রিচ অতি ধীরে ধীরে খায়, কষ্ট করে প্রতিটি আলু তুলে নেয়, বারবার কাঁটাটি নামিয়ে রাখে, মুখে কিছু খাবার পুরেই নামিয়ে রাখে, তার চোখ পড়ে আছে প্লেটের ওপর।

'খেতে কি তেমন স্বাদ হয়নি?'

'হাঁ।'

সে ক্লান্ত ভাবে চিবিয়ে যায় তারপর ওর দিকে মাথা নেড়ে আবার বলে—'হাঁ।'

আন্‌কে যখন খাবার প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে সে তখন ওর দিকে তাকায়, সে ওর চোয়ালের দিকে তাকায়, তারপর পাউডারের ভগ্নাংশ হিসাবে যে সামান্য পীচফলের রঙ মুখে লেগে আছে তা লক্ষ্য করে, সে ওর চুলের দিকে তাকায়, সুন্দর করে গুটিয়ে জড়ো করা। সে ওর চোখের দিকে তাকায়, সুন্দর ভাবে চোখের পেনসিল দিয়ে ভ্রূ আঁকা। সে ওর বেদাগ শুভ্র রঙ দেখে—আন্‌কে তার ব্লাউজ প্রতিদিন পরিবর্তন করে। সে ভাবে আন্‌কে কত ব্লাউজই না সংগ্রহ করেছে, আর প্রতি শুক্রবার তা অতি দ্রুত কেচে নেয়, সেগুলি তেমন নোংরা বা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠে না, ওর গায়ের সাবানের

গন্ধ তখনও তাতে লেগে থাকে। সে কল্পনা করে রাতের বেলায় যখন আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় তখন সে তার স্বচ্ছ নাইট ড্রেস পরিহিত অবস্থায় কেমন তার দিকে এগিয়ে আসে। সে পরিচ্ছন্ন থালা বাসন ছুরি কাঁটার দিকে তাকায়। ডিসগুলি খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ। টেবলক্লথগুলির ইস্ত্রির দাগ ছুরি কাঁটার ভেতর থেকে দেখা যায়, সব ঠিকঠাক যেমনটি হওয়া উচিত, সে মনে মনে বলে, সবকিছুই চমৎকার হবে ও যদি পরীক্ষায় বসবার জন্য নাম দেয়। একটু বেশী মাইনে হলে ওরা আরো একটু ভদ্র রকমের টেবল, উৎকৃষ্ট চীনামাটির পাত্র উত্তম খাদ্য এবং একটা টিকের দেওয়াল আলমারি পেতে পারে।

ছেলেপুলে—সে সম্বন্ধে পরীক্ষায় পাশ করার পর চিন্তা করা যাবে। আন্‌কে কি করে রুটির দোকানের কাজ আবার সন্তান পালন দুটি কাজ একত্রে করবে? সে যদি আপার গ্রেডে পৌছায় তাহলে মুক্ত অঞ্চলের মালপত্র চেক করার জন্য ও একটা উৎকৃষ্ট স্থান পাবে। কাস্টমস ইন্‌সপেক্টার হিসাবে সে একটা মানুষ হয়ে উঠবে এবং নিজের সময়ের ঠিকমত সদ্ব্যবহার করবে —কাস্টমস এসিস্ট্যানটের মত শূন্য মোটর গাড়ি আর নির্দোষ পথচারীর পিছনে ঘুরে মরবে না। কাস্টমস ইন্‌সপেক্টর হিসাবে সে আন্‌কেকে তার অফিস দেখাতে পারবে, তার ফাইলপত্র দেখাতে পারবে, জানলার নীচে নদীপ্রান্তের পথ দেখিয়ে বলতে পারবে—'ঐ যে ঐখানে আমি কাজ করি।'

সে নিজেকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে দেখে—বিদেশী বিরাট চীনামাটির পাত্রের সামনে যেন গুদামঘরের ক্ষুদ্র ইঁদুর। সে কল্পনা করে যেন সরকারিভাবে তাকে অপরের মালপত্র তল্লাসী করে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর বাড়িতে ঘরের ভেতর সে ছেলেদের কাপড়-চোপড়, পুলওভার, ওষুধপত্র, বোতল, মোজা, রবারের বল একটার ওপর আর একটা জড়ো করা আছে দেখতে পায়। সে ভাবে, 'আমার আর আন্‌কের জন্য কি থাকবে?'

সে খাওয়া বন্ধ করল। আন্‌কে অর্ধ-শূন্য প্লেট আর ডিসগুলি উঠিয়ে নিয়ে যায়।

সে ভাবে ওকে একটু খুশী করা প্রয়োজন। ও বেশ সহজেই পাশ করে যাবে।

সে বলল—'ডিয়েট্রিচ, তুমি বেশ সহজেই পাশ করে যাবে। তুমি অন্যদের মত নয়। তোমার অনেক বুদ্ধি, আর কি ভাবে ঠিক বলব—তুমি একটু

বিশেষ ধরনের, আমি এ কথা আমার খাতিরে বলছি না। আমাদের জীবন এমনিতেই বেশ ভালভাবেই কাটছে। আমি এর চেয়ে ভালো কিছু চাই বলে তোমাকে এসব কথা বলছি না। আমি উত্তম স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানের উত্তম জননী হব এমনকি রুটির দোকানে কাজ করেও। কিন্তু তুমি, তোমার এত বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে সামান্য মাঝারি গ্রেডে জড়িয়ে থেকে সন্তুষ্ট হতে পারো না।

তুমি যখন কাস্টমসে ঢুকেছিলে তখন আর কোথাও যেতে পারো নি বলে ত যাও নি। তুমি তোমার দাদামশাই-এর কথা মেনে নিয়েছিলে। আর তিনি মাত্র প্রাইমারী স্কুলে পড়ে ইন্‌সপেক্টার পর্যন্ত হয়েছিলেন। পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে এ ত একটা সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা। তাছাড়া দু-বছর আগে ত তুমি অতি সহজেই কাস্টমস এসিস্ট্যানটের পরীক্ষা পাশ করেছিলে। আমি এসব কথা আমার খাতিরে বলছি না, আমার দিক থেকে দেখতে গেলে একজন সিনিয়র অফিসারের চেয়ে একজন সাধারণ অফিসার সমান ভদ্র এবং চমৎকার। গোড়ার দিকে যখন তুমি কাস্টমসের কাজ সুরু করেছিলে তখন আমি শুধু মনে করেছিলাম যুদ্ধের পর তুমি নিরাপত্তার সন্ধান করছিলে। এ্যান্টি এয়ারক্রাফটের সব অভিজ্ঞতার কথা তুমি চিন্তা করতে চেয়েছিলে। আমি এসব কথা কিন্তু সংসার চালানোর খরচের টাকার জন্য বলছি না—এ আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি।

সে শুধু ভাবে কিভাবে কিছুই থাকবে না একমাত্র অস্তিত্বের চিহ্ন ছাড়া। জুতে বেড়াতে যাওয়া কমে যাবে আর নদীর ধারে ভ্রমণ বন্ধ হয়ে যাবে।

ছেলেপুলে? আমাদের কি ছেলেপুলে হবে? সে বলল—'আমরা যখন এ্যান্টি এয়ারক্রাফটে ছিলাম তখন সবকিছুই ছিল বিভিন্ন। সেখানে পরিবার পালনের কথা বা নিজেদের উন্নয়ন সাধন করার চিন্তা ছিল না। আমরা চার থেকে ছজন করে আস্তানায় শুয়ে থাকতাম। আর দিনের বেলায় চাষীদের বাগানে ঢুকে পড়ে আপেল ছিঁড়ে খেতাম। কোন্ কোন্ শহরে বোমা পড়ল আমরা রেডিও মারফৎ শুনতাম, শুনতাম কতজন নিহত হল। সে এক চমৎকার কাল ছিল। কেন তা জানি না, তবে সেই কালটা বেশ কেটেছে।'

সে মনে মনে ভাবে যেন আমি এবং আমি যা সব করি সবই অতিরিক্ত, ফাল্‌তু। বিয়ের সময় বাঁশী বাজালে স্কুলবালকদের মত আমরা যেন মোহাচ্ছন্ন ছিলাম।

সে বলে—'তোমার এ্যান্টি এয়ারক্রাফট ব্যাটারির ছবিগুলি নিয়ে এসে আর একবার আমাকে দেখাও।'

সে ভাবছে। যদি আমি ফেল করি! এ্যান্টি এয়ারক্রাফটে আমি আর সকলের মতই গ্রেনেড সয়েছি। ধরো আমি যদি ইতিমধ্যে নরম হয়ে পড়তাম। তাহলে আমার স্ত্রী এবং বন্ধুরা আমাকে অশ্রদ্ধা করত।

'ডিয়েট্রিচ, তোমাকে আমার জন্য পরীক্ষা দিতে হবে না, যে অবস্থাই হোক্ আমরা যাহয় করে ঠিক চালিয়ে দেব।'

সে ভাবল, ও যা বলছে তা হয়ত ঠিক বলতে চায় না। সে ছেলেপুলে চায়। তাদের নিয়ে ঢাকা দেওয়া পেরামবুলেটারে ঘুরে বেড়াতে চায়। আমি পরীক্ষা দিতে ভয় পাই না।

'এ্যান্টি এয়ারক্রাফটের সেই সুসময়ের ছবিগুলো নিয়ে এসো।'

'এখনই আস্‌ছি। মেশিন থেকে কয়েকটা সিগারেট কিনে আনি।'

'এই ত' এখনও কয়েকটা রয়েছে তোমার জন্য।'

'ওগুলি ত' ফিলটার টিপ নয়। তুমি ত' ফিলটার টিপ পছন্দ করো, কেমন নয়?'

'কোটটা গায়ে দেবে না?'

'না, না, বৃষ্টি পড়ছে না, এখনও তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি।'

সে অপেক্ষা করে থাকে।

মোটর গাড়ির হেড লাইটের আলোয় গাছের পাতাগুলি ছায়ামূর্তিতে পরিণত, ঘরের পিছনের দেওয়ালে, সাইডবোর্ড আর ব্যারোমিটারে। সহসা তার মনে ভয় জাগে, হয়ত ভবিষ্যতে ওর জন্য মাঝে মাঝে অপেক্ষা করতে হবে। একদিন হয়ত ও অবিশ্বাসের কাজ করবে। হয়ত ওর কাজটা ওর পক্ষে একটু বেশী হয়ে পড়বে। দেওয়ালে আর একটি ছায়া পড়তেই ওর ভয় কেটে গেল। সে কেক এবং কাপগুলি যথাস্থানে সাজিয়ে রাখে, ও ফিরে এলেই সে কফি বানাবার জন্য তৈরী হয়ে থাকে।

কিছু একটা হয়েছে বোধহয়। সিগারেটের মেশিনে পৌঁছাতে মাত্র

পাঁচ মিনিট সময় লাগে। এক ঘণ্টা হল ও চলে গেছে। কিংবা একা একা যখন অপেক্ষায় থাকা যায় তখন কি সময় এমনই ছলনা করে? হয়ত কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

সে নীচমনা স্ত্রীর ভূমিকা নিতে চায় না, তারা তাদের স্বামীদের লোকাল গাড়ী পর্যন্ত অনুসরণ করে সীট থেকে টেনে নিয়ে আসে, কিংবা আধ-পাঁট বোতল থেকে।

সে মনে মনে ভাবে, এই প্রথমবার।

সহসা একটা কাষ্ঠখণ্ডের মত ওর মনে জমাট ভয় বাসা বাঁধে।

এখন থেকে কি প্রায় এমন ঘটবে?

আমি কি আমার জীবন কফি কাপ, ডিস সসার এবং কাপড়ের হ্যাঙ্গার নিয়ে দিন কাটাবো? আমার যদি একটি সন্তান ও দিত।

সে জানালাটা খুলল, মুখ বাড়িয়ে দেখে দূরে ওকে আসতে দেখা যায় কিনা।

আমার যদি একটি ছেলে থাকৃত, ওর জন্য যখন অপেক্ষা করতাম তখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

জানলার ধার থেকে সে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে বারান্দায় চলে যায়,দেখতে যায় স্বামী ফিরে এসে আলনায় কোটটি খুলে রাখছে কিনা।

না, না, ও ত কোট নিয়ে যায়নি। যে কোন মুহূর্তে যে ও ফিরে আসবে এই তার নিশ্চিত নিদর্শন। আমার ছেলেপুলে না হলেও আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না।

সে আপনাকে প্রবোধ দেয়—"তুমি একটি উন্মাদ।" বড়জোর আধঘণ্টার ভেতরই সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে। আগের মত হবে। আচ্ছা, যদি পরীক্ষার ভয়ে আত্মহত্যা করে থাকে? না না, ও সেরকম মানুষ নয়, আত্মহত্যার মত মন নয় ওর।

আবার নীচের রাস্তার দিকে তাকানোর বাসনা হয়। কিন্তু জানলার অন্ধকার চৌখুপী দেখে সে আতংকিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু কেন এমন করে গোড়া থেকেই খারাপটা ভাবছ?

রাতের চতুষ্কোণ অন্ধকারের ভেতর থেকে ওর দৃষ্টি সরে না। সে কাগজ সাঁটা দেওয়াল আর রঙীন ছবি দেখে। সে ভাবছে ওকে বোধহয় কেউ ধরে মেরেছে।

সে মনে ভাবে, হয়ত লানড্রির শূন্য জানলার সামনে ওর রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। তার এই রক্তক্ষরণ জনিত মৃত্যুর দিকে একচক্ষু ধোলাই-করা মেশিন তাকিয়ে আছে। না না, ওসব সে ভাববে না। এর ফলে মন্দটাই ঘটে যায়।

সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'না, আমি কিন্তু ওকে জানি না। ও যদি আমাকে কিছু বলত।' সে মনে মনে ভাবে হয়ত একটা মোটর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

সে ভাবে, ওর আঘাত হয়ত সামান্য। হাসপাতালে গেছে মাথায় ব্যাণ্ডেজ করতে।

না, সে আর অন্ধকার চতুষ্কোণের দিকে তাকাবে না। সে তার চোখের তারার ওপর চোখের পাতা চেপে ধরে। তার চোখের অক্ষিগোলক আর চোখের পাতার মধ্যে একটা দুগ্ধশুভ্র চৌখুপী দেখা দেয়। তার ভিতর দিয়ে মুক্তার লাইন, ম্লান সূত্র এবং তা কম্পমান।

'আমার স্বামী কোথায়? ডিয়েট্রিচ কোথায়?'

সে পুলিশের কাছে যেতে চায় না, আর এই নিরুদ্দেশ শুধু তার এবং স্বামীর ব্যাপার। সে নিজে গিয়ে খুঁজে বার করবে স্থির করে। সে একটা চিঠি লিখে যায়:

> আমি মুক্ত অঞ্চলে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। আমি যতক্ষণ না ফিরি অপেক্ষা কর কিংবা লিখে রাখো তুমি কোথায় থাকবে।

সে বাস ধরে না। সে ঠিক কোথায় নামতে হয় জানে না। সে ধাবমান পথচলতি মানুষদের প্রশ্ন করে। মাঝে মাঝে সে ভাবে সে যেন ওর পিছনেই আছে। সে মুখ ফিরিয়ে দেখে, না, কেউ নেই। সবাই অপরিচিত। ব্রীজের ওপর যেখানটায় লেখা আছে 'কাস্টম্‌স্‌' সেখানে দাঁড়িয়ে সে ভাবে আমি বরং বাড়ি ফিরে যাই। আমি ওর জগতে গুঁড়ি মেরে যেতে চাই না। আমি আবার অনেকক্ষণ বাড়ি ছেড়ে আছি—আমি ফিরে গিয়ে ওকে খুঁজে নাও পেতে পারি।

সে ব্রীজ অতিক্রম করে যায়, তার ধারের লোহাগুলির ছায়া পথের আলোয় আলোকিত নদীর জলে তরঙ্গায়িত। 'প্রকাণ্ড একজোড়া ওজন সম্বলিত প্রহরীকক্ষের ভেতর ঢুকে ও বলে—

'আমি কি একটু ফ্রী জোনে বেড়াতে পারি ?'

একজন অফিসার জবাব দেয়—'যদি অন্য কোনো কাজ না থাকে তাহলে যান। কিন্তু এখন এই রাত্রে আপনার কি চাই সেখানে ?'

'আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, একবার জায়গাটা দেখে যেতে চাই।'

'জেনে রাখুন, আপনার সঙ্গে যদি কোনোরকম করযোগ্য জিনিস থাকে তাহলে তা ঘোষণা করতে হবে।'

'হাঁ।'

সে রাস্তার নাম উদ্ধার করার চেষ্টা করে। আশ্চর্য! বাইরে যেমন পথের নাম দেওয়া আছে, এখানেও ঠিক সেই রকম। একটা কালো ব্লু-রঙের এনামেলে লেখা আছে "হল্যাণ্ড"।

হয়ত ও হল্যাণ্ডেই চলে গেছে। ওকে এইখানে খুঁজে বার করতেই হবে। সে নিশ্চয়ই কিছু ভুলে গেছে, কিংবা কোনো ওপরওলার সঙ্গে দেখা হয়েছে তিনি এইখানে চেক করার জন্য নিয়ে এসেছেন।

লম্বা কালো বাড়িগুলি ছাড়িয়ে যায় আন্‌কে, যেন ফ্লাটের মত দেখতে কিন্তু ফুটপাত অতিক্রম করে কেউ তার গোড়ায় যাচ্ছে না। সে বাড়িগুলির সামনে চলে যায়। কাছ থেকে ছোট ছোট তামার ফলক দেখে। তারপর সে দেখল জানালাগুলি কালো—তার ওপর ঘন-নীল রঙ করা।

সে ভাবে, এ যেন অন্ধমানুষের দৃষ্টিনিক্ষেপ। পথের শেষে কোনো কোনো ভারা থেকে আগুন ছিটকে আসছে। সে ভাবে কোথাও আগুন লেগেছে। তাই হয়ত ও দৌড়ে এখানে চলে এসেছে। তারপর ও ইস্পাত কারখানার কাছে উঠে পড়ে, একটু আগেই আগুনের রঙে রাঙা হয়েছিল—এখন অগ্নিশিখা নির্বাপিত।

এরপর সে কতকগুলি সোজা হয়ে দাঁড়ান নীরব ক্রেণের সার অতিক্রম করল—একটা রেলওয়ে ইঞ্জিন অতিক্রম করল, তারপর চিহ্নহীন লাইনে পথ হারাল। তখন সে ফেরার পথ খোঁজে।

আবার সে জানালার পাশে তাকায়। হয়ত কোনো বাসিন্দা একটা জানালা খুলছে একটু বাতাসের জন্য কিংবা রাতের কোনো শব্দ শোনার জন্য।

তার পা পিছলে যায়—সে কিছু একটা ধরার জন্য অন্ধকারে হাতড়ায়।

জানালাগুলির তলায় ক্ষুদে বালুকণা তার হাতের ওপর এসে চাপ দেয়।

সে কিছু জড়ো করে নেয়, তারপর সেগুলি তুলে ধরে, তারপর অদূরবর্তী পথের আলোর সামনে নিয়ে এসে ধরে।

সে ভেবেছিল এ বোধহয় কফি। অভার্জিত কফি। সারা পথটা কফির গুঁটিতে বোঝাই। সবকটা জানলার পিছনে এখন কফির গুঁটি ভরতি হয়ে আছে।

ডিয়েট্রিচ, তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ি ফিরেছ।

সে যখন দরজা খুলল—তার নিজেরই লেখা সেই চিঠিখানি উড়ে এল টেবল থেকে। সে তেমনই সাজগোজ করা অবস্থায় কৌচে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে। বিছানার চাদরের ভাঁজে সে হাতবুলায়, ধীরে আরো ধীরে—তারপর কখন আঙুল থেমে গেছে সোজা ছড়ানো আঙুল।

ও ফিরে আসেনি।

ওর ওপরওয়ালারা কাজের সময়ের পর ওকে ডেকে পাঠাননি। তার বন্ধুরা জানে না ও কোথায়। পুলিশের কাছে কোনো খবর নেই।

একটা তল্লাসী সুরু হল।

বসন্তকালে আবার একবার নতুন করে তল্লাসী হল, সারা দেশব্যাপী তল্লাসী। তার দেহ পাঁওয়া গেল, উত্তরাঞ্চলে দিনেমার সীমানা থেকে কাছেই দেহটা পাওয়া গেল।

ডিয়েট্রিচ একটা অ্যান্টি এয়ারক্রাফট সেল্টারে নেমেছিল। তার চারপাশে ঘাস ও আগাছা জন্মেছে, সে কয়েক শিশি ঘুমের বড়ি গিলে খেয়েছে।

কাউনসিলার

ম্যাক্‌স ভন্‌ ডার গ্রুণ

রাতের সিফটের খনি শ্রমিকরা কাজ থেকে সকাল সাতটায় বাড়ি ফেরার আগেই সবাই জেনে গিছল এ্যাকসিডেন্টের সংবাদ। রাত ঠিক তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম স্তরে, পঞ্চম বিভাগে "সানসাইনের" ছাদ ধসে পড়ে প্রায় কুড়ি ফুট।

খনি প্রায় আটজনকে ধ্বংস করেছে, তিনঘণ্টা পরে পাঁচজনকে উদ্ধার করা গেছে আহত অবস্থায়, অন্যদিকে স্বাস্থ্য অবশ্য ভালো। অন্য তিনজনের জন্য উদ্ধারকর্ম অনেকক্ষণ ধরে চলে। দুপুর এগারোটার সময় তাদেরও পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়।

আর বেশী কিছুই হয়নি। একটা খনি দুর্ঘটনা—পাঁচজন আহত আর তিনজন নিহত; তাহলে আর একবার সব ঠিক ঠিক ঘটে গেল। শহরে সন্ধ্যার দিকে যারা শুধু প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কিংবা এই দুর্ঘটনায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে তারাই এখন এই কথা আলোচনা করে। রেডিও আর টেলিভিসন তাদের আঞ্চলিক কার্যসূচীতে এই দুর্ঘটনার একটি বিবরণ দিয়েছিল। তিনজন মাত্র খনি শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে, ন'জন ত আগে নিহত।

প্রতিদিনই সংসারে কত না পরিবর্তন। সমস্ত দেশগুলি আলোড়িত, কত নগর ধ্বংস হয়ে গেল। নদীগুলির জল তীরে উপছিয়ে পড়ে, পাহাড় থেকে আগুন আর গন্ধক বেরোয়; তাহলে মাত্র তিনজনের জন্য এত উদ্বেগ কেন, তারা তাদের কর্মের বেদীমূলে বলি প্রদত্ত।

রুরে এই ধরনের বিবরণ মানুষের সয়ে যায়। তারা ধূলির মত প্রত্যাহিক জীবনের একটা অঙ্গ।

বারটা বাজল ··

মৃতদেহগুলিকে দিনের আলোয় আনা হল, ওয়ার্কস ম্যানেজমেণ্টের অফিসে ও ওয়ার্কস কাউন্সিলে সবাই মিলিত হয়ে একটি মুখ্য প্রশ্ন আলোচনা করছে,

বাড়িতে কে খবর দেবে। এই একটা ব্যাপার যা মালিক এবং নিহতদের বন্ধু-বান্ধব বরাবরই এড়িয়ে চলতে চায়—যাই হোক, শোকের প্রথম মহড়ায় কেউ তার সামনে সান্ত্বনাহীন ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়াতে চায় না। যেন একজন দুর্বৃত্ত এসে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যে গৃহ আনন্দমুখর ছিল সেইখানে আতংক সৃষ্টি করছে।

দুটি ঠিকানায় পাঠানোর জন্য বার্তাবহ তখনই পাওয়া গেল। তৃতীয়টির জন্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ আর স্বেচ্ছায় নাম বলে না। যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই এই যাত্রা থেকে পিছিয়ে থাকিতে চায়, আর এই শেষ প্রাণীটি মাত্র একুশ বছরের খনিশ্রমিক। তার মৃতদেহ ধোতাগারের পাশে লাসঘরে শায়িত।

এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত নীরবতা ভেঙে ওয়ার্কস কাউনসিলার ব্রিণখোফ সহসা বলে উঠল—'আমিই যাবো।'

সে বেশ দৃঢ়গলায় কথাগুলি বলল—অবশ্য তার কণ্ঠস্বর ধরা ধরা—সে তার সহকর্মীদের মুখোশ সদৃশ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, হয়ত এই শেষ মুহূর্তে কেউ তাকে এই যাত্রার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবে। কিন্তু এই সাতটি মুখে শুধু স্বস্তির ছাপ যে শেষ পর্যন্ত একজন যাহয় কাউকে পাওয়া গেছে। অতীতে কয় বছর মাঝে মাঝে লাটারি করে এইসব ঠিক করতে হয়েছে।

সব ভীরু মোড়লের দল—যখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই তখন তাদের লম্বাগলা, আসল কাজের সময় যখন কথা খুঁজতে হবে তখন একেবারে লেজে-গোবরে। যাই হোক, আমি শেষ পর্যন্ত নিজেই যাব বলেছি, কিন্তু কোনোমতেই আজ বিকালে টেলিভিসনে ফুটবল ম্যাচটা ফস্‌কে না যায়।

ব্রিণখোফকে যে হিউগ্ পরিবারে যেতে হবে তারা একেবারে শহরের প্রান্তে থাকে, যেসব সরকারি হাউসিং এস্টেট হয়েছে তারই একটায়। পিতা হিউগ্ অনেক বছর ধরে একেবারে পঙ্গু হয়ে আছে, তাঁর লাংসে ধূলা জমেছে, তিনি বাড়ির সামনে বাগানে কাজ করছিলেন। ব্রিণখোফ্ লক্ষ্য করল বৃদ্ধ হউগ্-এর ঝুড়িটা মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে। সে আবার সোজা হয়ে উঠে, চোখের ওপর হাতের ছায়া করে রাস্তার দিকে তাকায়, যে রাস্তা ধরে ব্রিণখোফ্ এখানে এসে পৌছেচে।

বাগানের গেটের সামনে পৌছে ওয়ার্কস কাউনসিলার দাঁড়াল—বলল—

'গুড্ ডে। উইলিয়াম। এত বেশী খেটো না, কালকের জন্য কিছু কাজ রেখে দাও।'

আজ আবহাওয়াটা চমৎকার। অবশ্য কাজও ছিল তেমনই।

ব্রিণখোফ্ কথাগুলি বেশ ধীরে ধীরে এবং নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বলে যায়।

ব্রিণখোফ্ ভাবে—হা ভগবান! বুড়ো আছে বেশ। নিজেই নিজের মনিব—কাজ করতেও পারে আবার না করলেই বা কি—যেমন ইচ্ছা। কিন্তু যে করেই হোক্ আমার ফুটবল ম্যাচটা মাটি না হয়।

বুড়ো হিউগ বলে—'ও তুমি ফ্রেড নাকি! গুড্ ডে ভাই। হাঁ, কি করি বল, আগাছা জন্মায়—তাই প্রতিদিনই বাগানে কিছু কিছু কাজ করতে হয়, আগাছা থেকে ফুলকে পৃথক রাখতে গেলে খাটতেই হয়।'

'না, আমাকে ফুটবল ম্যাচটা বাদ দিলে চলবেই না—ব্রিণখোফ মনে মনে ভাবে—কে জানে, উই [১] আজ খেলছে কিনা!'

ব্রিণখোফ্ প্রশ্ন করে—'কারো অপেক্ষায় আছো নাকি?'

'অপেক্ষা! হাঁ, দেখো না ভাই, ছেলেটা এখনও আসেনি, নাইট সিফ্টে কাজ করেছে, এখন প্রায় দুটো বাজে। হয়ত আবার ডবল সিফ্টে কাজ করেছে। নির্বোধ ছোকরা! জানো ভাই, একটা চমৎকার বান্ধবী হয়েছে, এখন একটা মোটর বাইক চাই। অল্পবয়স বাইকে চড়ে বেড়াবে। বাগান নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই, তুমি ত' জানো ভাই, আজকালকার ছেলেছোকরা কি ভাবে বেড়াতে চায়, বাগানে আর ওদের কোনো আগ্রহ নেই। খালি এই ওভারটাইম, এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আমার পেনসন থেকেও ওকে কিছু কিছু দিই।'

'তা ত বটেই।' এই বলে ব্রিণখোফ্ ভাবে আর একঘণ্টার মধ্যেই টেলিভিসনে খেলা স্বরু হবে।

'কিন্তু ছেলে ছোকরারা সব ব্যাপারেই হাত দেবে।' কথাগুলি একটু রাগের ওপরই বলল বৃদ্ধ হিউগ্।

ওয়ার্কস কাউন্সিলার ব্রিণখোফ্ প্রশ্ন করে, কি মার্কাওলা মোটর সাইকেল কিনতে চায়?' মনে মনে ভাবে মোটর সাইকেল? ননসেন্স, কে আর

১ Uweseler উইশীলার জার্মানীর বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেনটার ফরোয়ার্ড।

আজকাল মোটর সাইকেল কিনতে চায়? চার চাকা হল চার চাকা, মাথার ওপর ছাদ মানে ছাদ।

কে জানে উই আজ খেলবে কি না!

বৃদ্ধ বলে, 'আমাকে জিজ্ঞেস কোরোনা ভাই ফ্রেড, ওসব ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই। শুনেছি নাকি ইটালিয়ান। তোমাকে ভাই বলছি গত কয়েকদিন সন্ধ্যায় আমার ছেলে আর তার বান্ধবী বসে বসে কেবল ক্যাটালগ আর মূল্যতালিকা দেখছে পিছন দিকে, যেখানটায় আস্তাবল ছিল, সেটাকে গ্যারাজ বানিয়েছে, তা ভাই তোমাকে বলছি, চমৎকার করেছে। সেটাকে আবার ঝড়্‌তি পড়্‌তি ওয়ালপেপার সেঁটে সাজিয়েছে। গ্যারাজটা অবশ্য কিঞ্চিৎ টেরে পড়েছে, তা নইলে বেশ চমৎকার হয়েছে। আজকালকার ছোকরাদের কি যে সব মর্জি।' হিউগ একটু তৃপ্তির হাসি হাসে।

ব্রিণখোফ্ ভাবে এই ভাবে যদি বক্‌বক্ করি তাহলে আন্তর্জাতিক খেলাটা ফাঁক পড়বে, কিন্তু সে বলে, 'তা ঠিক কবে এইসব সরঞ্জাম চাই? খুব দামী নাকি?'

—'সামনের সপ্তাহে।' বুড়ো জবাব দেয়। 'আমিও ভাই আশা করে আছি, আমাকে বলেছে সবসময়েই পায়রা আর হাঁস মুরগীর প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবে। তবে ভাই সরঞ্জাম বলাটা উচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে, আমার ছেলে বলে, এই মেশিনটাই নাকি বাজারের সব চেয়ে নিখুঁত। কি নাকি ফোম দিয়ে মাপা, ঐ রকম কি একটা নাকি বলে!'

ব্রিণখোফ্ ভাবে—হা ভগবান, লোকটা কি করে এমন অন্ধকারে আছে। ওর আশপাশের সবাই খবরটা জেনে গেছে, কেউ কিন্তু ওকে বলেনি। সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি, আমাকেই স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব নিতে হয়েছে। কি বিশ্রী কাজ।

কি জানি আজ উই খেলবে কি না!

সহসা বৃদ্ধ হিউগ প্রশ্ন করে, 'তা ভাই আমাদের পাড়ায় হঠাৎ কি করতে এলে? পায়রা কিনবে নাকি?'

ব্রিণখোফ্ তার ঘড়ির দিকে তাকায়। এইভাবে যদি চলে, সে মনে মনে ভাবে, তাহলে আর আমার ফুটবল খেলা বাদ পড়বে।

বৃদ্ধ হিউগ আবার প্রশ্ন করে, 'এখন কি ছুটিতে নাকি?'

'না ভাই উইলিয়াম, মার্চ মাসে ছুটি নিয়েছিলাম। বাড়ির সব ঠিকঠাক করতে হল। তাই তখন, পাওনা ছুটি নিয়েছিলাম।'

'তাহলে, ফ্রেড তুমি ত' এখন কাজের ওপরই থাকবে। আমিও বরাবর তাই করে এসেছি। এখন আমার অনেক সময়, প্রচুর সময়।'

ব্রিণখোফ্ ভাবে—তাই বটে! পঙ্গু হয়ে থাকা একরকম ভালোই।

…'আমি ভাই বলছি—সারাদিন ধরে যা খুশি করো। তাড়াহুড়ো নেই। কেউ তোমার ওপর মোটর চালিয়ে দেবে না—তার থেকে পালাবার প্রয়োজন নেই—কোনো তাড়া নেই, কোনো শাস্তির ভয় নেই। ক্লান্ত হাওয়ার ভান করতে হয় না। তবে এখন একেবারে শেষ। লাংস ঠিকমত কাজ করে না। আমি ভাই বলছি, একটু কুয়াশা হলেই আমার ভয় হয়—তখনই আমার গলা বন্ধ হয়ে আসে। পেনসনও তেমন বেশী নয়, বয়স হলে আমরা একেবারে জেরবার হয়ে যাই, জীর্ণ হয়ে পড়ি। তবে তুমি কি করতে চাও তার ওপর সব নির্ভর করে।'

ব্রিণখোফ্ বলে, 'আমরা সবাই শুধু শ্রমিক আর যারা গাড়ি চালায় তারাও যে সর্বদা অপরাধী তা নয়। যারা তাদের ওভাবে চালিয়ে আসতে দেয় তাদেরও অপরাধ আছে।'

আশাকরি আন্তর্জাতিক ম্যাচটা মাঠে মারা যাবে না।

'নিগেমায়ার ওর সব বিক্রী করছে। ও একেবারে শহরের ভেতর চলে যাচ্ছে। জানো ত' ওর স্ত্রী কাকার সম্পত্তি পেয়েছে, সেখানেই যাবে। সেখানে ত' আর পায়রা রাখতে পারবে না। তুমি বেশ সস্তায় পায়রা পেয়ে যেতে পারো। ওর কয়েকটা বেশ ভালো উড়ুক্কু পায়রা আছে। নিগেমায়ার লোকটাও একেবারে গলাকাটা নয়।'

ব্রিণখোফ্ প্রশ্ন করে—'ওর পায়রাদের কি ব্যবস্থা করছে তাহলে?' আমি যদি এইভাবে বক বক করে যাই তাহলে ফুটবল ম্যাচটা নষ্ট হবে।

'তুমি যদি চাও, আমি কোন একসময় তোমার কথা বলব, চাও ত' এখনই যাওয়া যেতে পারে। ওরা ত' কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকে। অবশ্য তোমার যদি দরকার থাকে এবং সময় হাতে থাকে…… '

ব্রিণখোফ্ তাড়াতাড়ি বলে, 'না ভাই উইলিয়াম, প্রকৃতপক্ষে আমাকে এখন একটু হাটতে হবে।'

হঠাৎ মুখটা তুলে বৃদ্ধ হিউগ প্রশ্ন করে, 'ভগবানের দোহাই—! খাদের ভেতর কিছু একটা হয়েছে নাকি?'

ব্রিণখোফ্ ভাবে, হা ভগবান। লোকটার মনে এতটুকু সংশয় নেই। অথচ ওর আশপাশের অন্ততঃ একশটা লোক খবর জেনে গেছে যে নিহতদের মধ্যে একজন ওর ছেলে। এই প্রতিবেশীর দল কি ভীষণ ভীরু। কেউ ওকে বলেনি।'

কি জানি আজ উই খেলবে কি না।

সে বলে, 'হাঁ উইলিয়াম, সানসাইন সীমে, পূবদিকের পঞ্চম শ্রেণীতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুমি ত' ঐসব রাস্তার কথা আগে থেকেই জানো।'

'কি! সানসাইন। পূব দিককার পঞ্চম শ্রেণী? হাঁ, সানসাইনের পাথরটা বড়ই দুর্বল। আমার সময়…প্রতি সপ্তাহেই একটা ধস নামতো। যেন ডাইনীর কাণ্ড! তুমি যতই সাবধানে গড়ো ভাই, কিছু একটা সব সময়েই ঘটতে পারে। আর দেখ এই হতভাগা সানসাইন সীম বন্ধও হয়ে যায় না। কারণ, ওর কয়লাটা সবচেয়ে ভালো আর সস্তা। কয়েকটা আহত বা নিহত হলে কি এসে যায়। আসল জিনিস হল প্রচুর কয়লা, আর তা সস্তা। বরাবরই ঐ রকম, আর এই ভাবেই থাকবে। আমরা কিছুই পরিবর্তন আনতে পারব না। যাই হোক, আমার আর ঐ দলে কিছু করার নেই।'

হিউগ এক জোড়া বাজ পাখির দিকে তাকায়। সে বলে ওঠে, 'চমৎকার! আমি আজ ক'দিন ধরে ওদের দেখছি। নিশ্চয়ই ভারী মজার ব্যাপার, ঐখানে বসে বিয়ের প্রস্তাব।'

আজকের সংবাদপত্রে লিখেছে উই খেলবে কিনা এখনও সন্দেহজনক, তার একটা পুরাতন ব্যথা চাগিয়েছে—ব্রিণখোফ্ মনে মনে ভাবে।

'কিন্তু এক মিনিট!'—সহসা বৃদ্ধ চেঁচিয়ে ওঠে—'কি বললে তুমি? পূব দিকের পঞ্চম শ্রেণী? পঞ্চম স্তর? কিন্তু…কিন্তু…ঐখানেই ত' আমার ছেলেও আছে। ফ্রেড, সত্যি করে বলো ভাই কি হয়েছে?'

ওর ছেলে একটা চমৎকার আউটসাইড লেফ্ট। ঠিক হাতে পড়লে কে জানে, সে হয়ত ফেডারেল লীগের উপযুক্ত হত। এখানে আসার জন্য স্বেচ্ছায় রাজী না হলে, এখন আমি বেশ টেলিভিসনের পর্দার সামনে বসে খেলা দেখতে পারতাম।

'জানো উইলিয়াম, ধস ভেঙে পড়ায় আটজন চাপ পড়ে—' ওয়ার্কস কাউনসিলার ভারী গলায় বলে। তারপর বেশ মন দিয়ে বাজপাখীদের পাকখেয়ে ঘোরা লক্ষ্য করে সে বলে—'যেন ডুডানাওলা প্লেন।' হিউগ তা শুনতে পায় না।

'হাঁ,—ধস্ ভাঙার পর নীচে পড়েছিল আটজন। পাঁচজনকে তখনই টেনে তোলা যায়—তিনজন চাপা পড়ে গেল। তুমি ত' বুঝতেই পারো।'

বৃদ্ধ হিউগ তার পাইটা ধরিয়ে নেয়। পাইপের খোলে তামাক নেই। কিন্তু সে কাঠির পর কাঠি দেশলাই নষ্ট করে। পায়ের তলায় একগাদা দেশলাই জড়ো হয়ে পড়েছে যেন মিকাডো খেলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আবার হিউগ যে-পথ দিয়ে ব্রিণখোফ্ এসেছে সেই পথের দিকে তাকায়।

'তাহলে তুমি বলছ তিনজন চাপা পড়েছে। তিনজন। তিনজন—না ফ্রেড! তিনজন কেন? তাই আমার খোকা এখনও ফেরেনি। তাই জন্য। ও তাহলে এই ব্যাপার।'

তারপর কিছুক্ষণের পক্ষঘাতগ্রস্ত নীরবতার পর সে অট্টহাস্য করে ওঠে। যেন সারা বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ হাসির কথা জেনেছে।

'তাহলে, ফ্রেড এই ব্যাপার! তুমি গোড়া থেকেই এই জন্য আমার কাছে সোজা চলে এসেছে।' তারপর পায়ের নীচের পোড়া দেশলাই কাঠি-গুলির দিকে তাকায়। তারপর বলে—'হা সানসাইনের পাথরগুলি বড়ই দুর্বল। একেবারে মদিরা কেকের মত ঝরঝরে।'

এতক্ষণে কি তাহলে বুঝেছে! এইবার খেলা স্বরু হবে। কে জানে উই খেলতে নেমেছে কিনা।

'তাহলে তিনজন চাপা পড়েছে তুমি বলছ···কিন্তু মাত্র তিনজন কেন?...দুজন নয় কেন? কিংবা একজন? কিংবা কেউ নয়।' তারপর সহসা সে চীৎকার ওঠে, 'কেন কেউ নয় হলনা কেন? কেন ফ্রেড? কেন? জানো, ভদ্রলোকরা বুঝতে চান না যে একটা মানুষের দাম একটন কয়লার চেয়ে বেশী? তাই না? তাই নয়?'

ব্রিণখোফ্ ভাবে—হা ভগবান! লোকটা ঠিকই বলছে। কিন্তু আমরা সবাই কি আর করতে পারি? আমরা কি কাজ ছেড়ে বসে থাকতে পারি?

হিউগ বাড়ির দিকে তাকায়। তার স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পথের

দিকে তাকিয়ে আছে। বাগানে গেটের সামনে যে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই।

পথে প্রথম সিফটের খনি-শ্রমিক দেখা যাচ্ছে। অনেকেই দ্রুত পায়ে যাচ্ছে, কেউ ধীরে ধীরে!

ওরা সবাই বেশ আগে ভাগেই টেলিভিসনের পর্দার সামনে গিয়ে বসবে, ব্রিণখোফ্ মনে মনে ভাবে।

বৃদ্ধ গভীর হতাশায় প্রশ্ন করে—'কিন্তু ফ্রেড, আমি আমার স্ত্রীকে কি করে বলব? কি করে? কি বলব?'

'কি উইলিয়াম? কি বলছ?'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই ফ্রেড। তুমি এসেছ ধন্যবাদ। কিন্তু ভাই, আমার স্ত্রীকে কি বলব? কি করব? কি বলব?'

ব্রিণখোফ্ বল্‌ল, 'আমি ভেতরে গিয়ে বল্‌ছি।' আমি কি উন্মাদ! হা ভগবান! কি করে বলব। ও হয়ত শেষ পর্যন্ত বলবে সব আত্মীয়দের বলে এসো।

এতক্ষণে খেলা স্বরু হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ হিউগ একজোড়া কাঁচি নিয়ে মানুষভোর উঁচু ডেলফিনিউম ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল।

স্ত্রীলোকটি বাড়ির ভেতর ঢোকা পর্যন্ত ব্রিণখোফ্ অপেক্ষা করে থাকে, তারপর তার অনুসরণ করে। বারান্দায় ভাজা মাছের গন্ধ ভেসে আসছে—সে শুনতে পায় স্ত্রীলোকটি কিভাবে বাসনপত্র এদিক ওদিকে সরিয়ে রাখছে।

কাউন্সিলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকে, তারপর শেষ পর্যন্ত স্বরু করলেন শিশুর মত জ্যাকেটের বোতামগুলি গুণতে; কি করি—বলব? না বলব না? বলব? না বলব না?

হঠাৎ অতিশয় দ্রুততার সঙ্গে ব্রিণখোফ্ দরজাটি হাট করে খুলে ফেললে। স্বামী বা পুত্রের পরিবর্তে অপরিচিত এই ব্যক্তির আবির্ভাবে স্ত্রীলোকটি একটু বিস্মিত হলেন।

'বলুন?—কি করতে পারি বলুন! আপনি কি আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবেন? তিনি ত' বাগানে কাজ করছেন, কিন্তু এইমাত্র আপনিই ত' তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

ব্রিণখোফ্ মনে মনে ভাবে—এখনই, এই মুহূর্তে তাড়াতাড়ি কথাটা বলতে হবে, তাড়াতাড়ি—কথাটা তাড়াতাড়ি বলতে হবে। বলেই ফেলি তাড়াতাড়ি—

কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না, দোর গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইল টুপিটা হাতে করে—টুপিটা হাতে করে—টুপিটা হাতে—

কাউন্সিলার ব্রিণখোফ্ লক্ষ্য করেন স্ত্রীলোকটির চোখ দুটি ক্রমেই যেন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠেছে, তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন—তারপর চীৎকার করে উঠলেন—'না, না—এ হতেই পারে না—এ সত্যি নয়, সত্যি নয়।'

তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে ব্রিণখোফ্ দৌড়ে পালালেন। ডেলফিনিয়মের ঝোপের লম্বা ডালগুলি বৃদ্ধ তখনও কেটে চলেছেন। তিনি ব্রিণখোফকে বললেন, 'আমার শ্যালিকা এখনই এসে পড়বেন, এতক্ষণ ত' এসে পড়ার কথা। কিছু ফুল আর আমার এই কোদালটা নিতে আসবেন। তাঁর একটা ফার কোট আছে অথচ একটা কোদাল নেই।'

ব্রিণখোফ্ দৌড়ে পালাতে পালাতে বলে ওঠে—'তুমি ভেতরে যাও ভাই—'

'হাঁ, ফ্রেড যাই, আহা মেয়েটা ভারী চমৎকার, ভারী ভালো মেয়ে—'

সেই বাজপাখী জোড়া এখন অদৃশ্য হয়েছে।

ওয়ার্কর্স কাউন্সিলার ব্রিণখোফ্ আবার যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর সারা অঙ্গে ঘাম ঝরে পড়ছে সার্টটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। পথে কেউ কোথায় নেই, একেবারে নির্জন রাস্তা—বাড়িগুলির শেষ প্রান্তে যেখানে গিয়ে পথ শেষ হয়েছে ব্রিণখোফ্ পথের ধারে ধূলি মলিন ঘাসের ওপর বসে পড়লেন তারপর মুখটা মুছে নিলেন।

হা ভগবান! কী রকম মানুষ এরা? টেলিভিসনের সামনে বসে বসে ফুটবল খেলা দেখছে। আশ্চর্য—কী সব মানুষরে বাবা!—দেখছে আর দেখছে আর গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। আর আমার অবস্থাটা কি··· ?

কি জানি, উই আজ শেষ পর্যন্ত খেলতে নামল কিনা কে জানে?

তীর্থযাত্রা

হানস্ বেনডার

"বয়স যখন অল্প ছিল আপেল গাছের তলায়
আনন্দময় বাড়ীর ধারে —
সুখী ছিলাম সবুজ ঘাসের মত……"

—ডিলান টমাস

দুর্বল এবং নিদ্রাচ্ছন্ন চোখে হানস রান্নাঘরের টেবিলে দাঁড়িয়ে ছিল আর আনা তাকে ট্রাউজার পরিয়ে দিচ্ছিল।

পিতা প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা একটু তাড়াতাড়ি করে তৈরী হয়ে নেবে না যাতে আমরা কফিটা পেতে পারি?'

আনা বলল, 'অনেক আগেই আমার হয়ে যেত, ছেলেটা যদি এত একগুঁয়ে না হত।' তারপর বন্ধনীর দড়িটা বেশ টাইট করে বাঁধে, যেন সবাই যখনও শুয়ে আছে, সেই অতি ভোরে ওকে উঠতে হয়েছে বলে আক্রোশবশে যেন তার শোধ নেয়।

হানস টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। কোনো সাহায্য না নিয়েই সে জুতোর ভেতর পা গলাতে চায়। নতুন জুতো, হলদে রঙের সাণ্ডেল, গর্তওলা, চলার সময় জুতোর সোল একটু বেঁকে গেলে বেশ মচ্‌মচে আওয়াজ হয়।

আনা কাপ, মার্মালেড, পাউরুটি আর কফি টেবিলে রাখার পর কফির সুরভি নাকের ভেতর প্রবেশ করে, মা এসে বললেন, 'আমাদের আজ একটুও কফি খাওয়া চলবে না!'

পিতা ইতিমধ্যেই বসে পড়েছিলেন, প্রশ্ন করলেন, 'কেন আমরা একটুও কফি খেতে পারব না।'

মা বললেন, 'কারণটা তুমি যদি না জানো তাহলে খুবই দুঃখের ব্যাপার।'

এই তিরস্কার তাঁর পিছন থেকেও যেন প্রকাশিত, তিনি আরশীর দিকে পিছন ফিরে তাঁর চুলের সঙ্গে টুপি আঁটার জন্য পিন গুঁজছিলেন।

পিতা কফিতে চুমুক দিতে লাগালেন। আনা এই নিষেধের গণ্ডীর বাইরে কারণ সে বাড়িতেই থাকবে, সে বেশ ছড়িয়ে চেয়ারে বসেছে আর তার কাপে রুটির টুকরো ভিজিয়ে নিচ্ছে। মা আনাকে ফায়ার প্লেসের কাছে ডাকলেন, নানারকম পাত্রের ঢাকা খুলে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন দুপুর বেলায় এবং সন্ধ্যার জন্য কি কি রাঁধতে হবে।

মা বললেন, 'তবে সন্ধ্যার অনেক আগেই হয়ত আমরা ফিরে আসব।'

প্রাঙ্গণে পিতা গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছেন, কালো উঁচু চাকাওলা রেনো গাড়ি। র্যাডিয়াটারের ঢাকনাটা বন্ধ। গাড়িটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে, তাই ঝক্ ঝক্ করছে। থেমে যাচ্ছে। পিতা কপাল থেকে ঘাম মুছলেন, আবার সুইচ দিলেন, একটা অস্পষ্ট দিব্যি উচ্চারণ করার সঙ্গেই গাড়ির স্টার্ট লেগে গেল। মা এবং হানস কম্পিত মোটর গাড়িটায় উঠলেন, মা বসলেন সামনে, হানস পিছনে। বাবা লাফিয়ে উঠেই গীয়ার লীভারটা মুঠো করে ধরলেন। আনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলে ওঠে—'হান্‌স্ টুপিটা ভুলে গেছে।'

ধীরে ধীরে ওরা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করল, তারপর পথে পড়ল, রাস্তাটা স্তব্ধ এবং নির্জন। সূর্যোদয়ের আগে জুন মাসের গ্রামাঞ্চলের পথ। উপত্যকায় নদীর জলের ওপর স্বচ্ছ কুয়াশা ভাসছে, আর পাহাড়ের ধারে পূব দিকে সূর্য ক্রমশঃই ওপরে উঠছে।—প্রথমটা যেন রূপার করাতের দাঁত—তারপর জ্বলন্ত গোলক সদৃশ সূর্যদেব স্বয়ং—চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যদি সেদিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব গ্রামের ভিতর দিয়ে ওরা যাচ্ছে সেই গ্রামগুলিও জেগে উঠছে, ঘোড়াগুলি জল খাবার জায়গায় যাচ্ছে ধীরে ধীরে, যেসব কাঠের গামলায় জল পড়ছে তার মরচে-ধরা পাইপ চক্‌চক্ করছে। মোটরের চাকার সামনে হাঁস-মুরগীর দল ডানা নেড়ে বেড়াচ্ছে। খোলা ভ্যান গাড়ি প্রাঙ্গণের গেট পার হয়ে বেরিয়ে আসছে। ঘুম-ঘুম চোখ নিয়ে খেত-খামারের শ্রমিকরা বাক্সের ওপর বসে আছে আর গরু আর ঘোড়াদের একপাশে সরিয়ে দিচ্ছে।

অধিত্যকাভূমি অরণ্যে পূর্ণ। সূর্যদেবের আলো সাধারণ অরণ্যবৃক্ষ নীচের পাতার ফাঁক দিয়ে গাড়িতে এসে পড়েছে। মার মুখে মৃদু শব্দ, তিনি জপমালার মুক্তাগুলি আঙুল দিয়ে গুণছেন।

মা বললেন, 'গাড়ি চড়ে এভাবে তীর্থভ্রমণে যাওয়া ঠিক নয়। অন্য সব তীর্থযাত্রীরা ট্রায়ার, ফুলডা, উরজবুর্গ এবং কলোন থেকে পায়ে হেঁটে আসে। তারা পতাকা এবং ক্রস বয়ে নিয়ে আসে, রুগ্ন মানুষদের ডুলিতে বয়ে নিয়ে আসে, আবার অনেক তীর্থযাত্রী তাদের জুতায় কাঁটা বা মটর কড়াই দিয়ে রাখে ..।'

পিতা বললেন, 'রান্না করা মটর কড়াই ?' তারপর হেসে উঠলেন।

তিনি শীষ দিতে লাগলেন এবং এক্সিলেটরে পা জোর করে চেপে ধরলেন। কিলোমিটারের কাঁটা ৬০-এ পৌছালো।

মা বললেন, 'তুমি যদিও সত্যি সত্যি দৈব বিশ্বাস করো না তবু যে আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ তা তোমার পক্ষে ভালো বলতে হবে। তুমি একটা ভালো কাজ করছ। হয়ত পরে এর জন্য তোমার ঈশ্বরের করুণা লাভ হবে।'

পিতা প্রশ্ন করলেন, 'এটা কিরকমের দৈব ব্যাপার ?'

'এর নাম 'মিরাক্যল অব দি হোলী ব্লাড'—পবিত্র রক্তের লীলা।' তারপর তিনি যে কাহিনী গত রাত্রে বিছানায় শোওয়ার সময় হান্সকে বলেছিলেন সেই কাহিনী বলতে লাগলেন :

'—ছ'শো বছর আগে একজন পুরোহিত মাস প্রার্থনা করছিলেন, সহসা পবিত্র পাত্রটি উলটে পড়ে গেল, আর তার ভেতর থেকে সুরার বদলে রক্ত ঝরে পড়ল একেবারে বেদীর বস্ত্রের ওপর। এই রক্ত থেকে মকুট শোভিত বারটি ত্রাণকর্তার মস্তকশীর্ষ প্রকাশিত হয়ে উঠল সাদা বস্ত্র খণ্ডের ওপর।'

পিতা একটু সংশয়ভরা কণ্ঠে বললেন, 'ছ'শ বছর আগে ?'

'এই তীর্থযাত্রার কালে সেই বস্ত্র খণ্ড ওঁরা দেখান—একটি রূপার মণিমঞ্জুষায় রাখা থাকে। তোমরা দুজনেই দেখতে পাবে।'

পাহাড়ের একটি দুর্গ। তার তোরণশীর্ষে পতাকা উড়ছে।

পিতা বললেন, 'এটা পেসাণ্টস্ ওয়ারের সময় ধ্বংস হয়।'

শস্যক্ষেত্র পাহাড়ের ওপর দিকে উঠেছে, নীচে নেমেছে, অনেক পপি গাছ।

পিতা বললেন, 'জানো, এই আমাদের দেশের শস্যভাণ্ডার। স্কুলে এসব শিখতে পাবে।'

মাতা বেদনাদায়কভাবে তাঁর জপমালা গুনে চলেছেন বিড়বিড় করে। রাস্তা উঁচু নীচু। ছোট ছোট পাথরের টুক্‌রো র‍্যাডিয়েটারে এসে পড়ছে। হাওয়ায় ধূলো উড়ছে, একটা হলদে ভাসন্ত মেঘ অনেক দূরে মাঠ পেরিয়ে ডুবে যাচ্ছে।

পিতাকে দুবার থামতে হয়েছে, কারণ জল গরম হয়ে ফুটে উপচে পড়েছে র‍্যাডিয়েটারে। ক্যাপটা খুল্‌তেই গরম জল হাতে এসে পড়েছে।

তিনি দিব্যি গেলে বলে উঠ্‌লেন—'ড্যাম।'

আকাশের তারারা অভিশাপ দেয়, পথে শয়তান আসুক, এই শস্যভাণ্ডারের দেশে মহামারী লাগুক।

মা আকুল হয়ে বলেন, 'ছিঃ, ওভাবে গাল পেড়ো না, ওরকম করতে নেই, আমরা যে তীর্থযাত্রায় চলেছি!'

প্রথমেই ওরা তোরণ দেখতে পেল। একেবারে পাহাড়ের ওপর শহর আর তারও ওপর প্রায় ঘর বাড়ির ছাদের ওপর গির্জাঘর।

মা বললেন, 'জেরুসালেম নিশ্চয়ই এমনটি দেখতে।'

'আমরা পনের মিনিটের মধ্যেই ওখানে পৌছাব। অবশ্য যদি গাড়িটা গোলোযোগ না করে। বুড়ো গাড়িটার পক্ষে এ দুর্জয় ব্যাপার।'

মা প্রার্থনা করতে লাগলেন—তীর্থস্থানের শহরটি দেখতে পেয়ে তিনি আনন্দে আকুল।

পিতা বল্লেন, 'আমার একটা ভাল্লুকের মত ক্ষিধে পেয়েছে। হান্‌স তোমার অবস্থা কি!'

'আমারও বাবা ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।'

মা বল্লেন, 'তোমরা খালি সাংসারিক কথা ভাবো।'

শহরের জানালাগুলিতে হলুদ, শাদা এবং নীল রঙের পতাকা ঝুলছে। পিতা 'রাইখস্‌ট্যাপফেল ইনের' সামনে দাঁড়ালেন। মার সঙ্গে তার কিছু বাক্য বিনিময় হল। অবশেষে তিনি বল্লেন, 'বেশ আমি একা একা এগিয়ে যাই, তোমরা দুজনে পিছু পিছু এসো।'

অতি দ্রুত তিনি সরু গলিপথের ভেতর চলে গেলেন।

বার-এ বসে পিতাকে তিনবার হাঁক দিতে হল তবে রসুইখানা থেকে তার-

পর পরিচারিকা এল। যে পরিচারিকা বেরিয়ে এল তার গায়ে একটি শাদা আচকান বড় সেফটিপিন দিয়ে কালোরঙের পোষাকের সঙ্গে সাঁটা।

পিতা বললেন, 'জায়গাটা বেশ শান্ত।'

'এখনও ত' ঠিক সময় হয়নি। যাত্রীরা সবাই এখন গির্জায়।'

পিতা বললেন, 'আমরাও তীর্থযাত্রী, আমরা এসে পড়েছি।'

পরিচারিকা বলে ওঠে, 'গাড়িওলা যাত্রীদের হিসাবের মধ্যেই ধরা হয় না।'

'তোমাদের অঞ্চলে সেই কার্যটাও বড় সহজ নয়, এ একেবারে ঈশ্বর বিবর্জিত দেশ, রাস্তায় পীচ পর্যন্ত দেওয়া নেই।'

পরিচারিকা কিঞ্চিৎ চটে উঠে বলে, 'আপনারা কি কিছু খাবেন নাকি?'

'হাঁ, খাবো, পান করবো। এক প্লেট সসেজ আর কিছু মদ নিয়ে এসো। এই ছোট্টটার জন্য লেমনেড। কিরকম পছন্দ তোমার?'

হানস্ বলল, 'সবুজ রঙ।'

পরিচারিকা বল্ল, তাহলে 'একটা ওয়ালডমাইসটার।' এই কথা বলে সে কাউণ্টারের পিছনে খোলা দরজার ভেতর দিয়ে মিলিয়ে যায়।

পিতা পরিচারিকার যাওয়াটুকু লক্ষ্য করতে লাগলেন, নিজের হাতটা ঘসলেন। হানসের দিকে তাকালেন তারপর আর একবার বললেন, 'আমার একেবারে ভাল্লুকের মত ক্ষিদে পেয়েছে।'

'আমারও।'

পরিচারিকা গ্লাস এবং এক বোতল লেমনেড নিয়ে এল।

পিতা প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের মদ ভালো ত?'

'অতিথিরা সবাই ভালো বলেন।'

পিতা বল্লেন, 'আমি একেবারে জহুরী, জানো ত'।'

এই বলে পরিচারিকার নিতম্বে চাপড় দিলেন।

পরিচারিকা যখন ছুরি ও কাঁটা সাজাচ্ছে তখন তিনি তার সঙ্গে একেবারে বিরামবিহীন আলোচনা চালালেন। পিতার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের চেয়েও পৃথক, অনেক নরম, অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ।

প্লেটে অনেক ধরনের সসেজ, পিঙ্ক লিয়ন, ডার্ক রেড হ্যাম, লিভার সসেজ,

সালামি, ব্ল্যাক কালার্ড পর্ক। পেঁয়াজ, শশার কুঁচি প্রভৃতি প্লেটের ধারে ধারে সাজানো।

পাঁউরুটি, কালো বাদামী রঙ, ভিজা অংশ তার ওপর বাদামী মড়মড়ে চূড়া যেন কবরের মত করে সাজানো।

পিতা একেবারে খুশীতে ডগমগ, 'চমৎকার, ভারী চমৎকার স্বাদ ত' এইখানে। কি তোমার কি রকম লাগছে, ভালো ত' ?'

হান্‌সের মুখ খাবারে ভর্তি, সে মাথা নাড়ে।

'ওর কাছে বাড়ির চেয়ে এখানকার স্বাদ ভালো হতে বাধ্য। আমারও বাড়ির চেয়ে ভালো লাগছে।' পরিচারিকার মুখের পানে তাকিয়ে পিতা বললেন।

'আমার বিশ্বাস তোমার ভালো লাগছে।'

'হাঁ, আমার ইতিমধ্যেই ভালো লেগেছে, ধন্যবাদ।'

হান্‌স তার রুটি আর সসেজের সঙ্গে লেমনেড পান করতে থাকে অতিদ্রুততালে, কারণ এখানে মা নেই যে সতর্ক করে দেবে। হান্‌স গিলে খায়। পিতা এবং পরিচারিকা দুজনে হাসছেন, যেন অনেক কালের চেনা।

প্লেট খালি হতে হান্‌স তার চেয়ারে এপাশ ওপাশ করে। পিতা তৃতীয় গ্লাস মদের আদেশ দিলেন, পরিচারিকার হাতটি ধরে রইলেন।

হান্‌সকে বললেন, 'তুমি বোধহয় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, একটু ফাঁকে একা বেড়িয়ে এলে কেমন হয় ?'

'হাঁ।'

বাইরে সরু গলিপথে হান্‌স বেরিয়ে পড়ল। গির্জার উঁচু প্রাচীরপ্রান্তে গিয়ে পথরোধ করেছে। দূরে চার্চের অর্গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু হান্‌স তার টুপি ভুলে এসেছে। সে সব সময়েই টুপিটা আনতে ভুল করে। সে সরু গলিটার এদিক ওদিক, সামনে পিছনে ঘোরে এবং পিতার হাসিতে সে ইতিমধ্যেই একটু লজ্জিত বোধ করছে।

হান্‌স যখন দরজা খুলল সে দেখল যে পরিচারিকা ওর পিতার পাশে বসে আছে, পরিচারিকার কাঁধে পিতার হাত পড়ে আছে। ওরা ওর দিকে পিছন করে বসে আছে। তারা বুঝতে পারল না যে হান্‌স দরজাটি খুলে আবার বন্ধ করে দিল।

ছুটি পথ যেখানে একটি চার্চের সামনে প্রকাণ্ড পার্কে গিয়ে মিশিছে সেখান থেকে যাত্রীরা বেরিয়ে এলেন। তাঁরা গান করছেন, তাঁরা পতাকা এবং ক্রস চিহ্নের নীচে ঘুরছেন। পুরোহিত এবং অন্য সব ছেলের দল পথ দেখিয়ে চলেছে। একটি দাড়িওলা লোক ক্রস বইছেন একেবারে গাছের গুঁড়ির মত চওড়া কাষ্ঠখণ্ডে নির্মিত। মার ঘরে যেমন যীশুখ্রীষ্টের ছবি আছে ক্রস কাঁধে, ঠিক সেইরকম। কুমারী মেয়েরা বাতিদান হাতে করে চলেছে, বার্চ বৃক্ষের ডাঁটা, সুগন্ধি ফুল ইত্যাদি।

যে যাত্রীরা ডান দিক থেকে এলেন, তাঁরা একটা অন্য রকমের গান করছেন। বাম দিকের যাত্রীদের থেকে ভিন্ন। ছুটি বিভিন্ন সুর এক সঙ্গে এসে মিলছে। ভেসে আসছে ঘণ্টার আওয়াজ। তোরণের উপর দুলছে তাদের ওপরকার ঢাকাটা। এই আওয়াজে গানের শব্দ একেবারে ডুবে গেছে—গির্জার দরজায় অর্গানের সুর যেন বজ্রনির্ঘোষের মত শোনাচ্ছে।

মিছিল যেখানটায় এসে এক সঙ্গে মিশল হান্‌স সেখানে একেবারে পিষ্ট হয়ে গেল। তারা দোর গোড়াটায় ওকে চাপ দিতে থাকে তার ফলে ও একেবারে চার্চের হলের ভেতর প্রবেশ করে। একবাণ্ডিল সূর্যের আলো, তার অনেকরকম রঙ, আড়াআড়িভাবে একেবারে অন্ধকারকে চিরেছে।

হাই-অলটার বা উঁচু-বেদীটা যেন মোমবাতির পাহাড়—সেগুলি সুগন্ধি ধূপের পাশে হলদে রঙের মত জল্‌জল্‌ করছে। অনেক ধর্মযাজক দাঁড়িয়ে আছেন বেদীর সিঁড়ির ধাপে। তাঁদের গায়ে শাদা এবং সোনালি পোষাক। সাদা ও লাল পোষাক পরা বেদী-বালকরা পতাকা এবং ক্রস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একধার থেকে অন্যধারে। তিনজন বয়স্ক বেদী-বালক ধুনুচি দোলাচ্ছে—তার ধোঁয়ার মেঘ যেন তুলোর চাপের মত আকৃতি নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওপরে এক খিলান বিশিষ্ট ছাদের ওপর, বৃহৎ চিত্রগুলির সামনে, সোয়ালো পাখি জানালা থেকে জানালায় উড়ে বেড়াচ্ছে, যাত্রীদের গানের দ্বারা বা আর্গানের আওয়াজে এতটুকু বিচলিত না হয়ে কিচমিচ করছে। যেন এই খিলানকরা ছাদটা বসন্তের আকাশ।

যাত্রীদের পাশের বেদীর দিকে ঠেলে দেওয়া হল, হাই-অলটার বা উঁচু-বেদীর চেয়েও অনেক বেশী মোমবাতি এদিকে জ্বলছে। বাতিগুলি নিজেদের-

উত্তাপের ভারে নুয়ে পড়ছে। হর্যেনসিয়া ফুলের নীল কুঁড়িতে এবং বেদীর কাপড়ে মোম গলে গলে পড়ছে।

মোমবাতির এই কম্পমান আলো রৌপ্য মঞ্জুষায় প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করছে। এই রুপালী আধার দিয়ে একটি সোনালী কাপড়ের চারপাশ মোড়া। মা যেমন বলেছিলেন—এই হল রক্তের চিহ্ন। সেই মাথাগুলি এখন আর বোঝা যাচ্ছে না। তবে এ এক অলৌকিক বস্ত্র। যাত্রীরা ওপর পানে তাকায়। ফলে তাদের পায়ে হোঁচট লাগছে। বেদীর সামনে তারা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে, সিঁড়ির ধাপে যেখানে ক্রস চিহ্নটি পড়ে আছে সেটি চুম্বন করে। একজন যাজক খুব জোর গলায় প্রার্থনা করেন—

'পবিত্র—অতি মূল্যবান রক্ত।'

যাত্রীরা সমবেতকণ্ঠে বলে ওঠে—'আমাদের ত্রাণ করো।'

'পবিত্র—অতি মূল্যবান রক্ত।'

যাত্রীরা বলে, 'আমাদের ত্রাণ করো।'

এই রক্ত সংযুক্ত বেদীতে ওঠার জন্য সবাই এগিয়ে যায়, ভজনালয়ের গরাদবেষ্টিত আসনের সংকীর্ণ পথ ধরে যায়। এই রকম একটি গরাদ-বেষ্টিত আসনের কাছে হান্‌স দেখল, তার মা দাঁড়িয়ে আছেন শুধু তাঁর চোখের শাদা অংশটুকু দেখা যাচ্ছে—তিনি পবিত্র পীঠস্থানের দিকে তাকিয়ে আছেন—প্রার্থনারত তাঁর ঠোঁটদুটি নড়ছে। মাকে দেখতে পেয়েছে হান্‌স তাতেই খুশী। সে গরাদবেষ্টিত স্থানটিতে ঢুকে পড়ে, একেবারে ওার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর ওঁর দৃষ্টি সে দিকে পড়ল, তিনি ওর হাত ধরে চুপিচুপি বললেন, 'প্রার্থনা করো, তোমার বাবা যেন দেবানুগ্রহ পান।'

দেবানুগ্রহ! এই বস্তুটি যে কি তা হান্‌সের জানা নেই। সে চুপিচুপি প্রার্থনা বাক্য বলে যায়, ছোটবেলায় প্রার্থনা মুখস্ত করেছে, এখানে সেই প্রার্থনা ঠিক খাপ খায় না। দু-বার প্রার্থনা করার পর, হান্‌সের মনে পড়ে তার বাবা এবং পরিচারিকার কথা। এত পাপ! বাবা শুধু মার কাঁধের ওপরই হাত রাখতে পারেন। একবার মধ্য রাতে ঘুম ভাঙার পর ও শুনতে পেয়েছিল বাবা ও মার মধ্যে বিতর্ক চলেছে।

যদি ঈশ্বরানুগ্রহে পিতা মার প্রতি সদাশয় হন তাহলে হান্‌স এই

সেবানুগ্রহের জন্য প্রার্থনা জানাবে। যাত্রীদের চিরস্থায়ী প্রার্থনা সূত্রের মাঝে সেও গলা ছেড়ে দেয়।

'আমাদের ত্রাণ করো।'

'আমাদের ত্রাণ করো।'

গির্জার সামনে সেই মধ্যদিনের আলোয় পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হান্‌সের দিকে মাথার টুপিটা এগিয়ে দিলেন; সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর সামান্য একটু টলে গেলেন।

মা বললেন, 'ও তুমি কি ঠকলে!'

পিতা বললেন, 'না, কিছুই আমি ঠকিনি। আমিও ছিলাম, আমিও শেষকালে ঠিক ঠিক আশীর্বাদ পেয়েছি।'

'তবু, আশীর্বাদটা পেয়েছ।'

গির্জার সামনের পার্কের মাঠে যাত্রীরা এতক্ষণে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। স্ত্রীলোক এবং ছেলেদের দল স্যাণ্ডউইচ কামড়াচ্ছে। পুরুষরা তাদের বীয়ারের বোতলে চুমুক দিচ্ছে। কেউ কেউ মাথার ওপর রুমাল বেঁধেছে, কেউ আবার ছাতা খুলেছে, ছাতির কালো আস্তরণের নীচে ঘুমাবার মতলব।

পিতা বললেন, 'হান্‌স নিশ্চয়ই মেলা দেখতে চাইবে।'

'এখানে একটা আবার মেলা আছে নাকি?'

'হাঁ, যাত্রীদের মেলা। তবে তার আগে মাকে কিছু খেয়ে নিতে হবে।'

মা বললেন, 'ও ভাল্লুকের মত ক্ষিধে পেয়েছে।'

সবাই হাসল এবং সকলে মিলে 'রাইখ্‌সচ্যাপফেলে' গেল, সেখানে অতিথিদের ভীড়ের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসল। পরিচারিকা এখন টেবিল থেকে টেবিলান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পিতার সঙ্গে কথা বলার এ'ন সময় নয়। ভালোই হয়েছে।

স্টলের চাঁদোয়ার ধারে সূর্য এসে পড়েছে। যে সব নর-নারী বিক্রি করছে তারা সার্ট, জ্যাকেট, দস্তানা, মোজা, টুপি, প্রভৃতির আড়ালের হলদে আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। একটা স্টল একেবারে লেসে আবৃত। একটি লোক লেসগুলি

রোদ থেকে খুলছে। লেসের ভেতর ঝুলে কর্কশগলায় মেয়েদের প্রলোভিত করছে।

পিতা বললেন, 'কিছু লেস চাই তোমার ?'

মা বললেন, 'না, ধন্যবাদ।'

অনেক সব পাত্র জড়ো করা রয়েছে, হলদে, বাদামী রঙের মাটির ডিস, কুঁজো, প্লেট, এ্যাস-ট্রে—তার ওপর চমৎকার ছবি আঁকা। ক্রেতারা পথের এপাশে ওপাশে স্টলের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দু-একটা ডিস তুলে দেখছে। পরীক্ষা করে দাম দিয়ে বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে।

পিতা বললেন, 'কয়েকটি সুন্দর ডিস কিনে নেবে ?'

মা বললেন, 'না, ধন্যবাদ।'

কতকগুলি স্টলে জপমালা রয়েছে, দেব-দেবীর ছবি, মূর্তি, ক্ষুদে সাধু-মোহান্তদের দেহাবশেষ রক্ষার পাত্র, শেষ ভোজন পাত্র ইত্যাদি। অলৌকিক বস্ত্র ত্রাণকর্তার বারোটি মূর্তিসহ তাঁদের মাথায় কণ্টক মুকুট পরিষ্কার লাল রঙে মুদ্রিত। পিতা প্রশ্ন করলেন, 'এই রকম এক টুকরো কাপড় নেবে নাকি ?'

'হাঁ, একটি, না না দুটি...একটা আনার জন্য নিতে হবে।'

'আর কিছু চাই ?'

একটা নাগরদোলা ঘুরছে।...একটা দোলানি-নৌকা দুলছে। ছেলেরা ধূসর রঙের ঘোড়ায় চড়ছে, দাঁতে লাগাম নেই। হাঁস এবং গণ্ডোলায় ভাসছে, বামন, জলপদ্ম, রঙদার দাড়ি প্রভৃতি দেখছে। বড় ছেলেরা লুপিং দি লুপ খেলছে মাথার ওপর আর চীৎকার করে বেড়াচ্ছে মেলাস্থলে, যেন তারা কারো সাহায্য প্রার্থনা করছে।

পিতা প্রশ্ন করলেন, 'একটা ঘোড়ায় চড়বে বা সুইং বোটে !'

হান্স বলল, 'একটা ধূসর ঘোড়ায় চড়ব।'

সে যতবার অতিক্রম করল ততবার জনক-জননী তার দিকে হাত নাড়লেন। অর্গান-পাইপ ধ্বনিত হচ্ছে, কাঠের সঙ্গীত-পরিচালক তাদের হাত নাড়ছে, ঘণ্টা টিং টিং করছে আর—এমনই ঘুরছে যে হাস, ঘোড়া, গণ্ডোলা, সব যেন ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

'তোমার মাথা ঘুরছে না ত' ?'

'না, একটুও না।'

ছেলেরা ভেঁপু বাজাচ্ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে, কাগজের সাপে ফুঁ দিয়ে ফোলাচ্ছে। সেগুলি বেরিয়ে আসছে, লেজের ওপরকার পালক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কফি স্টলে একশো রকমের মিষ্টান্ন পিরামিডের আকারে সোয়ানো টেবিলে সাজানো আছে।

পিতা জানতে চান, 'একটা হৃদয় আঁকা আদা-ওলা রুটি নেবে না পপি-ব্রেড?'

হানস্ বলল, 'একটা ওয়াণ্ডার ব্যাগ চাই।'

'ননসেন্স—আচ্ছা ওকে একটা দাও।' পিতা আদেশ করলেন যে মেয়েটি টেবলের পাশে বসেছিল তাকে।

মা বললেন, 'আশা করি তুমি হতাশ হবে না।'

তার ভিতর ছুটি বেবুন। রবার ব্যাণ্ড লাগান একটা টিনের রিস্ট ওয়াচ। ঘড়ির কাঁটা ডায়ালের ওপর আঁকা রয়েছে।

পিতা সময়টা দেখলেন তারপর বল্লেন, 'সাতটা—পাঁচঘণ্টা ফাস্ট যাচ্ছে তোমার ঘড়িতে। সাতটার অনেক আগেই আমরা বাড়ি পৌছে যাবো।'

মা তীর্থভূমির দিকে পিছন ফিরে তাকালেন। তারপর তোরণগুলি পাহাড়ের কোলে মিলিয়ে গেল।

মা বললেন, 'চমৎকার! মনটাকে উঁচুতে তুলে দেয়।'

সূর্যদেব এখন জরদা-হলুদ রঙের গোলক, তলার অংশটা মঙ্গলবারের রাতের ক্ষুদ্র প্রদীপের মত অন্ধকার। যেখানে পথটা দিগন্তের দিকে চলেছে যেখানে সূর্যদেব প্রলম্বিত। মনে হচ্ছে যেন পিতা সূর্যের দিকেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। শস্যক্ষেত্রের ভেতর থেকে উষ্ণ উনানের মত হাওয়া ভেসে আসছে, কিম্বা বনপথের ধারে ফার গাছের তলায় ছায়ার নীচে ইতিমধ্যেই শীতের সন্ধ্যার আবহাওয়া। শ্যাওলার স্যাঁতসেতে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আর মাঠে কুয়াশা ভাসছে।

পিতা প্রশ্ন করলেন, 'কিছু একটা পুড়ছে বোধহয়!'

তিনজনেই নাক তুলে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে, পিতা অতি মৃদুগতিতে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন যাতে পাশ ঘেঁষে যেতে পারেন।

পিতা বললেন, 'না, ও কিছু নয়।' এই বলে আবার এ্যাকসিলেটারে চাপ দিলেন।

মা পিছনে মুখ ফিরিয়ে দেখে বল্লেন, 'মাথায় টুপি দাওনি কেন ?'

হান্‌স বলল, 'আমার হাওয়াটা বেশ ভালো লাগে।'

'তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।'

বাবা দৃঢ় গলায় বললেন, 'নাও, টুপিটা এখনই পরে নাও।'

পেসাণ্টস্ ওয়ারের দরুণ যে দুর্গটা ধ্বংস হয়েছিল সেটা এখন অন্যধারে পড়ল। এবার যাত্রা দ্রুততর, কারণ সব কিছুই বেশ পরিচিত।

মা বললেন, 'আস্তে আস্তে চালাও, আমাদের এত তাড়া কিসের, আনার রান্নার সব কিছু বন্দোবস্ত করে দিয়ে এসেছি।'

পিতা বললেন, 'রাতের খানার ঠিক আগেই আমরা পৌছাব। কিছু ভালোমন্দ রান্নার আছে নাকি ?'

'মাংস আছে আর স্যালাড।

পিতা বললেন, 'আশাকরি পুড়িয়ে নষ্ট করবে না।'

সূর্যের চাকা অতি দ্রুত ডুবে যাচ্ছে—বাক্সে যে আকারের মুদ্রা ডুবে যায় সূর্যের সেই আকৃতি এখন। পরিষ্কার সবুজ-নীল আকাশে চাঁদ উঠে পড়েছে। যেন প্রকাণ্ড সাদা বরফ, এই বরফের আধখানা সূর্যদেব গলিয়ে দিয়েছেন।

গাড়িটা যখন পাহাড়ের ওপর উঠছে তখন র‍্যাডিয়েটার থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। পিতা লাফিয়ে নামলেন—র‍্যাডিয়েটারের ঢাকা টেনে খুললেন। একটা আগুনের শিখা ওপরে লাফিয়ে উঠল।

তিনি চীৎকার করে ওঠেন, 'বেরিয়ে পড়ো! তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো।'

মা এবং হান্‌স-এ ওর ঘাড়ে পড়ে গেলেন খানার ভেতর। ওপরে দুটি পর পর জোর আওয়াজ হল আর পিছনে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

র‍্যাডিয়েটার আগুনের মধ্যে জ্বলছে। তেল আর পেট্রল চাকায় এসে পড়ছে। রাস্তার ওপর ভিজা জিভের স্পর্শ লাগছে—রাস্তা আর আগুনের শিখা ওদের পিছনে লাফিয়ে উঠছে—তারপর গ্রাস করল।

মা বাবাকে ডেকে বললেন, 'আমরা কি করব ?'

তিনি তাঁর হাত দুটি ওপরে তুললেন, তারপর ধীরে ধীরে সেই হাত নীচে নামালেন। বললেন, 'আমরা আর কি করব, কিছুই করার নেই। কাছাকাছি কোথাও জল নেই, আর যদিও থাকত তাহলেও বেশ দেরী হয়ে গেছে। পেট্রল ট্যাংক বিস্ফোরিত।'

মা শোকাকুল কণ্ঠে বললেন, 'হা, ভগবান!'

পিতা বললেন, 'আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে পারি। ভারী চমৎকার জ্বলছে। কেমন হান্‌স, তাই না?'

হলদে আর বাদামী আগুনের শিখা। শরৎকালের ঘাসের আগুনের মত উত্তপ্ত।

জানালার ভেতর ফাটতে লাগল তারপর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল—প্রথম আগুনের ফুলকি গাড়ির বসবার আসনে ছড়িয়ে পড়ল।

মা বললেন, 'ভারী চমৎকার কাপড়ে মোড়া ছিল সীটগুলি।,

পিতা বললেন, 'আমি একটা নতুন গাড়ি কিনে নেব।,

মা বললেন, 'কিন্তু এখন বাড়ি ফিরব কি করে? এখনই অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'এই পথে কোনো কিছু এলে কেউ না কেউ ঠিক আমাদের তুলে নেবে।'

পিতা গাড়িটার চারপাশে ঘুরলেন। তিনি হাসলেন। বললেন, 'এখন আমরা সত্যিকার তীর্থযাত্রী হব!'

পিতা মার পাশটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন।

পিতা যখন আবার অন্যদিকে গেলেন তখন মা হান্‌সকে কোমল গলায় বললেন, 'উনি কোনো গালমন্দ করছেন না। এ হল তীর্থযাত্রার ফল। দেবানুগ্রহ।'

স্টুডিও পার্টি

উলফগাঙ হিলডেসাইমার

প্রেরক—প্রেমহীন ?

সুরকাম্ফ ভেরলাগ

কিছুকাল ধরে আমার সংলগ্ন ফ্লাটের স্টুডিয়োতে একটা হৈ-হট্টগোলের পার্টি বসছে। আমি এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছি এবং এই গোলমাল এখন আর আমাকে তেমন বিরক্ত করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন একটা উদ্দাম অবস্থায় একেবারে উদারা, মুদারা, তারায় পৌছায় যে আমাকে বাধ্য হয়ে বাড়িওলার কাছে নালিশ করতে হয়। বহুবার এইরকম করার পর, একদিন সন্ধ্যায়, তিনি নিজেই এলেন গোলমালের তদারক করতে। কিন্তু যা বরাবর ঘটে, ঠিক সেই সময়টাতেই সব ঠাণ্ডা, ফলে বাড়িওলা আমার অভিযোগ ভিত্তিহীন মনে করলেন। আমার আশা ছিল যে হয়ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে এই অসহনীয় পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। আমি তাই পোষাকের আলমারিটা খুলে ভেতরকার একটা ফুটো দিয়ে দেখতে বললাম। আমার এই পোষাকের আলমারির গর্তটা জাহাজের একটা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের বুলস-আই এর মত বড়। তিনি তার ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন। কিন্তু তিনি পোষাকের আলমারির ভেতর থেকে বেরিয়ে বিড় বিড় করে যা বললেন—তা এক রকম স্বীকৃতি। তারপর তিনি চলে গেলেন আর আমি যখন কয়েক ঘণ্টা পরে গর্তের ভিতর দিয়ে দেখলাম অর্থাৎ সেই হট্টগোল যখন আবার কর্ণবধিরকারী হয়ে উঠেছে বাড়িওলা নিজেই পার্টির আমেজে মশগুল হয়ে পড়লেন।

সামান্য অস্বস্তিভরে আমি আমার বসার ঘরে যথারীতি পায়চারি করতে লাগলাম। এই অবস্থায় বরাবর তাই করি। আমার আসবাবপত্রের বেয়াড়া সন্নিবেশের ফলে অবশ্য আমার এই পদচারণায় বাধা পড়ে। সামান্য ধাক্কায় কাটা কাচের পাত্র গিয়ে লাগে চিনেমাটির আলমারিতে। টিকের টেবিলটা সামান্য মাত্র ধাক্কায় উলটিয়ে যায়, অথচ আমি সিগারেটের প্যাকেটের ঠেকো

দিয়ে রাখি। এই যেন তার কাজ। শেষ পর্যন্ত পিকাসোর 'ব্লু-ইয়ুথ' ছবিটার একটা মুদ্রিত কপির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। কি চমৎকার! মূল ছবির সঙ্গে কত নিখুঁত প্রতিলিপি। আমাদের আধুনিক মুদ্রণশিল্প কত উন্নত! এই জাতীয় বিরক্তিকর ঘটনার পর আমি এই এবং আরো কিছু কৌশল করি আমার চিন্তাটাকে অন্যখাতে চালিত করার জন্য। তারপর একেবারে ঠাণ্ডা না হলেও কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে আমার রেফ্রিজারেটারের ভেতর থেকে একগ্লাস ঠাণ্ডা পিপারমেণ্ট চা পান করি—এইসব সময়, একটা চমৎকার পানীয়। প্রতিটি চুমুকেই অনুভব করি আমার অন্তরের ধিক্কারস্পৃহাটা একবারে জয় করেছি। তারপর আমি সচরাচর অবশ্য সব দিন নয়, পেসেন্স খেলতে বসি।

ব্যাপারটি এই যে আমি দীর্ঘদিন এই ফ্লাটটি আমার নিজস্ব বলে মনে করি। এই ফ্লাটের দৈনন্দিন রুটিন কিন্তু আমি এটা নেওয়ার পর অতি সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। এসব হল এই ফ্লাটের আসবাবপত্র এবং ব্যবস্থাদির অঙ্গ বিশেষ। আবহাওয়া, বসবাসকারীদের আচার ব্যবহার এবং আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে কোনো একটা অফিসে যাই, কিন্তু আমার মনোবলের অভাবে এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। যাই হোক কি ধরনের অফিস এটা সে বিষয়ে আমার কোনো ধারনাই নেই। তবে যাই হোক এখনও প্রতি সন্ধ্যায় এসব ঘটনা, ঠিক ঠিক না হলেও, অন্ততঃ আমি মাঝে মাঝে আপনাকে তাই বলে প্রবোধ দিই—

আমি ঐ গর্তের ভিতর দিয়ে এখন খুব কমই দেখি, আমি লক্ষ্য করি যে অপর পক্ষের লোকজন পরিবর্তিত হয়। গোড়ার দিকে যেসব অতিথিরা ছিলেন তাঁরা সবাই চলে গেছেন, তাঁদের জায়গায় অন্য কারা এসেছে। কিছু প্রকৃতপক্ষে মনে হয় যেন দ্বিগুণিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবি বেনরাখের কথা ধরা যাক। যাঁকে আমি নিয়তই মনে করি যে একত্রে দু'জায়গায় তাঁকে দেখি—একটা বিস্ময়কর, প্রায় স্বেচ্ছাকৃত চোখের ধাঁধা! আমি লক্ষ্য করি যে গারদে স্টেয়ার তাঁর চুল রঞ্জিত করেছেন—সম্ভবতঃ যে রঞ্জকটা একদা আমারই ছিল তাই দিয়ে। হোলডোরফ্ মহিলাটি, যাঁকে আমি গত আট বছর আগে মেরী স্টুয়াটের ভূমিকায় দেখেছি (প্রসঙ্গত বলা যায় এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি) তাঁকে আমি ঠিক চিনতে পারি। ফ্রাউ ফন্ হারগেনবাথ চলে গেছেন—হয়ত ইতিমধ্যে মারাই

গেছেন, কে জানে? কিন্তু গ্লেৎসিয়ার এখনও ঠিক আছে, সব সময়েই আছে।

সে ওখানে সেই অপরাহ্ণেও ছিল যখন স্টুডিয়োটা আমার ছিল। এ দীর্ঘ বন্ধ্যাকালের পর আমি আবার ছবি আঁকতে সুরু করি। সে কয়েকটি ভাঙা জালানার কাঁচ আঁটছিল। আমার স্ত্রী পাশের কামরায় ঘুমাচ্ছিলেন, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার সে মনের অবস্থা এখনও স্মরণে আছে। কয়েক সপ্তাহ চেষ্টার পর আমার প্রেরণাটার সন্ধান পেয়েছি মনে করে আমি আমার রঙ মিশিয়ে নিচ্ছিলাম এবং পেন্টের উৎকট গন্ধ উপভোগ করছিলাম।

গ্লেৎসিয়ার শীতল নিস্পৃহভাবে আমার দিকে তাকাল। সে আমাকে বিরক্ত করবে না অন্ততঃ আমি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি যেই ইজেলে আমার ক্যানভাসটা চড়িয়েছি সে বলে উঠল ঃ

'আমিও ছবি আঁকি।'

আমি শীতল কণ্ঠে বললাম, 'ও'। সেই সঙ্গে 'ইয়েস' কথাটাও যোগ করা যেত, যাই হোক আমার মন্তব্যটুকু মাত্র একটি শব্দের ছিল।

উৎসাহিত হয়ে সে বলে ওঠে, 'হাঁ, আমি তেলরঙে পাহাড়ের ছবি আঁকি? তবে এইসবের মত এতটা আধুনিক নয়। আধুনিকতায় তোমরা জানো কোথায় গিয়ে উঠতে হবে। আমি যা দেখি তাই আঁকি।'

একজন অপেশাদার শিল্পীর অগ্রাসী অধিকারী মনোভাব নিয়ে সে কথা বলে যায়।

'তুমি কি নিসর্গচিত্রকর লাইনার টারাইডারের নাম শুনেছ? আমি তাঁর ধরনে ছবি আঁকি।'

আমি বললাম আমি এই নিসর্গচিত্রকরকে জানি না। আমি কাজে হাত দেওয়া স্থগিত রাখলাম গ্লাৎসিয়ার না যাওয়া পর্যন্ত। এই ছুরির প্রান্ত ঘেঁসা প্রেরণার সঙ্গে আমি এতই পরিচিত যে যদি আমি আমার বিরক্তির বলগা মুক্ত রাখি তাহলে আমার ছবির সামগ্রিক আকৃতি একেবারে ঝাপসা হয়ে যাবে। আমি একটা আরাম কেদারায় বসে পড়লাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে আসন্ন সৃষ্টির ধীরে ধীরে লালন করতে লাগলাম—তাকে কোনোরকম আঘাত থেকে মুক্ত রাখাই আমার বাসনা।

কিন্তু গ্লাৎসিয়ার তার কাজ শেষ করার আগেই এসে হাজির হলেন ফ্রাউ

ফন্ হারগেনরাথ। আমি আমার চিন্তার গতিরোধ করলাম, এবং একটা পরিতাপের দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখলাম। শান্ত থাকাটাই আসল, উনি একজন ধনী পৃষ্ঠপোষক, আমার এই পোষকতা বাবদ তাঁর অবদান বড কম নয়। প্রতিদিনের রুটির পর তবে আর্ট যে কোনো সংকীর্ণমনা ফিলিস্টিনই একথা স্বীকার করবে।

আমাকে যেন ছবির ভেতর খুঁজছেন এমনই ভঙ্গী নিয়ে মহান আত্মা বললেন—'এলাম, তোমাদের সব কেমন চলছে দেখার জন্য। শুনলাম নাকি তোমার এখন বন্ধ্যাকাল চলেছে।'

এখন অবশ্য কলালক্ষ্মীব আমার প্রতি বিদ্বেষদুষ্ট আচবণেব কথা ফ্রাউ ফন হারগেনরাথের সঙ্গে আলোচনা করাব এতটুকু বাসনা ছিল না। তাই তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'আমাব সৃজনীশক্তি আমাব সম্পূর্ণ আযত্তাধীন'— তাবপর ইঙ্গিত করে ঘরভর্তি ছবিগুলি দেখালাম প্রমাণ হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে, ছবিগুলি পুরাতন এবং ফ্রাউ ফন্ হাবগেনবাথ ইতিমধ্যে অনেকবাব সেগুলি দেখেছেন কিন্তু ওর দুর্বল স্মৃতিশক্তিব ওপব আমি নির্ভব কবতে পাবি। সত্যি তিনি ছবিগুলি স্মবণ কবতে পাবেননি এবং আবাব নতুন কবে সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর আগেকাব যে মন্তব্য আমাব স্মবণে আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা তিনি বলে গেলেন। এই অবস্থায় যেমন হয়, আমি অতিশয় অস্বস্তিবোধ করেও তার কথা শুনতে থাকি গ্রেৎসিযাব অন্ততঃ এখন কথা বলা থামিয়েছে। সে এখন নীববে সেই জানলাব কাঁটা ঠুকছে। লক্ষ্য করলাম, বৃষ্টি থেমে গেছে। সময় স্থিব হয়ে দাঁড়িয়ে।

এই তন্দ্রাচ্ছন্ন অপরাহ্নের শান্তি কিন্তু বিঘ্নিত হল যখন এনগেলহাবড সহসা এসে ঘরে প্রবেশ করল। এনগেলহারড হল অসহনীয় সামাজিক প্রাণী, মারাত্মক তার হৃদ্যতা, কিন্তু তার ওপব রাগ করাও যায় না, নর্মাণ্ডীব চীজ কামেন্‌বার্টের মত তার ওপরকার কঠিন আবরণেব ভেতর আছে কোমলতা— আর শেষ পর্যন্ত সেই কারণেই সে অসহনীয় হয়ে ওঠে। শুধু সে নয়, আমার আশংকা কোন সময় সে আমার পীঠে চড মেরে বসবে। সে ফ্রাউ ফন্ হারগেনরাথের হস্ত চুম্বন করল, তারপর আমাব দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সেই কাঁধচাপড়ানি কর্মে প্রবৃত্ত হল—আর অনেকটা 'ওল্ড বয়' জাতীয় কি বলতে লাগল। তারপর সে প্রশ্ন করে, 'আজকাল আর্টেব অবস্থা কি!'

আমি বললাম, 'ও, সে ঠিকই বলছে।' এক একজনকে আমি এ বিষয়ে এক এক রকম জবাব দিই এই জাতীয় প্রশ্নে। আমি কোনোদিন আমার জবাবকে সংক্ষিপ্ত আবার বিস্তারিত করার চেষ্টা করিনি, কারণ, তার প্রয়োজন নেই। আমার প্রশ্নকর্তারাও সর্বদাই এই জাতীয় ধরি মাছ না ছুঁই পানি উত্তরে সন্তুষ্ট।

ফ্রাউ ফন্ হারগেনরাথ তখন আমার গোড়ার দিককার অপেক্ষাকৃত দুর্বল কয়েকটি ছবি দেখছিলেন, তার গায়ে গা ঘেঁসে হতভাগা বলে উঠল, 'আমার ত' বোধ হচ্ছে, যে তোমার কলালক্ষ্মীর আলিঙ্গনটা বড় নিবিড় হয়ে উঠেছে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। এর জন্য এখনই উৎসব করা প্রয়োজন।'

সে নিজের কোটের পকেট থেকে একটা ব্রাণ্ডির বোতল বার করল। ওর এক আশ্চর্য ক্ষমতা জীবনের যা একমাত্র লক্ষ্য তা পরিপূরণ করতে পারে—সে বস্তু হল উৎসবের আমেজ।

ফ্রাউ ফন হারগেনরাথকে উদ্দেশ করে সে বলে, 'হতভাগার বেশ প্রতিভা আছে বলা যায়, কেমন তাই না?' ও আমাকে উদ্দেশ করেই বলল কথাটা। আমি গ্লাসের সন্ধান করছিলাম, তাই দেখতে পেলাম না যে ও বরাবর যেমন করে থাকে এইরকম একটা মন্তব্য করলে তা করল কিনা। এইসব ক্ষেত্রে ও পাঁজরায় টুস্কি মেরে কথা বলে।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার স্ত্রী এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ছিপি খোলার শব্দ শুনলে সব সময়েই ওঁর ঘুম ভেঙে যায়—এমন কি অনেক দূরে থাকলেও, রান্নাঘরের এলার্ম ঘড়ি হার মানলেও, ছিপি খোলার শব্দ সর্বদাই সফল। উনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সবাইকে অভিনন্দিত করলেন একটু বিব্রত ভঙ্গীতে। আমার কেমন মনে হয়, আমাকে ছাড়া উনি আর কাউকেই ঠিক চিনতে পারেন না। মধ্যাহ্ন নিদ্রার পর ঠিক মেজাজে ফিরে আসতে বরাবরই তাঁর একটু অসুবিধা হয় তবে দু-এক বোতল ব্র্যাণ্ডি তাঁকে তাঁর সঠিক জীবনাদর্শে ফিরিয়ে আনে। অবশ্য এই আদর্শ মাঝে মাঝে অস্থিরচিত্ততার পরিচায়ক হয়ে ওঠে।

এনগেলহারড তাঁকে একটু বেশী পরিমাণেই ধরে দেয়। তারপর সে ফ্রাউ ফন হারগেনরাথকে দেওয়ার উদ্যোগ করে। কিন্তু তিনি তাঁর গ্লাসটায় হাত চাপা দিয়ে বল্লেন তিনি দিনের বেলায় এইরকম সময়ে কখনই পান করেন না।

অবশ্য এই মন্তব্য আমাকে লক্ষ্য করে এবং তার অর্থ এই যে যাঁর দানগ্রাহীরা প্রকাশ্য দিবালোকে এই জাতীয় কাণ্ড করে তাদের দিকে চোখ রাখা প্রয়োজন। কিন্তু এত সব সুসংস্কৃত ইঙ্গিত এনগেলহারড ধরতে পারে না। কিন্তু এই সরস অনুরোধ ব্যাপারে সে এতই সিদ্ধহস্ত যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আধ গ্লাস গ্রহণ করতে সে বাধ্য করে। কিন্তু এই যে ছুঁচ প্রবেশ করল সেটি ফাল হয়ে উঠল, —মহিলার সব কিছু শুভ ইচ্ছা হাওয়ায় উড়ে গেল এবং তিনি একেবারে যাকে বলে মাছের মত পান করতে শুরু করলেন।

দুঃখের বিষয় গ্লেৎসিয়ারকে দু-এক ফোঁটা দেওয়ার ব্যাপারে আমি এনগেলহারডকে বাধা দিতে পারিনি। সে নিরর্থকভাবে কেবল পেরেক ঠুকে চলেছে, অথচ একাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ওর এসব ভালো লাগে। এখন এনগেলহারডের আমন্ত্রণে ও টেবিলে এসে বসল, বলল, 'তা একটু খেতে আমার আপত্তি নেই।' তারপর সমস্ত মদটা একেবারে চোঁ করে (এর চেয়ে কোনো ভালো কথা আর বলা যায় না) গলায় ঢেলে দিল।

আমাদের দলে এসে বসার যৌক্তিকতার প্রমাণ দিতেই যেন ও বলল, 'আমিও ছবি আঁকি।'

এনগেলহারড বোকার মত প্রশ্ন করে, 'কে আঁকে না বলুন?' কিন্তু একথার কি যে উত্তর দেবে তা ভেবে না পেয়ে গ্লেৎসিয়ার আমার স্ত্রীর সঙ্গে একতরফা আর্ট সম্পর্কে আলোচনা সুরু করে দেয়।

তারপর এইভাবে আমরা যখন বসে আছি তখন দরজা খুলে গেল এবং দুজন—সম্ভবতঃ বিবাহিত দম্পতি ঘরে এলেন। সুরাপানের ফলে আমার স্ত্রী গৃহকর্ত্রী হিসাবে তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছেন বলে আমিই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের সময়োচিত ভঙ্গীতে সম্বর্ধিত করি। ওঁরা নিজেদের পরিচয় দিলেন, আমি তাঁর নামটা ঠিকমত শুনতে পেলাম না। প্রথমবার পরিচয় প্রদানকালে আমি কারো নামই ঠিকমত ধরতে পারি না, প্রতিটি নামই আমাকে ঠিক অসতর্ক অবস্থায় পাকড়াও করে। তিনি বললেন যে পারী থেকে আঁবেয়ারতিনের কাছ থেকে তিনি আমার জন্য শুভেচ্ছা এনেছেন।

আমি বললাম, 'ও আঁবেয়ারতিন?' তারপর মাথা নাড়লাম যেন তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত জীবনের কথা এখনও আমার স্মরণে আছে। প্রকৃতপক্ষে আমি কখনও তাঁর নামই শুনিনি। আমি দম্পতিকে কয়েকটি স্বরবর্ণ উচ্চারণ

করে আমার স্ত্রী এবং আর সবায়ের সঙ্গে পরিচিত করে দিলাম, এই শব্দগুলি যেন ওঁদের নামের সঙ্গে শুনেছি মনে করলাম, এবং বিশেষ করে আঁবেয়ার-তিনের শুভেচ্ছার ওপর জোর দিলাম—কিন্তু তাঁর নাম কারো মনের সঙ্গে কোনো সংযোগই স্মরণে আনতে পারল না। আমার স্ত্রী কয়েকটা গ্লাস জোগাড় করে আনলেন। এনগেলহারড তার অপর পকেট থেকে আর একটি বোতল বার করল, আর দম্পতি অচিরাৎ একেবারে আমাদের সঙ্গে মিশে গেলেন।

যে কোনো কারণেই হোক অবস্থাটা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। প্রথমতঃ এই গ্লেৎসিয়ারের আকৃতিতেই আমার বিরক্তি বোধ, সে ফ্রাউ ফন হারগেন-রাথের হাতে হাত রেখে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে সে যা দেখে তাই আঁকে। উনি অবশ্য শুনছেন না, কিন্তু কোমল কণ্ঠে নিজে নিজেই গুন গুন করছেন। দ্বিতীয়তঃ আমাকে কেমন একটা বিরতিবিহীন অবসাদ গ্রাস করেছিল। আমার মনোগত ছবিটির কল্পনা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে আর কলালক্ষ্মী মুখে আঁচল চেপে পলাতকা। যাওয়ার সময় শুধু টারপিনের মায়াময় সৌরভ ছাড়া আর কিছুই রেখে জাননি। আমি সেই দুজন অপরিচিতের দিকে তাকালাম, ওরা দুজনেই সিগার টানছেন। দুজনে বেশ খুশী খুশী মনে। স্ত্রীটি আমার স্ত্রীকে তখন বলছেন যে আঁবেয়ারতিন সম্প্রতি রু মারবোয় উঠে গেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এখনও তাঁর সেই পুরাতন বদ অভ্যাসের ক্রীতদাস হয়ে আছেন। মহিলাটির মুখভংগী দেখে মনে হয় সেই অভ্যাস নিশ্চয়ই গঞ্জিকা জাতীয় নেশার চাইতেও কিছু নিকৃষ্ট বস্তু।

ইতিমধ্যে এনগেলহারড, যিনি এই পরিস্থিতির অধিপতি, আরো কয়েকজনকে টেলিফোনে ডেকেছে (এই পদ্ধতির সে নামকরণ করেছে ডাক পিটিয়ে ডাকা)—আর বলেছে যে আমার বাসভবনে একটা পার্টি চলছে। সে তাঁদের আত্মীয় স্বজন সহ সবান্ধব আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তা নয় তাদের সকলকে সঙ্গে যথাসম্ভব উগ্রবস্তুপূর্ণ বোতলও আনতে বলেছে। গ্লেৎসিয়ারকেও অনুরূপ কর্ম থেকে বিরত রাখতে আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। আমি তার পিঠে একটা টোকা দিয়ে বললাম যদি অনেক লোকের আগমন হয় তাহলে আমরা পরস্পরের সাহাচর্যের সুখ থেকে বঞ্চিত হব। আমি জোর দিয়ে বললাম যে কোনো পার্টির প্রাণবস্তু হল আলাপাচার। আশ্চর্য, সে আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করল।

প্রথমেই এলেন গারদে স্টোয়ের, তার দুপাশে দুজন বয়স্ক ব্যক্তি, একেবারে ছিমছাম, ভদ্রগোছের, যেন একেবারে আজন্ম রক্ষণকর্তা। তাঁরা বেশ বিস্ময়-মণ্ডিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালেন, কিন্তু যখন তাঁদের সঙ্গিনীটি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একেবারে বালখিল্যের আলাপ সুরু করলেন তখন তাঁরা পরস্পরের দিকে সস্মিত ভঙ্গীতে তাকালেন, তারপর যে পালা এল সে আর থামায় এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই।

তারপর কলরবমুখর অতিথিদের দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হাজির হতে লাগলেন, প্রত্যেকের বগলে একটি বা দুটি বোতল। আমি ওদের দু-একজনকে জানতাম যেমন ভেরা এরবসাম, একেবারে প্রাণের বন্ধু? আমার স্ত্রীর শত্রু। সে বরাবর আমার দিকে চোখ টিপত, শেষকালে আমি একদিন বাধ্য হয়ে বললাম যে আমার বাবার ডেবরিৎসবুর্গে একটা স্টীম বেকারী আছে—সেই থেকে সে আমাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে।

যাই হোক সে এখন এখানে উপস্থিত এবং একটি ছোকরাকে সঙ্গে এনেছে যাঁকে আমিও ওপর ওপর চিনি, তিনি একজন এসেসর না ঐরকম কি একটা, যাই হোক একই ব্যাপার। লোকটিকে কারো যেন বাগদত্ত গোছের দেখাচ্ছে, হয়ত এই মেয়েটারই। তারপর একজোড়া রহস্যজনক উৎপত্তির চিত্র তারকা নাম দ্য পোলানি। নিশ্চয়ই এটা ওদের প্রকৃত নাম নয় যেমন তারা প্রকৃত পক্ষে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নয়। আমি একবার স্ত্রীর ছবি এঁকেছিলাম তখন চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলেছিল। আমি শুনতে পেলাম এগেলহারড (ইতিমধ্যে সেই গৃহস্বামীর কাজ গ্রহণ করে নিয়েছে), ফ্রাউ দ্য পোলানিকে 'ডার্লিং বলে সম্বোধন করছে, এতদ্বারা যে সমাজে সে বুক ফুলিয়ে বিচরণ করে সেই জগতের পরিমণ্ডলকে সে বেশ কিছু পরিমাণে বাড়িয়ে নিচ্ছে।

আর সব অতিথিদের ব্যক্তিগত পরিচয় দান অনাবশ্যক। এই বাতাবরণের প্রতি সুবিচারের মনোভাব নিয়ে বলতে পারি যে রাত বাড়ার সঙ্গেই অতিথি-দের জনতা বেশ একপ্রাণ একমন হয়ে উঠেছিল, মাঝে মাঝে সাদা চোখে যাঁরা এসে যোগ দিচ্ছিলেন তাঁদেরও তৎক্ষণাৎ পরিচয়হীনতায় ডুবতে বেশী সময় লাগছিল না।

আমার কাছাকাছি বসে থাকা একজন তরুণ সহযোগীকে বলতে শুনলাম, 'জীবনটাই একটা স্টুডিয়ো পার্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়।'

তাঁর পাশেই যে দাড়িওলা ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি বলে উঠলেন, 'জীবনটা একটা স্টুডিয়ো পার্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়।' তিনি একজন কলা সমালোচক মুখে মুখে সংজ্ঞা রচনার জন্য তিনি খ্যাতিমান। হঠাৎ আমার মনে হল তাঁকে সেই রাতে আমি ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম—তিনি কিন্তু এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। উনি চিন্তাকুলভাবে ওঁর গ্লাসটি নিয়ে স্মিতমুখে কি ভাবছেন আর জুতার অগ্রভাগ দিয়ে ভূপতিত বর্তুলাকার স্মিট হলওয়েগের দেহটায় বার বার আঘাত করেছেন, সে সুরাপান-জনিত অচেতন অবস্থায় বিরাট দেহ নিয়ে পড়ে আছে। লোকটি একজন ভাস্বর, তিনি তার কাজটির মধ্যে একটা বেদনাদায়ক হতাশা জড়িয়ে রেখেছেন যেটি তিনি সুরাজড়িত ভারী গলায় প্রকাশ করছেন। পানপাত্র হাতে র‍্যাবেলাই-এর মত ওকে অনেকটা দেখতে হয়েছে।

মধ্যরাত্রের ঠিক আগে আমি একেবারে দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেছি, প্রকৃতপক্ষে আমার মুখটা দেওয়ালের দিকেই। একটি মাতোয়ালা মিছিল আমার সামনে দিয়ে ওয়ালট্জ নাচ নাচতে নাচতে চলে গেল আর আমার পক্ষে আমার নিজের ছবির দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে দেখতে কি বসতে পারা অসম্ভব হয়ে উঠল। এই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন পরিস্থিতিতে আমি আমার ঠিক পাশের লোকটির পকেটে একটি হাতুড়ির সন্ধান পেলাম। সে হল শ্লেৎসিয়ার। আমি উদ্গার করে বলে উঠলাম, 'ওটা একটু ধাব নিতে পারি?' অবশ্য তখন কোনোরূপ ভদ্রতা দেখানোর মানেই হয় না, কারণ আমাদের কেউ কারো কথা শুনতে পাওয়ার মতই অবস্থা নয়। আমি ওর পকেট থেকে হাতুড়িটা তুলে নিয়ে দেওয়ালে মারতে লাগলাম।

আমার হাতটা বেশী দূরে চালাতে পারলাম না, অতিথিদের কারো আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কাজটি বেশ পরিশ্রমসাধ্য এবং একঘেয়ে লাগতে লাগল। প্রথমটায় বালিকাজ·বেশ মিহি গুঁড়ো হয়ে আসতে লাগল তারপর সিমেন্ট বেশ নড়বড়ে হয়ে এল এবং পড়ে গেল, তারপর বালি আর রাবিশ আমার পায়ের কাছে পাহাড় হয়ে জমল। আমার পিছনকার পার্টি তখন চূড়ান্ত শিখরে উঠেছে মনে হয়, কিন্তু আমার গ্রাহ্যই নেই। এই মাতালের হট্টগোল অতিক্রম করে আমি ঠিক আমার উলটো দিকের কোণের এক রমণীকে অশ্লীল গান করতে শুনলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্য আমার কাছে

এই ব্যাপার অতিশয় ক্লেশদায়ক মনে হত, কারণ ফ্রাউ ফন হারগেনরাথ রয়েছেন, কিন্তু এখন আমি স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি তাই আমি সেদিকে মাথা ঘামাই না। যাই হোক অচিরেই বুঝতে পারলাম এই কণ্ঠস্বর ফ্রাউ ফন হারগেনরাথের। তাঁর দেখছি অনেক গুণ, যা আমি কোনোদিন মনে ভাবিনি। নি:সংশয়ে এইসব জিনিষ তখনই উৎসারিত হয় যখন তিনি কিঞ্চিৎ স্তম্ভনহীন।

গর্তটা ক্রমশঃই বৃহত্তর হতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে আমি দেয়ালের ভেতরে বেশ গোলাকার গর্ত করে একফালি আলোর সাহায্যে আমার প্রতি-বেশীর শয়নকক্ষে কি হচ্ছে দেখতে পাই। ওদের নাম গিসেলভিচ, আমার মনে হয়, এককালে যেমন ছিল ওরা আজো তেমনই আমার প্রতিবেশী হয়ে আছে। ওঁরা দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক এবং বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার। কিন্তু এই শেষোক্ত সদ্‌গুণ এখন কিঞ্চিত ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে বিশেষ করে ওদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে—যেটা অবশ্য আমি স্বীকার করি আমারই দোষ।

ওরা দুজনেই বিছানায় বসে আছেন, আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে বেশ সবিস্ময়ে অভিবাদন জানালেন কোনোরূপ মিত্রহীনতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে, আমাকে বলতেই হবে যে ওঁরা এমন এক প্রকার আস্‌কারা আমাকে দিলেন যা সাধারণতঃ আমাদের মত আর্টিস্টরা সহ-নাগরিকদের কাছে পায় না, বিশেষতঃ এই জাতীয় অস্বাভাবিক অবস্থায়। হয়ত, ঘুম:ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা ওঁদের আধুনিক মনোভঙ্গী সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। আমি এমনই বিব্রত বোধ করলাম যে ওঁদের সংক্ষেপে প্রত্যাভিবাদন করে এইভাবেই হাতুড়ি পিটতে লাগলাম এবং তার ফলে গর্তটার এই বর্তমান আকার হয়েছে। তারপর আমি কিঞ্চিৎ বেয়াড়াভাবে প্রশ্ন করলাম—'আরো একটু কাছে আসতে পারি কি?' তারপর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই একেবারে গলে ভেতরে চলে গেলাম। এই নৈশ আবির্ভাবকে নেহাৎ আনাড়ির মত না রেখে আমি কাঁধ থেকে সিমেণ্ট ধুলো বালি হাত দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে আমি বললাম: 'এত অধিক রাত্রে আপনাদের এইভাবে বিরক্ত করার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন—আমার স্টুডিয়োতে একটা পার্টি চলছে তাতে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।' তারপর একটু থেমে বললাম, 'ভারী মজার পার্টি।'

গিসেলভিচ দম্পতি পরস্পরের দিকে তাকালেন, সেই প্রতিক্রিয়া দেখে আমার মনে হল যে আমার প্রস্তাবটি বিবেচনাযোগ্য মনে হয়েছে। আমি আর একবার কিছু বলার উদ্যোগ করছি এমন সময় হের গিসেলভিচ কিঞ্চিৎ বিতৃষ্ণাজনক হাসি হেসে বললেন যে এই নিমন্ত্রণের অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ তবে আধুনিক মনোভঙ্গী সত্ত্বেও তাঁদের মত বিবাহিত দম্পতির এই বয়সে যে মানুষদের একমাত্র লক্ষ্য হল আর্ট এবং যা তাঁদের সাধারণ শেষ পরিণতি গিসেলভিচ দম্পতিরা সেই জীবনাদর্শে অংশভাগী হতে চান না। আমি বললাম, কিন্তু আর যে কোনো প্রাণী অপেক্ষা আর্টিস্টই মানুষকে অচিরাৎ আপন করে নিতে পারে। যাই হোক, আমার ঘরে এই মুহূর্তে এক ঝাঁক অতিশয় চটকদার অতিথি উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পৃষ্ঠপোষক থেকে সুরু করে সামান্য কারিগরও উপস্থিত। সেই রাত্রে আমার জীবনে সর্বপ্রথম আমি এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা শক্তির পরিচয় দিয়েছিলাম যার ফলে গিসেলভিচরা শেষ পর্যন্ত এই পার্টি সম্পর্কে উৎসাহিত বোধ করলেন। প্রথমটা আমিই তাঁদের পোষাক-আশাক না পরে নাইট-ড্রেসেই হাজির হতে বললাম। বললাম আর সবাই অঙ্গে সামান্যতম আবরণী রেখেছেন। একথা একেবারেই মিথ্যা, কিন্তু একা থাকার একটা বাসনা আমার মনে ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠছিল।

ওঁরা বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হের গিসেলভিচ একটা স্ট্রাইপদার পাজামা পরেছিলেন আর মহিলার অঙ্গে নাইটি (রাত্রিবাস)। উনি তাঁর অঙ্গে হাউস কোট পরিয়ে দিলেন যেন একটা সাঁঝের আবরণ আর শ্রীমতী যখন টেবিল আয়নায় মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন উনি একরকম বর্ধমান অস্বস্তিভরে ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। এইভাবে আমি ওদের উৎসাহ প্রজ্জ্বলিত করলাম, আমি পরে আপনাকেই প্রশ্ন করেছি যে আমার কোন প্রলোভন শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হল ; আর্টিস্টদের প্রীতিময় সদ্‌গুণ না সম্ভ্রান্ত পৃষ্ঠপোষকদের উপস্থিতি। যখন আমি গর্তের ভিতর দিয়ে উঁকি দিলাম তখন আমি বুঝলাম যে সামান্য আবরণী সম্পর্কিত আমার মন্তব্যটা ভীতিজনকভাবে সত্যে পরিণত।

হের গিসেলভিচ প্রথমেই সেই গর্তের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নিশ্চয়ই অপর প্রান্তে কোথাও একটা পা রাখার জায়গা পেয়েছিলেন তিনি, ভদ্রভাবে তাঁর স্ত্রীর দিকে একটি হস্ত প্রসারিত করে দিলেন যেন কোনো

গাড়িতে ওঠার খাড়াই সিঁড়িতে উঠতে সাহায্য করছেন। আমার দিক থেকে আমিও একটা হাত প্রসারিত করি, ফ্রাউ গিসেলভিচ ছিলেন, এখনও তাই আছেন, বিশালায়তন রমণী। তবে তিনিও এতক্ষণে একটা সুন্দর পদক্ষেপণের ভূমি লাভ করেছেন। আমি এখন একা।

প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করে আমি পোষাকের ভারী আলমারিটা ঠেলে এনে গর্তের সামনে রাখলাম, সেই জায়গাটাতেই আজো ওয়ার্ডরোবটা রাখা আছে। এখন সব বেশ অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে গেল। পোষাক আলমারির ভিতরকার কাপড়চোপড় কোলাহলটা কিঞ্চিৎ হ্রাস করল। এরই সঙ্গে পার্টির উত্তেজনাতেও কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়ে থাকবে। দুই মেরুর মধ্যে একটা শান্তিময় পর্ব।

শ্রান্ত হয়ে আমি যুগল বিছানার একটিতে শুয়ে পড়ে সমস্ত ঘটনাটি সম্পর্কে চিন্তা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তি অনুভব করার শক্তি ছিল না আমার। যাই হোক এক অতিশয় ক্লান্তিকর সন্ধ্যা আমাকে পার হতে হয়েছে। অনেক দূরে একটা ইঞ্জিনের ধ্বনি শুনতে পেলাম, আর এই ভেবে খুশী হলাম যে পার্টির গোলমালের বাইরে (এখন অবশ্য সেই কলরব সামান্য গুঞ্জনমাত্র) অন্য শব্দও শুনতে পাচ্ছি। মশারির ভেতর থেকে দেখতে পেলাম যে ক্রমশই আলোর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। তার অর্থ ভোর হয়ে আসছে, এখন এই সময় আমার যখন ঘুম ভেঙেছে আমি এক সুদীর্ঘ জনবীথির মধ্য থেকে অবতরণ করে এসেছি, বিষণ্ণ অশুভ স্মৃতির পারে এসে পৌছেচি।

ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম কাক ডাকছে। এই পাখিটার এইটাই একমাত্র ভূমিকা। এই কারণেই কবিদের প্রশস্তিলাভে তার দাবী জন্মেছে।

আমি লক্ষ্য করলাম, এই জাতীয় অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এমনই ঘটেছে বারবার, আমার চিন্তাধারা বেশ স্বাতন্ত্র্য সহকারে গড়ে উঠছে। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

অপরাহ্ণের শেষ দিকে আমার ঘুম ভাঙল। আমি সেই গর্তের ভিতর দিয়ে দেখলাম পার্টি একেবারে পুরোদমে চলছে। আমি জানি এই পার্টি এখন বিরামবিহীন গতিতে চলবে।

মোটা মেয়েটি

মেরী লুইসী কাসনিৎস

জানুয়ারী মাসের শেষ, ক্রিসমাসের ছুটির ঠিক পরেই মোটা মেয়েটি আমার কাছে এসেছিল। আমি সেই বছর শীতকালে আশপাশের ছেলে-মেয়েদের বই পড়তে দিতাম, তাদের এসে বই নিয়ে যেতে হত এবং একটা নির্দিষ্ট দিনে এসে বই ফেরত দিতে হত। আমি ওদের সবাইকেই স্বভাবত জানতাম, তবে মাঝে মাঝে যারা আমাদের রাস্তার বাসিন্দা নয় এমন অচেনা ছেলেও আসত। যদিও অধিকাংশ শুধু বই দিতে নিতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকুই থাকত, অনেকে আবার সোজাসুজি বই পড়তে বসে যেত। তখন আমি আমার ডেসকে কাজে বসে যেতাম, আর ছেলেরা দেয়াল-সেলফের কাছে ছোট টেবিলটায় বসত। ওদের সাহচর্য আমার বেশ লাগত এবং আমি মোটেই বিরক্তবোধ করতাম না।

মোটা মেয়েটি এসেছিল একটা শুক্রবার বা শনিবার, যাই হোক, বই দেবার দিনে নয়, আমি বাইরে যাব স্থির করেছিলাম, ঘরের ভেতর সামান্য জলখাবার যা আমি নিজেই তৈরী করেছিলাম নিয়ে যাচ্ছিলাম। একটু আগেই একজন অতিথি এসেছিলেন, তিনি বোধহয় যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন, তার ফলে মোটা মেয়েটি হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়াল, আমি টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে আর একটা কি জিনিষ রান্নাঘর থেকে আনবার জন্য যাচ্ছিলাম। দেখি মেয়েটি দাঁড়িয়ে। হয়ত বারো বছর বয়স হবে, গায়ে তার একটা পুরাতন ফ্যাসনের উলের কোট, সেলাই করা কালো মোজা আর পিঠে একজোড়া আইস-স্কেটার বাঁধা। মেয়েটি আমার কাছে পরিচিত মনে হল অথচ তেমন পরিচিত নয়, আর এত নিঃশব্দে এসে ও আমাকে বেশ চমকে দিয়েছে।

বিস্মিত হয়ে আমি প্রশ্ন করি, 'আমি কি তোমাকে চিনি?' মোটা মেয়েটি কোনও জবাব দেয় না। তার বর্তুলাকার পেটে হাত দুটি রেখে চুপ করে সে আমার মুখের দিকে জলের মত স্বচ্ছ চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি প্রশ্ন করি, 'তোমার কি বই নেবার ইচ্ছা আছে?' এইবারও মোটা মেয়েটি কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু এতদ্বারা আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। লাজুক প্রকৃতির ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে আমি অভ্যস্ত, আর সাহায্যও করতে হয় আমাকে। আমি তাই কতকগুলি বই নিয়ে মেয়েটির সামনে ধরলাম। তারপর আমি বই ধার দেওয়ার কার্ড ভর্তি করতে বসলাম।

প্রশ্ন করলাম—'তোমার নামটি কি?'

মেয়েটি বলল—'আমাকে সবাই মুট্‌কু বলে ডাকে।'

আমি প্রশ্ন করি—'আমিও কি তাই বলব নাকি?'

মেয়েটি বলল—'আমি কিছু মনে করি না।' এমন কি আমার হাসির পিঠে হাসলও না। এখন আমার মনে পড়ে ওর মুখে একটা বেদনার ছাপ ছিল। আমি কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিনি।

আমি আবার প্রশ্ন করি—'কবে তোমার জন্ম হয়েছে?'

মেয়েটি মৃদু গলায় বলল—'কুম্ভ রাশীতে।'

এই উত্তরে আমি একটু মজা পেলেও কার্ডে সেই কথাই লিখে নিলাম। একরকম মজা করার জন্যই লিখলাম, তারপর বইটা ওকে দিলাম।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমার কি বিশেষ ধরনের কিছু চাই?' তখন আমি লক্ষ্য করলাম মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না তার দৃষ্টি রয়েছে টেবিলের ওপর রাখা আমার চা ও স্যাণ্ডউইচে।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'তুমি একটু কিছু খাবে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, তার এই স্বীকৃতির মধ্যে একটা আহত বিস্ময়ের ভঙ্গী যে আছে আগে একথা কেন আমি ভাবিনি। সে একের পর একটি স্যাণ্ডউইচ ভক্ষণ করে গেল এবং এমন ভাবে খেতে লাগল যে তার অর্থ আমি পরে বুঝতে পারলাম। তারপর সে ঐখানে বসে পড়ে ঘরটার চারদিকে তার ক্লান্ত শীতল চোখ মেলে তাকায়। তার ভেতর এমন একটা বস্তু ছিল যা আমার চিত্তকে বিরক্তি ও বিরাগে ভরে দিয়েছিল। হাঁ, আমি একেবারে গোড়া থেকেই এই মেয়েটিকে ঘৃণা করতাম। ওর সবকিছু আমার বিসদৃশ মনে হত, ওর মন্থর চলাফেরা, সুন্দর মোটা সোটা মুখ, এবং ওর কথা-বার্তায় কেমন একটা ঘুম ঘুম ও অলস ভাব। যদিও ওর জন্য আমার বাইরে

যাওয়া ত্যাগ করলাম তবু আমি ওর প্রতি এতটুকু বন্ধুভাবাপন্ন হইনি বরং বেশ নিষ্ঠুর এবং শীতল আমার মনোভাব। কিংবা ওকে বন্ধুভাবাপন্ন বলা যায়, আমার ডেসকে কাজ নিয়ে বসি আর বলি—নাও পড়ো আমার পিছনে বসে পড়ো দেখি, অবশ্য আমি জানতাম যে এই অদ্ভুত শিশুটি একেবারেই পড়তে চায় না। আমি ঐভাবে বসে আছি। কিছু লেখবার ইচ্ছা, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না একটা বিশ্রী শঙ্কিত মনোভাবের জন্য, কারণ যখন একটা বিষয় অনুমান করার প্রয়োজন হয়, অথচ পারা যায় না, তখন যতক্ষণ না পারা যায় ততক্ষণ মনের ভাব আগের মত আর হয় না। আমি কিছুক্ষণের জন্য তা সহ্য করলাম কিন্তু আর পারলাম না, তখন আমি ঘুরে বসে ওর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম যা কিছু অদ্ভুতধরনের প্রশ্ন হতে পারে তাই বলি।

আমি প্রশ্ন করি—'তোমার কি কোনো ভাইবোন আছে?'

মেয়েটি জবাব দেয়—'হাঁ।'

আমি বলি—'তোমায় কি স্কুল ভালো লাগে?'

মেয়েটি বলে—'হাঁ।'

'কি তোমার সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে?'

মেয়েটি জানতে চায়—'কি?'

আমি মরিয়া হয়ে বলি—'কোন্ বিষয়?'

মেয়েটি জবাব দেয়—'জানি না।'

আমি জানতে চাই—'হয়ত জার্মান।'

মেয়েটি বলে—'আমি জানিনা!'

মেয়েটিকে দেখে আমার শরীরে কেমন একটা অপরিসীম আতংকের ভাব সৃষ্টি হল। আমি আমার আঙুলে একটা পেনসিল মট্‌কে ভাঙলাম।

কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করি—'তোমার কোনো সখী আছে?'

মেয়েটি বলল—'হাঁ-হাঁ তা আছে।'

আমি প্রশ্ন করি—'তাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই তোমার বেশী প্রিয়?'

সেই মেয়েটি বলল—'তা জানি না,' তারপর সেই লোমশ উলের কোট পরা অবস্থায় সেইভাবেই বসে রইল, যেন একটি পুরুষ্ট শোঁয়া পোকা; খেলও যেন একটি শোঁয়াপোকার মত।

আমি মনে মনে ভাবি, আর তোমাকে কিছু দিচ্ছি না—একটা আশ্চর্য প্রতিশোধস্পৃহা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। কিন্তু তবু আমি বেরিয়েই গেলাম, কিছু পাউরুটি আর সসেজ নিয়ে ফিরলাম। আর সেই মেয়েটি সেইরকম শূন্যদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল তারপর খেতে সুরু করল, সেই শোঁয়াপোকার মত খাওয়া। অতি মৃদুগতি অথচ জেদসহ যেন একটা আভ্যন্তরীণ বাধ্যতার ফলেই সে এমন করে যাচ্ছে। আমি টেরাভাব নিয়ে নীরবে ওকে দেখতে লাগলাম। কারণ এখন আমি এমন একটা মনের অবস্থায় পৌছেচি যে এই শিশুটির সবকিছুই আমাকে বিরক্ত এবং বিরূপ করে তুলেছে। ওর সব কিছুই কেমন বেয়াড়া—শাদা পোষাক। কি বিশ্রী উঁচু কলার—। ও যখন খাওয়ার পর কোটে বোতাম আঁটছিল, তখন আমি মনে মনে ভাবি। আমি আবার কাজে বসলাম, শুনতে পেলাম মেয়েটি আমার পিঠের কাছে জিভ চাট্‌ছে। আর এই আওয়াজ যেন অরণ্যের কোনো গভীর কালো পুকুরের আড়ম্বরপূর্ণ বুদ্বুদের শব্দ। তার ফলে আমাকে অনড়ত্ব, মানবপ্রকৃতির বিষণ্ন গুরুভারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—আর এই চিন্তা আমাকে গভীরভাবে উৎপীড়িত করে। তুমি কি চাও আমাব কাছে—আমি মনে মনে ভাবি। চলে যাও, চলে যাও। নিজেব হাতে শিশুটাকে ঘর থেকে বার করতে পারলে খুশী হতাম। যেমন করে বিরক্তিকর জন্তুকে আমরা ঘর থেকে তাড়াই। কিন্তু আমি তাকে ঘর থেকে বাব করিনি। শুধু আবার তার সঙ্গে কথা সুরু করি। আবার সেই নিষ্ঠুর ভঙ্গীতে—

আমি প্রশ্ন কবি—'তুমি কি বরফে যাও নাকি?'

মোটা মেয়েটি বলে—'হ্যাঁ'।

আমি ওর পিঠে ঝোলানো স্কেটের সরঞ্জাম দেখিয়ে বলি—'তুমি কি খুব ভালো স্কেটার?'

'আমায় দিদি ভালো স্কেট করতে পারে।' আবার তার মুখে একটা ব্যথা ও বেদনার ভঙ্গী। এবারও আমি সেদিকে মন দিই না।

আমি প্রশ্ন করি—'তোমার দিদিকে দেখতে কেমন? তোমার মত নাকি?'

মোটা মেয়েটি বলে—'না—না। আমার বোনটি বেশ পাতলা, তার মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল। গ্রীষ্মকালে, আমারা যখন গ্রামে, সে রাতে ওঠে ঝড় হলেই তারপর ওপর তলায় বারান্দায় বসে গান করে।'

আমি বলি—'আর তুমি?'

'আমি বিছানাতেই থাকি! আমায় ভয় করে।' মেয়েটি জবাব দেয়।

আমি আবার বলি—'তোমার দিদির ভয় করে না? তাই না?'

শিশুটি বলে—'না,ও কখনও ভয় পায় না। সে একেবারে স্প্রিংবোর্ডের ওপর থেকে ঝাঁপ খেতে পারে। সে মাথা নীচু করে জলে পড়ে সাঁতার কাটে...'

আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাই—'তোমার দিদি কি গান করে?'

'ওর যা ভালো লাগে গায়। সে কবিতা লিখতে পারে।' বিষাদমাখা কণ্ঠে মেয়েটি জবাব দেয়।

আমি আবার প্রশ্ন করি—'আর তুমি?'

'আমি কিছুই করি না'—মেয়েটি বলল। তারপর সে উঠে পড়ল ও বলে উঠল—'এইবার আমি যাই।' আমি আমার হাত এগিয়ে দিলাম, সে তার ওপর ওর মোটা মোটা আঙুল রাখল। আমি ঠিক করে বলতে পারব না যে আমার কি মনে হয়েছিল—ওকে অনুসরণ করার জন্য একটা যেন চ্যালেঞ্জ। একটা অশ্রুত অথচ জরুরী আহ্বান।

আমি বললাম—'আর কোনো সময় এসো।' কিন্তু সত্যি সত্যি আমি তা চাইনি। শিশুটিও কিছু বলল না, ওর শীতল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চলে গেল, আমার সত্যি সত্যি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কথা। কিন্তু আমার সামনের দরজাটার চাবী বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনার আগেই আমি নিজেই বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমার কোটটা টেনে নিলাম—তারপর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি পথে গিয়ে পড়লাম, মেয়েটি ঠিক সেই মুহূর্তে গলির বাঁকে মিলিয়ে গেল।

আমি এই শোঁয়াপোকাকে স্কেটে চড়া অবস্থায় দেখতে চাই। আমি ভাবি। এই মোটা ভেট্‌কি কি ভাবে বরফে ঘুরে বেড়ায় দেখতে হবে। আমি আমার গতিবেগ বৃদ্ধি করি। ওকে চোখের আড়াল হতে দিলে চলবে না।

মোটা মেয়েটি আমাদের বাড়ি যখন এসেছিল তখন সবে বিকেল আর এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। অবশ্য আমার বাল্যকালে এই শহরে কিছুকাল কাটিয়েছি তবু আমি ঠিকমত পথঘাট জানি না, মেয়েটিকে অনুসরণ করতে গিয়ে অচিরেই আমি পথের কোনখানটায় যে ছিলাম তা হারিয়ে ফেললাম এবং পথঘাট পার্ক সবই আমার কাছে একেবারে অপরিচিত মনে হল। আমি

সহসা আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। অতিশয় ঠাণ্ডা কিন্তু এখন একটা ঝড়ের পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছে, এমনই প্রচণ্ড এই ঝড় যে ছাদ থেকে তুষার গলে পড়তে আরম্ভ হয়েছে—আকাশে মেঘ গড়িয়ে চলেছে। আমরা শহরের বাইরে যেখানে বাড়িগুলি প্রকাণ্ড বাগানে ঘেরা সেইখানে এসে পৌছলাম—তারপর আর কোনো বাড়ি নেই সেখানে, তারপর সেই মোটা মেয়েটি সহসা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল এবং বেশ খাড়াই ঢালু ধার দিয়ে নেমে পড়ল। আমি আমার সামনে একটা স্কেটিং ক্ষেত্র দেখার আশা করেছিলাম, তাতে থাকবে উজ্জ্বল আলো, চাতালটা জ্বল জ্বল করবে, কলরব থাকবে, গান থাকবে তার বদলে দেখলাম অন্য বস্তু। কারণ, আমার সামনে লেক পড়ে আছে, তার ধারগুলি তৈরী করা হয়েছে মনে হল। বেশ নিস্তব্ধ নিরালা। তার চার ধারে কালো বন—ঠিক আমার ছেলেবেলায় যেমনটি ছিল তেমন।

এই অপ্রত্যাশিত আওয়াজ আমাকে এমনই ব্যথিত করে তুলল যে আমি সেই আশ্চর্য মেয়েটির সূত্র একেবারে হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু তখনই তাকে আবার দেখতে পেলাম, সে লেকের ধারে বসে আছে। একটা পায়ের ওপর আর একটা পা চাপিয়ে এক হাত দিয়ে পায়ে স্কেট পরার উদ্যোগ করছে। স্কেটটা বাঁধছে। চাবিটা একবার দু-বার ঠিকমত লাগানো গেল না তারপর মেয়েটি হাত-পা সব এক সঙ্গে চালিয়ে একেবারে তুষারানুসন্ধানে নেমে পড়ল যেন একটা আশ্চর্য ধরনের বৃহৎ ভেক। এই সময়টা ধরে ক্রমশঃই অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে। লেকের উপরকার জেটিটা মেয়েটির কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে—শাদা সমতলের ওপর তাকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দেখাচ্ছে—লেকটা শুভ্র হলেও মাঝে মাঝে কালো ছাপ আছে এখানে ওখানে। এই যে কালো ম্লান ছাপ এর দ্বারাই আসন্ন ঝড়ের আবির্ভাব বোঝা যায়। আমি অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠি, 'তাড়াতাড়ি করো।' মোটা মেয়েটি এইবার সত্যি বেশ তাড়াতাড়িই কাজ করে। সেটা আমার চীৎকারের দরুণ নয়, জেটির কাছ থেকে কে একজন চীৎকার করে বলে ওঠে—'কাম আন ফ্যাটি, ফ্যাটি এদিকে আয়।'

কে ওখানে ঘুরপাক খাচ্ছে। বেশ উজ্জ্বল হালকা আকৃতি। আমার মনে হল এই সেই বোন বোধ হয়—সেই নর্তকী সেই যে ঝড়ের গান করে। এই সেই আমার মনের মত মেয়ে। এবং সেই মুহূর্তে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ হলাম যে এই চমৎকার প্রাণীটিকে দেখার তাড়নাই আমাকে

এতদূরে টেনে এনেছে। ঠিক সেই সঙ্গে আমার একথাও মনে হল বাচ্চা দুটো কি বিপদের মুখোমুখি পৌঁছেচে। কারণ, এখন সহসা সেই অদ্ভুত গোঙানি শব্দ শোনা যায়, সেই সুগভীর দীর্ঘশ্বাস। এই ধরনের আওয়াজ হয় যখন লেকের তুষার চাপ ভাঙার উপক্রম ঘটে। এই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একটা ভৌতিক শোকোচ্ছ্বাস আছে যা আমি শুনতে পেলেও মেয়ে দুটি শুনতে পায়নি।

না, ওরা নিঃসন্দেহে শুনতে পায়নি। কারণ, তা নইলে মোটা মেয়েটি, ওই ভীত বাচ্চাটি, নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতো না। সে আরো এগিয়ে যেত না অমন বেয়াড়াভাবে দেহ আন্দোলিত করে। আর ওর বোনটি ওভাবে হাত নেড়ে হেসে একটা ব্যালে নর্তকীর মত ওর স্কেটের ডগায় ভর দিয়ে চপলতা করত না, ঐভাবে 'আর্টের' মুদ্রা দেখাত না। মোটা মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্ধকার ছাপগুলি এড়িয়ে চলত—এখন তা অতিক্রম করতেও শঙ্কিত হচ্ছে। ওর বোনটি ওভাবে সহসা দূরে একটা নির্জন খাড়িতে চলে যেত না।

আমি সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কারণ আমি জেটিতে ধাপে ধাপে দূর থেকে দূরে এগিয়ে গেছি। যদিও তকতাগুলো বরফে ঢাকা—আমি আমার নীচের ঐ মোটা মেয়েটির চেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়ে ওর মুখোমুখি এসে পড়েছি—তার মুখভংগী শূন্য কিন্তু তা বাসনায় পরিপূর্ণ। আমি চতুর্দিকে যেসব ফাটল জেগে উঠছে তাও দেখতে পাচ্ছি। যেন একটা উন্মাদের লালাসিক্ত ঠোঁট।

তারপর অবশ্য, আমি দেখতে পেলাম মোটা মেয়েটির পায়ের তলে কি ভাবে বরফ গলে ফেটে গেল—তার তলা দিয়ে ফেনায়িত জলরাশি দেখা গেল। কারণ, ওর বোন যেখানে নৃত্য করছিল এটা সেই জায়গা, জেটির প্রান্ত থেকে মাত্র এক হাত দূর।

সোজা বলা ভালো যে এই ব্যাপারের জন্য খুব বেশী মারাত্মক আশঙ্কা ছিল না। কারণ, লেকে বিভিন্ন স্তরে বরফ জমে, প্রথমটির মাত্র তিন ফিট নীচেই দ্বিতীয় স্তর, সেটি এখনও বেশ কঠিন। যা ঘটল তার অর্থ এই যে মোটা মেয়েটি জলের নীচে তিন ফিট গভীরে দাঁড়িয়ে, অবশ্য স্বীকার করতে হবে সেই জল তুষারশীতল আর তার চারপাশে ভগ্ন বরফের অংশ। কিন্তু সে সামান্য একটু যদি জলভেঙে যায় তাহলে সহজেই জেটির কাছে পৌঁছাবে এবং কোনো রকমে আপনাকে সামলে নেবে। আমিও তখন তাকে সাহায্য করতে পারব। যাই হোক আমার সহসা মনে হল, সে এসব পেরে উঠবে

না। সত্যিই দেখা গেল ও পারছে না—ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর ভং আতংকিত, শুধু দু-একটা বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করছে। তার চার পাশে জল ঘিরে ধরছে আর হাতে নিচে বরফ ভেঙে পড়ছে। জলদেবতা সেই কুন্তরাশির বৃদ্ধ এখন ওকে জলে টেনে নিচ্ছে, আমার কিছুই অনুভূতি নেই, আমি একেবারে সহানুভূতিহীন ভঙ্গীতে নিশ্চল হয়ে রইলাম।

তারপর সেই মোটা মেয়েটি সহসা তার মাথা ওঠালো, এদিকে রাত হয়ে এসেছে। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ দেখা দিয়েছে, আমি স্পষ্ট দেখলাম ওর মুখভংগী পরিবর্তিত হয়েছে। মুখের আকৃতি সেই আছে তবু ঠিক তাই নয়, সমস্ত বাসনা আবেগ নিয়ে কেমন প্রশস্ততর,যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা ওর সারা জীবনটাকে অঞ্জলিভরে পান করেছে। সত্যি,আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে ওর মৃত্যু আসন্ন। আমি রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে আমার ঠিক নীচে দেখতে থাকি সেই শাদা মুখ আর সেই মুখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যেন কৃষ্ণজলের ভিতর একটি প্রতিবিম্ব। এতক্ষণে মোটা মেয়েটি জেটির কাছে এসে পৌছাল।

তার হাত দুটি ছড়িয়ে সে প্রাণপণে আপনাকে মুক্ত করার চেষ্টা করে—কাঠের ভেতরে যে সব পেরেক আর কাঁটা আছে তাই আঁকড়ে ধরে। ওর দেহটা ভীষণ ভারী। আর ও যখন পড়ে গেল তখন ওর আঙুল চুঁয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তবু সে আবার নতুন করে চেষ্টা করে।

এই এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম আমি লক্ষ্য করতে থাকি, মুক্তি এবং রূপান্তরের জন্য এক সুতীব্র সংগ্রাম, যেমন খোলা ভেঙে প্রাণী বেরিয়ে আসে বা লতাতন্তুর ভিতর থেকে গুটিপোকা। এখন আমি শিশুটিকে সাহায্য করতেও পারতাম। কিন্তু আমি জানতাম ওর আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমি ওকে চিনতে পেরেছি…

সেই সন্ধ্যায় কি ভাবে বাড়ি ফিরেছি মনে নেই। আমি শুধু জানি আমি আমাদের সিঁড়িতে ওঠার সময় আমার প্রতিবেশিনীকে বলেছিলাম যে লেকের কিছু অংশে এখনও মাঠ এবং কালো বনভূমি রয়ে গেছে। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—না তা নেই, আর পরে আমি আমার ডেস্কে দেখলাম সমস্ত কাগজপত্র কেমন এলোমেলো হয়ে আছে—তার ভেতর রয়েছে আমার একখানি প্রাচীন চিত্র, শাদা উলের পোষাক পরা তার উঁচু কলার, চোখ দুটি জলের মত স্বচ্ছ, আর ভারী মোটা।

পাপের পথ মসৃন

হাইনজ রিসে

ব্যাঙ্ক কেরানী বললেন, 'দুশ অষ্টনব্বুই মার্ক, মিসেস রথ্‌নাগেল, কি ধরনের নোটে টাকাটা দেব?' রসিদটা একপাশে রেখে তিনি বললেন।

মিসেস রথ্‌নাগেল বললেন—'ও', এমনভাব তিনি দেখালেন যে তাঁকে প্রশ্নটা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে অথচ প্রতি চার মাসে একবার এই একই প্রশ্ন করা হয় বারবার—বোধহয় ব্যাঙ্কের প্রচুর ধনসম্পদ যে তদারক করে সেই তরুণ কর্মচারীর সামনে তিনি বিব্রত বোধ করেন; তাই তাঁর উত্তরও প্রতিবারই এক প্রকার—'ওঃ মিঃ গ্রুল, ও এমন বিশেষ ব্যাপার নয়, তবে যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমাকে মোটা দরের নোট দেবেন না। দোকানগুলোয় সহজে তার ভাঙানি মেলে না।'

শেষের কথাগুলি তিনি প্রায় ফিসফিস করে বলেন--তাঁর মনে হয় মিঃ গ্রুলকে এইভাবে বিরক্ত করা তাঁর পক্ষে অসমীচীন, কারণ, কেন তিনি ছোট নোট চান তা তাঁর জানা আছে, তাই তিনি একটা প্রবচন ঠিক করে নিয়েছেন, শেষের কথাগুলি ফিসফিস করে বললে তার অন্তর্নিহিত গুরুত্বটুকু হ্রাস পায়। মিঃ গ্রুল লোহার সিন্দুকের দিকে ফিরে তার ভেতর থেকে একতাড়া নোট আর মুদ্রা বের করেন। অতিশয় দ্রুতগতিতে তিনি সেগুলি গণনা শেষ করলেন, মিসেস রথ্‌নাগেল প্রতি চার মাসে একবার তার জন্য তারিফ দেন, তার সেই টাকাকড়ি একটি কাঁচের প্লেটে রেখে ওঁর সামনে ধরেন। তারপর তিনি আধ-পা পিছু হটে যান। তার অর্থ, খতম, এইবার টাকা গুনে নিন।

এই মুহূর্তটুকু বড়ই ক্লেশকর মিসেস রথ্‌নাগেলের কাছে, কারণ, এখনই এত কৃতিত্বের সঙ্গে মিঃ গ্রুল যে টাকা গুনে ওঁর হাতে দিয়েছেন সেই টাকাই আবার নতুন করে কুৎসিৎ ভাবে ওঁরই সামনে গোনার অর্থ ওঁকে অবিশ্বাস করা নয় কি? পাঁচ কোয়ার্টার আগে যখন জমার টাকার সুদ এইভাবে গ্লাস প্লেটে রেখে ওঁর সামনে ধরেছিলেন মিঃ গ্রুল, তার কিছুদিন আগেই তিনি অন্য শাখা থেকে বদল হয়ে এসেছিলেন, তখন মিসেস রথ্‌নাগেল ভীরু গলায় বলেছিলেন টাকা এভাবে আবার গুণতে তাঁর লজ্জা করে। কিন্তু মিঃ গ্রুল তাঁর তারুণ্য

সত্ত্বেও চমৎকার মানুষ, তিনি হাতের একটি ভঙ্গী প্রকাশ করে তাকে নিরস্ত করলেন, তিনি বল্লেন, 'এমন কি অতিশয় বিবেচক ব্যাঙ্ক কেরানীও একেবারে অভ্রান্ত নন, প্রতিটি ভ্রান্তি কাউণ্টারেই ঠিক করে নিতে হবে, নইলে এটা আর ভ্রান্তি থাকে না। তারপর তিনি এক মক্কেলের কাহিনী বললেন—যিনি তাঁর টাকা নিয়ে চলে গেছলেন। একঘণ্টা পরে ফিরে এসে বলেন একশ মার্ক বেশী পেয়ে গেছেন, ফেরৎ দিতে চান।'

'একেবারে বাড়াবাড়ি।'

—'হাঁ, একটু বেশী রকমেরই। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁর কথা মেনে নিতে রাজী হলেন না, কারণ আদর্শগত নীতিটাই বড়ো, কোন একটি বিশেষ ঘটনা নয়। আপনি বুঝলেন, সেদিন সন্ধ্যায় যখন ক্যাশ গণনা হল তার দেখা গেল একশ মার্ক কম পড়েছে। ব্যাঙ্ক এমন ভাব দেখালেন যেন কিছুই হয় নি। চমৎকার! কেমন নয়? অবশ্য এটা তারকার বিরামহীন গতিরই পরিচায়ক। যাই হোক—ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই মক্কেলকে খবর দিতে পারতেন। তিনি হয়ত তখনও সেই বাড়তি টাকাটা ফেরৎ দিতে পারতেন। হয়ত। কিন্তু আপনি ত' জানেন, ব্যাঙ্কের একটা আদর্শগত নীতি আছে। কেমন নয়? আর সব ব্যাঙ্ক কেরানীকেই এই রকম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, জীবন একটা আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, কোনো একটা বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে নয়।'

মিসেস রথ্‌নাগেল ভাবলেন এমন যাঁদের মনোভংগী তাঁদের বিশ্বাস করতেই হবে, শেষের কথাটি তাঁকে বিশেষভাবে প্রীত করল। জীবনটা কয়েকটি ব্যক্তিগত ঘটনার সমষ্টি হিসাবে প্রকৃতপক্ষে বিভ্রাট সৃষ্টি করে বালির ওপর গড়া জগৎ, কোন বিশ্বাস নেই, নিরাপত্তা নেই। এই একটিমাত্র কারণেই মিঃ গ্রুল তাঁর সামনে যে টাকাটা এনে ধরেছেন তা পুনরায় গণনা করতে তাঁর মনোভাব অস্বস্তিমুক্ত রইল না। আমারও বিশ্বাস করতে পারা উচিত। উনি মনে মনে ভাবেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের নীতি এমনই যে আমি যা মনে করি না সেইভাবেই কাজ করতে হবে।

তিনি তাই এই অপ্রীতিকর রীতিরই বশ্যতা স্বীকার করলেন—তারপর ব্যাঙ্ক কেরানীর দৃষ্টি আর প্রায় সহ্য করতে না পেরেই যেন তাড়াতাড়ি নোট আর মুদ্রাগুলি তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগে পুরে ফেললেন।

বাড়ি গিয়ে টাকাগুলি ঠিক ঠিক গুনে গেঁথে নেবেন।

হ্যাণ্ডব্যাগের টানাটা আঁটতে গিয়ে মিসেস রথ্‌নাগেল বললেন, 'আপনি হয়ত মনে মনে ভাবেন কেন আমি প্রতি কোয়ার্টারে নিজেই এসে এইভাবে আমার জমানো টাকার স্থদ নিয়ে যাই।'

কেরানী জবাব দেয়, 'না ম্যাডাম, মোটেই নয়। আমাদের মক্কেলেরা কেন টাকা উঠিয়ে নেন সে বিষয়ে চিন্তা করার অধিকার আমাদের নেই।' অর্থাৎ এটা আর একটা নীতি। মিসেস রথ্‌নাগেল মনে মনে ভাবেন—আমি ঠিক জানি না তবে হয়ত—। অনেকে আছেন যাঁদের টাকাটা সেভিংসে থাকে। যদি ব্যাঙ্ক কেরানীকে একথা ভাবতে হয় যে যাঁরা টাকা উঠিয়ে নিয়ে যান, তাঁরা কি করেন সেই টাকায় তাহলে একটু বাড়াবাড়ি হয়। আমি সব মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ভাবছি কিন্তু টাকাকড়ির এই দিকটা নেই।

মিসেস রথ্‌নাগেল বল্লেন, 'প্রকৃতপক্ষে আমার বাঁচার প্রয়োজনে এ স্থদের টাকার দরকার।'

মিঃ গ্রুল মনে মনে হিসাব করেন, বড়জোর মাসে একশ মার্ক নিশ্চয়ই তাতে ত' আর মানুষ বাঁচে না।

মিসেস রথ্‌নাগেল আবার বল্লেন, 'আমার স্বামীর দরুণ কিছু পেনসন পেয়ে থাকি সরকার থেকে—স্বামী গত হয়েছেন সে আজ কুড়ি বছর। এই স্থদের টাকা নিয়ে কোনোরকমে চলে যায়, উপোষ করতে হয় না। যদি কারো জন্য ভাবতে না হয় তাহলে একটু হিসেবী হয়ে থাকাটা তেমন কঠিন নয়।'

গ্রুল উত্তর দেন, 'না তা হয়ত নয়।'

সে ভাবে মিসেসের মনে কিছু একটা চিন্তা পীড়া দিচ্ছে নইলে আমাকে এইসব বলছেন কেন? তিনি বললেন, 'আপনি যদি আমার কাছে কোনোরকম উপদেশ চান, আপনি জানবেন আমি সর্বদাই প্রস্তুত—'

মিসেস রথ্‌নাগেল বল্লেন, 'হাঁ, যদি অবশ্য আপনার তেমন কষ্ট না হয়…'

আত্মসচেতন ভঙ্গীতে উনি একটু ইতস্ততঃ করেন, 'আমি একটু হিসেবী, কয়েক বছর আগে আমি উত্তরাধিকার স্থত্রে কিছু পেয়েছিলাম। তবে বিশ্বাস করুন সারা জীবন ধরে আমি প্রতিটি পাই পয়সা হিসেব করে ব্যয় করেছি।

মিঃ গ্রুল, কখনো আসল মূলধনে হাত দিই নি। কেবল সুদটা নিয়েছি। আগে আগে কিছু সুদের টাকাও বাঁচাতাম।'

গ্রুল মাথা নাড়লেন।

মিসেস রথ্‌নাগেল বলতে থাকেন, 'তবে, আজকাল, সে সব আর সম্ভব নয়,তার অর্থ কি ! তার অর্থ এখন আর চালানো যায় না। একটা না একটা বস্তুর দাম বেড়ে গেছে এই ক'বছরে, আপনি লক্ষ্য করেননি হয়ত। ধীরে ধীরে বেড়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ টাকা ওঠাতে পারি তা ত' আর বাড়েনি। জানেন মিঃ গ্রুল, আপনি বিশ্বাস করবেন, আমি এখনও রুটিওলার কাছে গত মাসের দরুণ ঋণী হয়ে আছি। আগামী মাসের বাড়ি ভাড়া চাই। এই যে টাকা এখনই আমাকে দিলেন তার ভেতর থেকেই সব করতে হবে। আগে আগে প্রতি কোয়ার্টারে যেটুকু পেতাম তাতেই সব কুলিয়ে যেত। এখন আর মোটেই চালাতে পারি না গ্রুল, আমার এই এত টেনেটুনে চলা সত্ত্বেও পারি না।'

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'তাহলে আপনাকে আরো রোজগার করতে হবে।'

মিসেস রথ্‌নাগেল বল্লেন, 'তার মানে, আপনি বলতে চান যে কোনো একটা কাজ টাজ জুটিয়ে নিই। কিন্তু কে আমাকে, এই বুড়ীকে কাজ দেবে মিঃ গ্রুল ? আমার এখন তিয়াত্তর বছর বয়স হল।'

মিঃ গ্রুল মাথা নাড়লেন, 'না না, আমি তা বলিনি, ওকথা ভাবিনি মোটেই।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনার সঞ্চিত টাকাকে এমনভাবে জমা দিতে হবে যে তা থেকে আজ বেশী সুদ পাওয়া যায়, মানে, যা পাচ্ছেন তার চেয়ে বেশী পাবেন।'

মিসেস রথ্‌নাগেল প্রশ্ন করেন, 'সেটা কি সম্ভব ? মানে—' তিনি একটু ইতস্ততঃ করে বলে ফেলেন, 'যদি অবশ্য আপনি সে রকম বিবেচনা করেন·· অবশ্য এটা একটা প্রস্তাব মাত্র, আপনি যদি আমার বাসায় এসে এক কাপ চা বা কফি পান করেন, কাল বা পরশু আপনার কাজের শেষে একটু সম্ভব হবে কি ? এই কাউন্টারে কথা বলার চেয়ে আরো সহজে কথা বলা যাবে—আপনার অগামনে আমি ভারী খুশী হব।'

মিঃ গ্রুল মাথা নাড়লেন।

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই, আমি সানন্দে আসব। তাহলে পরশুদিন পাঁচটা থেকে ছটার ভেতর ? আপনাকে যদি সাহায্য করতে পারি ত' খুশী হব।'

'আপনি বড়ই সদাশয়।' মিসেস রথ্‌নাগেল বললেন, 'ধন্যবাদ। তাহলে পরশু দিন।' উনি গ্লাস প্লেট ছাড়িয়ে নিজের হাতখানা মিঃ গ্রুলের দিকে এগিয়ে দিলেন তারপর চলে গেলেন।

যে বাড়িটায় মিসেস রথ্‌নাগেল থাকতেন, সেটি শহরের একটু উঁচু ধরনের অঞ্চল, এখন অবশ্য দারিদ্র্যবশতঃ অযত্ন তার আকৃতিতে প্রকাশিত। লঘুপদ মৃত্যু, বিগতপ্রায় শরৎ—ধ্বংসের বা রূপান্তরের কোনো ইঙ্গিত নেই—দূরের দিকে তাকিয়ে আছে—খসে-যাওয়া বালিকাজওলা দেওয়ালগাত্র আর আগের যুগের চমৎকার বাড়িঘর এখন একেবারে বায়ুধারণের জীবন্ত পাত্রে রূপান্তরিত। যে দুটি সিঁড়ি মিঃ গ্রুল মিসেস রথ্‌নাগেলের কাছে পৌছানোর জন্য অতিক্রম করলেন একদা তা কার্পেটে মোড়া ছিল—ভাঙা বা দোমড়ানো পিতলের রিংগুলি দেখে সে কথা স্মরণে জাগে, মারবেলের মাঝে মাঝে এখানে সেখানে সেগুলি উঁকি দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে আটকাবার লম্বা ডাঁটি পড়ে আছে—সিড়ি এবং তার রেলিং-এ একটা শ্রান্তির ভাব প্রকাশিত—যে জীবনের ছন্দ-পতন ঘটেছে তারই নিঃশ্বাসহীনতা।

মিঃ গ্রুল, তাঁর মক্কেলের যে কাঁচের দরজাটি সিড়ি থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে তার বেল টিপলেন। মিসেস রথ্‌নাগেল নিজে এসে দরজার পিছনটিতেই অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন।

তাঁর হস্ত চুম্বন করে মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'গুড ডে ম্যাডাম।' ব্যাঙ্কের নিয়ম যে তার কর্মচারীবৃন্দ মক্কেলের সঙ্গে সামাজিকতায় যথোচিত মনোযোগ দান করেন।

মিসেস রথ্‌নাগেল বললেন, 'গুড ডে, মিঃ গ্রুল। আপনি এসেছেন, কত যে খুশী হলাম। দুঃখের বিষয় আগে আমি যেমনটি থাকতাম ইদানীং সেভাবে থাকতে পারি না। কুড়ি বছর আগে এটা ছিল উত্তম বাড়ি, সমস্ত এলাকাটাই তাই ছিল।···আপনার টুপিটা খুলবেন কি? আর আপনার কোট! এই হল বসবার ঘর, যদি অনুগ্রহ করে আসেন—'

উনি দরজাটা খুলে ধরলেন—নিজে ওঁর আগেই প্রবেশ করলেন। টেবিল সাজানো, তার ওপর কফির পাত্র। নীচে একটা চীনামাটির আধার, ওপরে একটা লেপজাতীয় আবরণী।

মিসেস বলেন, 'সত্য মিঃ গ্রুল, আপনি এসেছেন এত ভালো লাগছে। অনুগ্রহ করে বসুন।'

উনি কফি পেয়ালায় ঢেলে ফেললেন। চিনি এবং দুধ অতিথির দিকে এগিয়ে দিলেন।

'আপনি ধূমপান করেন?'

না, মিঃ গ্রুল ধূমপান করেন না।

'বরাবরই ধূমপান করেন না? নাকি!'

না, মিঃ গ্রুল একদা ধূমপান করতেন মাঝে মাঝে, তবে তেমন ভালো লাগত না। তাই ছেড়ে দিয়েছেন।

মিসেস রথ্নাগেল চিন্তা করেন, বলেন:

'আমার ছেলেও কখনো ধূমপান করত না। কিংবা মাঝে সাজে, যখন সেনাদলে ভর্তি হয় তখন অবশ্য ধূমপান সুরু করে। তবে বেশীদিন ত' আর ফ্রণ্টে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে একটু তাড়াতাড়ি ওর শেষ হল। একেবারে ওর হার্টে এসে গোলা ছিটকে লাগল। ওঁরা লিখলেন তখনই নাকি মারা গেছে। মিঃ গ্রুল, ও যখন মারা যায়, তখন এই আপনার মতই বয়স ওর।'

মিঃ গ্রুল মাথা নাড়লেন—তাঁর মুখে সহানুভূতির ভঙ্গী, কিন্তু সে কিছুই আর বলে না, এ হল স্মৃতি। মেঘের ওপর প্রাসাদ রচনা করা যায় না।

মিসেস রথ্নাগের্ল একটু থেমেই আবার বলেন, 'যাই হোক আপনাকে দেখে আমার পুত্রের কথা মনে জাগে, বোধ হয় সেই কারণেই আপনাকে এত বিশ্বাস করি। আমার স্বামী কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন, তারপর আবার আমার ছেলে গেল—আমি একা থাকি। লোকে বলে আমরা যখন বৃদ্ধ হই তখন শুধু স্মৃতির মধ্যেই বাস করি। আমি তা বিশ্বাস করি না মিঃ গ্রুল। দশ বছর পরে কিংবা বিশ বছর পরে আপনাকে ছায়া আর টেবিলের মাঝে পায়চারী করতে হবে, দেওয়ালে ঘড়ি বাজে, আর দূরে যে কি আছে তা আপনি আর দেখতে পারেন না।'

মিঃ গ্রুল চারপাশে তাকান, তিনি সম্পত্তি বিষয়ে উপদেশ দিতে এসেছেন, মূল টাকার একটা হিসাব—যেটা নিজের সুদের জন্য প্রয়োজন—অনুভূতির বিশেষ বেদনামূল্য নেই। তিনি মাথা নাড়লেন এবং নীরব হয়ে রইলেন।

মিসেস রথ্‌নাগেল উঠে দাঁড়ালেন। জানালার পাশে একটা ছোট টেবল থেকে একটা ছবি উঠিয়ে নিয়ে ওঁর হাতে দিয়ে বললেন—

'আমার ছেলের ফটো, মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে তোলা।' গ্র্‌ল ছবিটি দেখলেন। একটি তরুণের মুখচ্ছবি, আরো হাজার তরুণেরই সমতুল। তার ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবৃত্তি অপ্রতিহত—আমি অবশ্য কোনো দিন ওকে আর দেখবো না।

মিঃ গ্র্‌ল বলেন, 'আপনার মনে হয় আমাকে ওঁর মত দেখতে। ঠিক বলছেন?'

মিসেস রথ্‌নাগোল তখনই বলে ওঠেন, 'ছবিটা অবশ্য তেমন ভালো নয়। যাকে ভালোবাসা যায় তার উত্তম ছবি থাকে না একখানাও, কেমন নয়? আমি বলতে চাই যে কোনো ছবির দিকে তাকিয়ে অপরিচিত কি ভাবতে পারেন এই ছবি কিসের মত দেখতে? কেমন ছিল মানুষটি? ছবি সর্বদাই যেন কেমন—কেমন প্রাণহীন, আমার ত তাই মনে হয়।'

ওঁর কণ্ঠস্বর এমনই কম্পিত যে মিঃ গ্র্‌লের মনে হয় উনি এইবার কেঁদে ফেলবেন। উনি আবার বলে চলেন, 'স্মৃতির খাতায় সেই একই রকম থেকে যায়। যে শূন্য বাগানে আপনি ঘুরে বেড়ান আর ঘরে ঘড়িটা **টিক টিক** করে চলে। যদি আমার ছেলেকে আপনার জানা থাকত তাহলে বুঝতেন কেন আপনাকে দেখলে তার কথা মনে পড়ে।'

মিঃ গ্র্‌ল বললেন, 'হাঁ ম্যাডাম। যা বলছেন।' বললেন অন্যমনস্ক ভাবে তার মনে তখন অন্য চিন্তা, মিসেস রথ্‌নাগেল বেশ অনুভূতিপ্রবণ, তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝেছেন।

তিনি বললেন, 'এখন আসুন কাজের কথা হোক, হয়ত আপনি ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছেন আমাকে কি কি প্রস্তাব দিতে পারেন।'

মিঃ গ্র্‌ল মাথা নাড়লেন – হাঁ, তিনি ভেবেছেন মিসেসের টাকা কিভাবে খাটালে একটু বেশী লাভ পাওয়া যায়—অনেক সম্ভাবনা। তিনি ওঁকে মর্টগেজ বনড্‌, ডিবেঞ্চার, পাবলিক লোন, গিলট এজেড সিকিউরিটি প্রভৃতির কথা শোনালেন তবে, যদি কারেন্সীর অবস্থাবিপর্যয় ঘটে আর কারেন্সীর মধ্যে শোচনীয় ভাবে একটা সংকোচন শুরু হয়, যা আজ সারা পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ যাকে অর্থনীতিবিশারদরা বলে থাকেন ক্রয়-ক্ষমতার পতন।

এই ঝুঁকি অবশ্য এড়ানো যায়, যদি এইসব সিকিউরিটি তাদের আকার অনুসারে একটা বিশেষ দাবী না করে—তবে অর্থনীতির জীবন্ত সারবস্তুতে অংশগ্রহণ করে—তাহলে সে এই অংশের যে অর্থনীতি তার অংশভাগী হয়। এদিকে অবশ্য এই কারণে বেশ সংকটের ঝুঁকি আছে, তবে জীবনের অন্য কোনো জায়গায় অবস্থাটা ভিন্নতর নয়—যদি কোনোরকম দুঃসাহস না থাকে তাহলে কোনো লাভও নেই। শেয়ারের ব্যাপারে বিপদের ঝুঁকি নির্ভর করে থাকে সেই সমাজের উন্নয়ণে যাতে আপনি অংশভাগী। এই ঝুঁকি আবার উত্তেজিত অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তিত হতে পারে, তার যেমন অনুকূল দিক আছে, তেমনই আবার প্রতিকূল দিকটাও অছে। মূলধন বিশেষভাবে একটি অনুভূতিশীল সংস্থা –

মিসেস রথ্‌নাগেলের কাছে অবশ্য অর্থনৈতিক বিচার সম্পর্কিত মিঃ গ্রুল বর্ণিত বাণীর সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবন করা সহজ হল না। তবে তিনি একটি উত্তম হাতে পড়েছেন, অর্থনীতিতে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের হাতে পড়েছেন এই বিশ্বাস তাঁর হল। তাঁর মুখভঙ্গীতেই এই অভিব্যক্তি প্রকাশিত।

মিঃ গ্রুল অবশ্য কিছু ভাবছেন না, তাই তিনি তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। তিনি মিসেসকে বুঝিয়ে দিলেন একটা কোনো নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে তিনি যেন তাঁর মূলধন খাটান ; যখন প্রতিটি বিভিন্ন রীতির একটা বিভিন্ন সুবিধা আছে এবং অসুবিধাও আছে, এই ব্যবস্থাই মিঃ গ্রুলের কাছে অধিকতর কার্যকরী এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয়। অবশ্য যদি মিসেস রথ্‌নাগেল তাঁকে যা সব সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা যদি গ্রহণ করেন। প্রতিটি আমানতকারী তাঁর মূলধনকে এমন ভাবে খাটাতে চান যাতে বিপদের ঝুঁকিটা সমভাবে বণ্টন করা যায়।

মিসেস রথ্‌নাগেল মাথা নাড়েন, মিঃ গ্রুল যা বলছেন তার অর্থ ওঁর বোধগম্য হয়েছে।

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'গুড।' কাল সব রকম সিকিউরিটির একটা ফর্দ বানিয়ে পাঠানো যাবে। মিসেস রথ্‌নাগেল তার ভিতর থেকে নির্বাচন করে নেবেন যেটা তাঁর পছন্দ।

'আমি ?' চীৎকার করে উঠলেন মিসেস রথনাগেল। 'কিন্তু আমি যে ওর কিছুই বুঝি না। আমি কি করে বলব কি আমি কিনতে চাই ?'

মিঃ গ্রুল প্রতিবাদ জানিয়ে হেসে বললেন, 'কিন্তু সিকিউরিটি তো আপনার অর্থেই কেনা হবে।'

'হ্যাঁ, তা বটে।' উত্তর দিলেন মিসেস রথ্‌নাগেল। 'কিন্তু সেইটাই বড়ো কথা নয়। আপনার অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানটাই আসল মিঃ গ্রুল আমার কি সবচেয়ে ভালো হবে তা আপনিই জানেন।'

'সেটা কি?'

মিসেস রথ্‌নাগেল বল্লেন, 'আমাকে যদি এই কেনা-কাটার ব্যাপারে কিছুই না করতে হয় মিঃ গ্রুল। আপনার ধারণানুসারে কাজ করা বিষয়ে—আমি স্ত্রীলোক, আমি কি বুঝি। তাই আপনি আমাকে এটা কি ওটা যা কিনতে বলবেন, আমি তাই কিনব, তাহলে আপনিই সিদ্ধান্ত করুন, তারপর আমাকে জানাবেন।'

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'তাহলে আপনাকে আপনার জমাখরচের ব্যাপারে কাজ করার জন্য আমাকে ভার দিতে হবে।'

মিসেস বললেন, 'বেশ ত, সে ভার আমি দেব, কেন দেব না? আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।'

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'কিন্তু ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডাইরেকটারসরা কোনো মক্কেলের তরফে তাঁদের কর্মচারী কাজ করেন এটা পছন্দ করেন না। এর জন্য বোর্ডের অনুমতি নিতে হবে।'

মিসেস রথ্‌নাগেল বল্লেন, 'সে ত' ঠিক কথা, যা প্রয়োজন মনে করেন, করবেন, তবে কালই তা করে ফেলুন সোজাসুজি—'

তিনি লক্ষ্য করলেন, মিঃ গ্রুল একটু ইতস্ততঃ করছেন।

তিনি আবার বল্লেন, 'আপনি আমার অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করবেন না মিঃ গ্রুল। আর যাই হোক, এটা শুধু একটা কেনা-বেচার প্রশ্ন নয়, তাই নয় কি? হয়ত পরে আপনি দেখবেন যে সিকিউরিটি আপনি কিনেছেন তাকে আবার বিক্রী করতে হল। প্রতিটি ব্যাপারে যদি আপনাকে অনুমতি নিতে হয় তাহলে কি হবে? আমার কোনো টেলিফোন নেই। কিংবা ধরুন আমি এখানে নেই, বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছি—আপনি আমার কাছে পৌছাতে পারবেন না - এই সময় মাঝে মাঝে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতে পারে, নয় কি!'

মিঃ গ্রুল বললেন, 'যা আপনার অভিরুচি, বোর্ডের যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় আপনার বাসনা পূর্ণ করব। কিন্তু আমি যে রকম ভেবেছি কখনো যদি তার উলটোটি ঘটে যায়, তখন কিন্তু আমাকে আপনি যেন অপরাধী করবেন না। কেমন?'

মিসেস রথ্‌নাগেল মাথা নাড়েন।

'সে কি করে হবে? নিশ্চয়ই নয় মিঃ গ্রুল, আমার বিশ্বাস যতটুকু করা সম্ভব আপনি আমার জন্য তা করবেন। এমন যদি কিছু ঘটে যা আপনার এড়িয়ে যাওয়ার শক্তি নেই, তাই যদি ঘটে, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দোষ দেব না। আমি তা করব না মিঃ গ্রুল।'

শেষ কথাটি উচ্চারণ করার সময় উনি মিঃ গ্রুলকে বেশ একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। মিঃ গ্রুল মনে করলেন—এখন উনি ওর সন্তানের কথা ভাবছেন, আমাকে দেখলে মৃত পুত্রের কথা মনে পড়ে। মনে কষ্ট হয় এই কথা ভেবে যে মিসেস তাঁর সারল্যবসে আত্মার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন না।

মিঃ গ্রুল বললেন, 'আচ্ছা, যদি অবশ্য বোর্ডের অনুমতি পাওয়া যায়।'

মিসেস রথ্‌নাগেল মাথা নাড়েন।

তিনি প্রশ্ন করেন, 'তবে ওঁরা কেন অনুমতি দেবেন না, অনুমতি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

মিঃ গ্রুল ভাবেন, কি যে করতে হবে, সে বিষয়ে মিসেসের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। জরুরী সিদ্ধান্ত, কি ভাবে? তাঁর যে পরিমাণ অর্থ আছে তা নিয়ে এইভাবে ফাটকাবাজী করা যায় না, এ তাঁর বোঝা উচিত—

আমি ওঁর টাকাটা এইভাবে জমা দেব যাতে উনি এখন যা সুদ পাচ্ছেন তার অন্তত: কিছু বেশী পান। একজন সহযোগীর কথা মনে এল, তিনি একটি মক্কেলের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফাটকাবাজী করেছিলেন, তারপর লোকসান হয়, মক্কেল বোর্ডে অভিযোগ জানান, অবশ্য নিশ্চিতভাবে এই অভিযোগ অন্যায় তা সত্ত্বেও সহকর্মী বেচারীর চাকরী গেল, যেখানে টাকাকড়ির ব্যাপার সেইখানে কদাচিৎ সুবিচার পাওয়া যায়। আমি সে রকম নির্বোধ নই।

মিঃ গ্রুল উঠে পড়লেন।

বললেন, 'ম্যাডাম, আমাকে এখন যেতে হবে, বোর্ডের সঙ্গে কথা বলা হলেই আপনাকে জানাবো। এই কফির আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ।'

মিসেস রথ্‌নাগেল বল্লেন, 'না, না, মোটেই নয়। আপনি যে এসেছেন তার জন্য আমারই ধন্যবাদ দেওয়ার কথা।'

মিঃ গ্রুল সেই নোঙরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন—তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল এই সব ব্যাপার, এই যে মিসেস রথ্‌নাগেলের কাছে আসা, ওঁর টাকার ব্যাপার নিয়ে তার এই চিন্তার ভার, এ সবই তার মর্যাদার যোগ্য নয়, ব্যবসায়িক দিক থেকে অনুন্নত। না এলেই বেশ বিবেচনার কাজ হত, মিঃ গ্রুল ভাবেন। সবই আমার গভীরতা আর ভাবাবেগমিশ্রিত স্মৃতিচারণে ভর্তি। কিন্তু এখন আর আমার কিছুই বলার নেই।

বাড়ি ফেরার পথে যে ট্রাম ধরলেন, তা প্রায় শূন্য। মিঃ গ্রুল একটা জানলার ধারের সীটে আসন গ্রহণ করে বাইরে তাকালেন। ভাবলেন, আমি এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।

চেয়ারম্যানকে বলব অনুমতি দেবেন না। তাহলে কিন্তু আবার বৃদ্ধা মনে করবে আমাকে উনি যতটা বিশ্বাসভাজন মনে করেছেন ব্যাঙ্ক তা মনে করে না। এই দুই অবস্থাই আমার বাঞ্ছনীয় নয়।

এর পরের স্টপে কয়েকজন নেমে গেল, মিঃ গ্রুল তাদের দিকে তাকালেন না, একজন মক্কেলের যদি আমার ওপর এতখানি বিশ্বাস থাকে যেমন মিসেস রথ্‌নাগেলের আছে, তাহলে আবার ব্যাঙ্কের দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

যে স্টপে তাকে নামতে হবে তার ঠিক একটু আগেই মনে হল কে যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, মিঃ গ্রুল তাকিয়ে দেখলেন। গেটের কাছে একজন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি এগিয়ে এলেন।

তিনি বললেন, 'গুড ডে, মিঃ গ্রুল, হাউ ডু ইউ ডু। কি খবর ভাই।'

মিঃ গ্রুল বললেন, 'চমৎকার, ধন্যবাদ। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই মিঃ এসথেনবার্গ। প্রায় দু-বছর, তাই না? মাফ করবেন, আমাকে আবার এখানেই নামতে হবে।'

ট্রাম থামল।

এসথেনবার্গ বললেন, 'আমাকেও নামতে হবে, পার্কের ওধারে এক জায়গায় যেতে হবে।"

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'আমি ত' ঐদিকেই থাকি।'

মিঃ এসখেনবার্গ বল্লেন, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা দুজনেই একত্রে একটু হাঁটতে পারি।'

মিঃ গ্রুল মাথা নাড়লেন।

মিঃ এসখেনবার্গ প্রশ্ন করলেন, 'এখনও সেই ব্যাঙ্কেই আছেন ত' ?'

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'হ্যাঁ ঠিকই বললেন, তবে এখন আর মেন ব্রাঞ্চে নেই, এখন সাউথ ব্রাঞ্চে বদলি হয়ে এসেছি।'

মিঃ গ্রুল ভাবেন, ওর কাছে চেপে লাভ কি, আমি যে দু-বছর আগে প্রমোশন পেয়েছি বলতে বাধা কি! তাই তিনি আবার বলেন, 'আমিই এখন ম্যানেজার।'

এস্‌খেনবার্গ প্রান্ত থেকে ওকে একবার আড়চোখে দেখে নিল। গ্রুল বুঝতে পারেন যে ওঁর সহচর মৃদু হাসছেন—ব্যাঙ্কে যখন এস্‌খেনবার্গ ছিল তখন থেকেই তাকে সবাই কর্কশ প্রকৃতির মানুষ বলে জানত। গ্রুল মনে মনে ভাবে ওকে ম্যানেজার হয়েছি কথাটা বলা ভালো হয়নি।

এস্‌খেনবার্গ বল্লেন, 'আমি যখন ব্যাঙ্ক ছেড়েছি তখন সাউথ ব্রাঞ্চে মাত্র তিনজন কর্মচারী ছিলেন।'

এই মন্তব্য তথ্যগত ভাবে ঠিকই। আশ্চর্য। এই যে ওর সে কথা মনে আছে।

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'আপনার স্মৃতিশক্তি প্রখর। এখন অবশ্য চারজন কাজ করেন।'

এস্‌খেনবার্গ প্রশ্ন করেন, 'আপনাকে নিয়ে চারজন ?'

মিঃ গ্রুল মনে মনে ভাবেন এখন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা যাক।

তিনি বল্লেন, 'হাঁ তাই। তা আপনি এখন কি করছেন ?'

এস্‌খেনবার্গ বল্লেন, 'নিজেই নিজের চাকর। ত্রিশ অতিক্রম করলে তখন আর অন্যের জন্য কাজ করা ঠিক নয়। আপনিও একদিন এই কথার অর্থ বুঝবেন। আমি এখানে নানাবিধ ধাতু পদার্থের কাজ করি। কারবার ভালোই চলছে, দু-বছর আগে যখন কাজে নেমেছিলাম তখন থেকে একরকম ভালোই চলে।'

গ্রুল ভাবেন—চাল মারছে! তাহলে ট্রামে চড়ে কেন? যদি এতই ভালো ওর কারবার, তাহলে ট্রামে কেন ?

এসথেনবার্গ যেন ওর চিন্তাটা বুঝে ফেলেছে, এইভাবে আবার বলে—'সত্যি কারবার বেশ ভালো। কিছু বলার নেই ভাই। তবে কেন ভালো জানেন? তার কারণ আমি একেবারে শক্ত হাতে রাশ টেনে আছি। সবাই টাকা খরচ করতে পারে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে, এই হল আমার নীতি; এইভাবেই ত' স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়, পয়সাও থাকে।'

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'আশা করি আপনার কারবারের ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক আছে?' প্রশ্নটা করেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বড্ড ভোঁতা প্রশ্ন হল, একেবারে সোজাসুজি। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এস্থেনবার্গ মিঃ গ্রুলের মন্তব্যে বিশেষ কিছুই মনে করেন নি। তিনি হেসে জবাব দিলেন—'তা যদি না হত, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আপনার ওখানে একাউণ্ট দিতেন! এ বিষয়ে না হয় পরে কোনো সময় কথা বলা যাবে কি বলেন? সাউথ ব্রাঞ্চটা কোথায় আমি ভুলিনি; হয়ত শীগগির একদিন আসবো। আপনি ত' সোজা যাবেন, না? আচ্ছা, আমাকে বাঁ দিকে যেতে হবে। গুডবাই।'

পরদিন প্রাতে মিঃ গ্রুল চেয়ারম্যানকে টেলিফোন করল; জনৈক মক্কেলের একাউণ্ট সম্পর্কে তিনি কথা বলতে চান—কাল ও আসতে পারে। না, না, এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তবে, এই কেসটা টেলিফোনে আলোচনার যোগ্য নয়। বিকালের দিকে আসার জন্য বললেন তিনি।

মিঃ গ্রুল যখন অফিসে ঢুকলেন, চেয়ারম্যান একটা ফাইলের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। ওপর দেখে লক্ষ্য করে ফাইলটা চিনলেন মিঃ গ্রুল। সাম্প্রতিক কালে পাঠানো সাউথ ব্রাঞ্চ সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং চিঠিপত্রের ফাইল।

পাশের ডেসকের পাশের একটি আরাম কেদারার দিকে হাত দেখিয়ে চেয়ারম্যান মিঃ গ্রুলকে বললেন—'প্লিজ, বসো।'

তিনি বললেন, 'কি খবর।" তারপর উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না করে বললেন, 'গত কয়েক মাসে আমি তোমার ব্রাঞ্চের উন্নয়ন সম্পর্কে দেখছিলাম, তোমার কাজ কর্ম মন্দ নয়। তুমিও হয়ত তা জানো।'

মিঃ গ্রুল মাথা নাড়লেন।

চেয়ারম্যান বলতে লাগলেন, 'তোমার কিছু মক্কেলও বেশ ভালো মতই প্রকাশ করেছেন। যে ভাবে তুমি বিজনেস মিটিয়ে দাও তা নিয়ে প্রশংসা

হয়েছে। তা ছাড়া মক্কেলদের প্রতি যে শিষ্টাচার প্রকাশ করো তাও সকলে বলেছেন। আমার তাই ইচ্ছে পরবর্তী বোর্ড মিটিং-এ তোমার মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেব। আশা করি, তোমার কোনো আপত্তি নেই।'

মিঃ গ্রুল মৃদু ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।

বললেন, 'আপনি আমার কাজ যে পছন্দ করেছেন এর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

আবার সেই বাহুল্য প্রকাশ। বেয়াড়া কাজ। কেন মরতে একথা বলতে গেলাম? আমি ভালো কাজ করেছি, উনি তার জন্য আমাকে বেশী দিতে চান। তাহলে এই স্বীকৃতির জন্য আমার ঋণী হওয়ার কি আছে? চেয়ারম্যান কিন্তু একটি বাক্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য উচ্চারণ করেন নি; তিনি মাথা নাড়লেন। তারপর আবার বললেন, 'এখন তাহলে যে কেসটা তুমি এনেছ তা বলতে পারো!'

মিঃ গ্রুল মিসেস রথ্‌নাগেলের কাছে তার যাওয়ার বিবরণ দিলেন, তারপর চেয়ারম্যান যাতে তার মক্কেলের ইচ্ছাপূরণে মিঃ গ্রুলের কতখানি দায়িত্ব তা বুঝতে চান তার জন্য মিসেস রথ্‌নাগেলের হিসাবটা ওঁর সামনে ধরলেন।

মিঃ গ্রুলের কথা শেষ হওয়ার পর চেয়ারম্যান কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। ওর মুখের দিকে অভিনিবেশ সহকারে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। মিঃ গ্রুল ভাবেন যে চেয়ারম্যান সত্যি কি ভাবে কি করা যায় তাই ভাবছেন কিনা বোঝার—তা নইলে এখনই যদি তিনি কোন সিদ্ধান্ত না করতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত যে সুচিন্তিত এই বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হতে চান।

একটু পরে তিনি বললেন, 'জানো মিঃ গ্রুল, আমরা আমাদের কর্মচারীদের পক্ষে এই জাতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। অধিকাংশ মক্কেল মনে করে যে ব্যাঙ্ক কেরানীরা না কাজ করে কি ভাবে টাকা বাড়ানো যায় তার কৌশল জানে। তার সেই ম্যাজিক দেখানোর শক্তির যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়। যাই হোক, মনে হয় মিসেস রথ্‌নাগেল আমাদের তিরস্কার করবেন না যদি আমাদের কাছ থেকে যে নীতি শিক্ষা করেছ সেই অনুসারে তাঁর সম্পত্তি দেখাশোনা করো। সেই কারণে, আমার খুব অনিচ্ছা নেই—'

চেয়ারম্যান নিজেই থামলেন।

তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি ঠিক বুঝেছি যে মিসেস রথ্‌নাগেল তোমার মধ্যে তাঁর মৃত পুত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন!'

মিঃ গ্রুল মাথা নাড়লেন।

বললেন, 'তবে আমার মনে হয় না প্রকৃতপক্ষে কোনো মিল আছে। উনি ওঁর মৃত পুত্রের একটা ফটোগ্রাফ আমাকে দেখালেন, আমি কোনও মিলের সন্ধান পাইনি। একটি যুবকের ছবি মাত্র।'

চেয়ারম্যান বল্লেন, 'তবে ছবিতে একটি মানুষের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়ে, সে আত্মপ্রকাশ করে।' এই বলে তিনি তাঁর ছাগল-দাড়িতে হাত বুলিয়ে জ্ঞানীব দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন—'মিসেস রথ্‌নাগেল তাঁর পুত্র সম্পর্কে অনেক বেশী জানেন, ফটোগ্রাফে যা আছে তার বেশী।'

তিনি থামলেন, তারপর হাসলেন।

তিনি বললেন, 'হয়ত উনি ও সম্পত্তি তোমাকেই দান করে যেতে চান মিঃ গ্রুল। আর তা যদি নাও হয়—এই ব্যাপারে আমি আইনের কিছু ব্যতিক্রম করতে পারি। তাহলে ওকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যে তাঁর ইচ্ছা পূরণে তুমি সমর্থ। এই বিষয়ে যে আনুষ্ঠানিক আইন পালন করতে হবে, তা তোমার অজানা নয়।'

গ্রুল মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, চেয়ারম্যানও উঠলেন। তিনি বললেন— 'আজ আর কিছু নেই ত'?' এই বলে গ্রুলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

গ্রুল বল্লেন, 'না, আর কিছু নেই— তবে, গতকাল ট্রামে মিঃ এস্‌খেনবার্গের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার কথা মনে আছে? উনি আমাদের এখানেই কাজ করতেন। বছর দুই আগে চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন।'

চেয়ারম্যান বললেন, 'আমি জানি। ওর একটা ধাতুদ্রব্যের কারবার আছে। আমাদের এখানে ওর একাউণ্ট নেই, তবে শুনেছি ভালোই কাজ কারবার করছে। লোকটা একেবারে হাঙর—তুমি কি কখনো কোন হাঙ্গরের কথা শুনেছ, যে উৎপাত করছে?'

'আমি বরং বললাম আমাদের ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলতে।'

'কি বললেন?'

'একদিন হয়ত আসবেন।'

চেয়ারম্যান বললেন, 'হাঙর পরিবেষ্টিত সমাজেও থাকতে হয়। যদি কাৎলা না হয় কি করা যাবে? ধার? যদি ধার চায়? তুমি সেই ক্ষেত্রে সোজা বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে।'

'গুড বাই।'

এই আলাপ-আলোচনার ছ-মাস পরে মিসেস রথ্‌নাগেল যখন তাঁর সুদের টাকা ওঠাতে এলেন তিনি তিনশ পঞ্চাশ মার্ক পেলেন। তাঁর সম্পত্তি নিয়ে মিঃ গ্রুলের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে দেখা যাচ্ছে। তবে এস্‌খেনবার্গ সম্ভবত: ভুলে গেছেন যে সাউথ ব্রাঞ্চে একদিন পদার্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি আসেন নি। গ্রুল ইতিমধ্যে ভেবেছিলেন একদিন ফোন করে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন কিনা। কিন্তু তাঁর মনে হল তার মধ্যে কাৎলা যদি হাঙরকে আমন্ত্রণ জানায় যে তার জন্য কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রসারিত করা হবে তাহলে যে বিপদের সম্ভাবনা সেই বিপদ আসন্ন হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেইদিন পথ চলার সময় এস্‌খেনবার্গের সঙ্গে আলোচনা কালে যে অস্বস্তির ভাব মনে জেগেছিল তা আর কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

লোকটা একটা চালবাজ অহংকারি। এমন কি এস্‌খেনবার্গের পোষাক-পরিচ্ছদও ওকে সহসা অসন্তুষ্ট করে তুলল, অতিরিক্ত স্মার্ট, যাঁরা ফ্যাসন-দুরস্ত মানুষ তাঁরা অন্য ভঙ্গীতে চলেন। যাই হোক, টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে এস্‌খেনবার্গ মেটাল কোম্পানীর তিনটে লাইন। সাউথ ব্রাঞ্চের একটিই যথেষ্ট। কিন্তু সেটাই ত' আর একটা মাপকাঠি নয়, গ্রুল মনে মনে ভাবে ব্যাঙ্কে আসার কষ্ট মানুষকে স্বীকার করতেই হবে। মেটাল শিল্প টেলিফোনের মাধ্যমেই কেনা বেচা করে—তারা না দেখে মাল না দেখে মানুষ। অর্থনৈতিক জীবনের এই হল একেবারে ভিত্তিগত পার্থক্য। কোনো কিছুর গুরুত্ব বা দৃঢ়তা সম্পর্কে ইঙ্গিত দানের উপযোগী কিছুই নেই।

প্রায় এক বছর কেটে গেল তারপর একদিন এস্‌খেনবার্গ সাউথ ব্রাঞ্চের সদর দপ্তরে এলেন। যখন এসেছিলেন তখন গ্রুল ওকে দেখতে পাননি। ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার ঠিক আধঘণ্টা আগে উনি এসেছিলেন। মূল অফিসের পাশে ছোট্ট কামরায় তিনি বসেছিলেন। ঠিক এই সময়টা কদাচিৎ কোনো মক্কেল আসেন। গ্রুল সেদিন যেসব চিঠিপত্র পাঠানো হচ্ছে তা দেখছিলেন।

এই অবস্থায় যেদিন ট্রামে এস্‌খেনবার্গের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই দিনটি এতই দূরে সরে গেছে যে যখন একজন জুনিয়র ক্লার্ক এসে জানালো এস্‌খেনবার্গ নামে এক ব্যক্তি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চান, ভদ্রলোক যেন অফিসে অপেক্ষা করছেন, তখন গ্রুল জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলেন—'কে?' কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জুনিয়ার ক্লার্ককে ঠেলে ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বলে উঠলেন—'গুড ডে, মিঃ এস্‌খেনবার্গ, আপনি যে কথা রেখেছেন শেষ পর্যন্ত তার জন্য আমি খুশী, মনে আছে ত' বছর খানেক আগে যখন দেখা হয়েছিল আপনি একদিন আমার কাছে আসবেন বলেছিলেন? আসতে আজ্ঞা হোক।' এই বলে "ডিপোজিট অ্যাণ্ড উইথড্রয়াল" চিহ্নিত কাউণ্টারের পাশের ছোট দরজাটি খুলে দিলেন।

এস্‌খেনবার্গ বল্লেন—'গত তিন বছরে এখানকার কোনো পরিবর্তনই হয়নি দেখছি। সময় যেন এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে।'

প্রাইভেট অফিসে দুজনে বসে পড়লেন।

মিঃ গ্রুল চিন্তা করলেন—হয়ত এইবার আরম্ভ হবে আগের মত ঢাক পেটানো চালবাজি।

মিঃ গ্রুল জবাব দিলেন—'আপনি বাইরেটা দেখে বিচার করছেন মিঃ এসখেনবার্গ, কিন্তু আপনিই জোর দিয়ে বলেছিলেন হিসেব করে চলা কত প্রয়োজন যাই হোক ব্যাঙ্কেরও তাই ধারণা, দামী আসবাব বা ব্যয়বহুল পরিবর্তনে ব্যাঙ্কের তেমন আগ্রহ নেই। তবে মিঃ এস্‌খেনবার্গ আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন একটি জিনিষের পরিবর্তন ঘটেছে—দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি মোট লেনদেন এবং মক্কেলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে।'

উনি মনে মনে ভাবেন একটা উত্তম জবাব দিয়েছি।

এস্‌খেনবার্গ বল্লেন—'আপনার কি এইটুকু কৃতিত্ব? লেনদেন বেড়েছে, আর মক্কেলের সংখ্যা।'

মিঃ গ্রুল ভাবেন, সর্বদাই বাড়াবাড়ি—এইভাবে প্রতিটি কথা শ্লেষে ভরিয়ে দেয়—ওর ওপরে কেউ নেই। কোনো মানুষকেই গুরুত্ব দেয় না।

মিঃ গ্রুল জবাব দেন—'অবশ্য এটা আমার কৃতিত্ব নয়।' ডেসকের একটি ড্রয়ার টেনে বললেন—'আপনি কি ধূমপান করেন?' সিগারেট এবং সিগার অতিথির দিকে এগিয়ে দিলেন। এস্‌খেনবার্গ একটি সিগার টেনে নিলেন।

তারপর প্রশ্ন করলেন—'আপনি ধূমপান করেন না ?'

মিঃ গ্রুল বল্লেন—'না, আমি ঠিক পছন্দ করি না।'

'দুঃখের বিষয় আমি করি।'

'ছেড়ে দিলেই পারেন। আপনার পক্ষে খারাপ।'

'আমি ভালোবাসি, ভালো লাগে তাই।'

গ্রুল ভাবলেন, ওর একাউন্টের কথা তুলবো না, এইভাবে গেল বার কিছু নেমে গিছলাম। এই ভাব ওর মনে হতে দেব না যে আমি ওর পিছনে ছুটছি।

এস্‌খেনবার্গ প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি ডাক দেখা হয়েছে ?' এই বলে গ্রুলের সামনে রাখা এ্যাটাসে কেসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপর বল্লেন—'যদি না হয়ে থাকে, তাহলে শেষ করে নিন। আমি ইতিমধ্যে চুপ করে থাকব। এইভাবে পরে আর বিরক্ত হওয়ার কিছু থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, আপনার সঙ্গে একটা কারবারের কথা আছে। তবে যে নমুনাটি আমার আগমনবার্তা আপনাকে জানালো যে যদি আবার এসে হাজির হয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ডাক দেখা বাকী আছে, সে আমার ভালো লাগবে না।'

মিঃ গ্রুল ভাবলেন যে অতিথি হিসাবে এসেও সেই হাকিমবৃত্তি। উনি এখন হুকুম দিচ্ছেন, কি করে জুনিয়ার ক্লার্কটিকে নমুনা বলে দিলেন। এ একেবারে সম্পূর্ণ ঔদ্ধত্য বলা যায়। কিন্তু উনি কোনো প্রতিবাদ করলেন না। এস্‌খেনবার্গের কথায় বাইরে কোনোরকম বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করে উনি এ্যাটাসে কেসটা টেনে কাগজ ওলটাতে থাকেন।

তারপর দরজা খুলে জুনিয়র ক্লার্কটিকে ডেকে কেসটা তার হাতে দিলেন। আবার ফিরে গিয়ে ডেসকে বসলেন মিঃ গ্রুল।

উনি বললেন - 'আমার ত' মনে হয় আপনার আর কোনো রকম বাধার আশঙ্কা নেই—তাহলে যে কারণে আপনার আগমন সেই কারবার সম্পর্কিত কথাটা বলতে আপনাকে অনুরোধ করি।'

এস্‌খেনবার্গ বল্লেন—'আমার কুড়ি হাজার মার্ক প্রয়োজন। চৌদ্দদিনের কড়ার। সুদের হার সম্পর্কে কোনো কথা ওঠা নিরর্থক।'

কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে মিঃ গ্রুল বল্লেন—'কুড়ি হাজার মার্ক। কি জন্য প্রয়োজন ?'

এস্‌খেনবার্গ বল্লেন, 'মেটাল কিনতে হবে। একেবারে জলের দর।

একটা কারবার দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, তাদের মাল। তবে এজেন্ট একেবারে রেডী ক্যাস চায়, নগদ টাকা। আমার টাকাকড়ি সব কারেন্ট (চলতি আমানত) ট্রান্সাকসনে আবদ্ধ। তাই এটা একটা বিশেষ ব্যাপার।'

মিঃ গ্রুল বল্লেন, 'চোদ্দ দিন? আপনি নিশ্চিত যে চোদ্দদিনের ভেতর আপনি মিটিয়ে দিতে পারবেন?'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কি করে আপনি এই ধারের গ্যারাণ্টি দেবেন?'

'আমি যে সম্পত্তি এই টাকায় পাব তা আপনাদের নামে ট্রান্সফার করব। কারণ আমি তা নগদ টাকায় বিক্রি করব, আপনার এতটুকু ঝুঁকি নেই।'

'আপনি বললেন সুদের হার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নেই?'

এস্থেনবার্গ বল্লেন, 'প্রায়—আমি এই মালগুলি বেচে শত করা ১০০ ভাগ লাভ করব। আপনি যদি পনের পার্সেণ্টে রাজী হন—চোদ্দদিনের জন্য পনের পার্সেণ্ট। এ একরকম লাভের কড়ির বখরা, একে সুদের হার বলা বলে না।'

গ্রুল চিন্তা করতে থাকেন।

তিনি জবাব দেন, 'বোর্ড যে রাজী হবে তা ত মনে হয় না, আপনার এই ব্যাঙ্কে কোনো একাউণ্ট নেই। তাছাড়া চোদ্দদিনে পনের পার্সেণ্ট, এ একেবারে হিসাবের বাইরে—'

এস্থেনবার্গ বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার প্রস্তাবটা ব্যাঙ্কের কাছে নয়। বোর্ড টাকা দেওয়া বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় নেবেন, তার মধ্যে আমাকে কাজটা করতে হবে। আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজেই এতে যোগ দেবেন।'

মিঃ গ্রুল প্রায় চীৎকার করে ব'লে ওঠেন—'একথা আপনি ভাবলেন কি করে, আমি কি ধনী লোক?'

এস্থেনবার্গ বল্লেন, 'না, আমি অবশ্য মনে করি না যে আপনার কুড়ি হাজার মার্ক আছে। তবে হয়ত আপনি ব্যাঙ্কের কোনো মক্কেলের নাম বলে দিতে পারেন যিনি আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। আপনার এই মধ্যস্থতার জন্য তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে ধন্যবাদ জানাবেন।'

কি জ্বালা! মিঃ গ্রুল ভাবেন। বোর্ড আমাকে দূর করে দেবে যদি একবার জানতে পারে যে আমি মক্কেলদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতে

উৎসাহিত করছি এস্‌থেনবার্গের কারবারে সহায়তা করার জন্য। কিন্তু পনের পার্সেণ্ট—তার মানে দুসপ্তাহে তিন হাজার মার্ক। ঠিক সেই মুহূর্তে মিসেস রথ্‌নাগেলের কথা মনে এল।

উনি ইতস্ততঃ করে প্রশ্ন করলেন—'এই লেনদেনটায় কোনো বিপদ নেই জানেন?' এস্‌থেনবার্গ কাঁধা নাড়লেন।

তিনি বল্লেন—'সুদের হারটা বড্ড বেশী মনে হচ্ছে তাই না? এর সঙ্গে বিপদের ঝুঁকির কিছু নেই। আমার টাকাটা আটকে আছে, এ একটা সুযোগ যা কদাচিৎ পাওয়া যায়। আমার টাকাটা যদি খোলা থাকত তাহলে কি আর আমি অংশীদার খুঁজি? আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

মিঃ গ্রুল চিন্তা করেন।

কালকের মধ্যে কুড়ি হাজার পাওয়া এমন কঠিন নয়। মিঃ গ্রুল মনে মনে ভাবেন। মিসেস রথ্‌নাগেলের টাকার একটা অংশ মাত্র বিক্রী করতে হবে। চোদ্দদিনের মাথায় আবার কিনে নেব—আর মাসের শেষে আমি মিসেস রথ্‌নাগেলের সামনে তিন হাজার মার্ক ফেলে দেব।

এস্‌থেনবার্গ প্রশ্ন করে—'আপনি কি কাউকে জানেন?'

মিঃ গ্রুল বলেন—'হয়ত তাই। একটা একাউণ্ট আছে যেটা আমিই নিয়ন্ত্রণ করি। আমি টাকাটার বন্দোবস্ত করতে পারি। আমার মক্কেলের সে বিষয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।'

এস্‌থেনবার্গ বল্লেন—'তাহলে ত' সব ঠিকই আছে।'

মিঃ গ্রুল বল্লেন—'আমাদের একটা চুক্তিনামা সই করতে হবে। তাছাড়া আমি নিজে মালটা দেখতে চাই।' এস্‌থেনবার্গ মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—'তা যদি আপনার সুবিধে হয় তাহলে এখনই আমরা লিকুইডেটরের কাছে যেতে পারি। তার কাছেই যে ওয়্যারহাউসে মালটা আছে তার চাবী আছে। সেখানেই আমরা চুক্তিনামা ঠিক করে নিতে পারি।'

মিঃ গ্রুল ভাবেন, প্যাঁচে পড়েছে তবু বুলি ছাড়ছে না। কি নির্বোধের মত কথা আবার। তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

মিঃ গ্রুল বললেন—'উত্তম, চুক্তিনামা ঠিক করতে হবে।' একটা উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে ভেবে মনটা খুশী হয়।

এস্‌থেনবার্গ এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি।
